তাওহীদের মর্মকথা

[বাংলা]

القول السديد شرح كتاب التوحيد

« اللغة البنغالية »

লেখক : আব্দুর রহমান বিন নাসের সাদী

تأليف: عبد الرحمن بن ناصر السعدي

অনুবাদ : আবুল কাসেম মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ

ترجمة: أبو القاسم محمد عبد الرشيد

সম্পাদনা : আব্দুল্লাহ শহীদ আব্দুর রহমান

مراجعة: عبد الله شهيد عبد الرحمن

2011 - 1432

IslamHouse.com

অনুবাদকের কথা

মানুষ আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সর্বোত্তম সৃষ্টি। এ সর্বোত্তম সৃষ্টির চির কল্যাণ ও শান্তি নিশ্চিত করার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাকে দান করেছেন সর্বোত্তম পথ তথা 'আল-ইসলাম'। এ পথই হচ্ছে সিরাতে মুস্তাকিম। নবিকুল শিরোমণি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জীবন ছিল এ সিরাতে মুস্তাকিমের তথা 'আল-ইসলামের' বাস্তব চিত্র।

ইসলামের সুমহান শাশ্বত জীবনাদর্শকে পুতঃপবিত্র রাখার জন্য যুগে যুগে বহু মর্দেমুজাহিদ বিরামহীন সংগ্রাম ও সাধনা করেছেন। এতদসত্ত্বেও কালের আবর্তে নিঃশব্দ নিশাচরের পদচারণার মত অতি সুক্ষ্মভাবে অনেক কুসংস্কার শিরক ও বিদআত অনুপ্রবেশ করে ইসলামের পবিত্রতাকে বাহ্যিকভাবে বহুলাংশে ক্ষুণ্ন করেছে। এর ফলে মুসলমানদের মধ্যে কোন কোন সময় সৃষ্টি হয়েছে অনেক মতভেদ ও সংঘাতের। এসব মতভেদ ও সংঘাতের আবার অবসান ও ঘটেছে মর্দেমুমিন ও মুজাহিদ মনীষীগণের ক্ষুরধার লেখনী এবং সংস্কারমূলক কার্যক্রমের মাধ্যম। القول السديد তথা 'তাওহীদের মর্মকথা' বইটি এ ধারাবাহিকতারই বলিষ্ঠ সংযোগজন। এ বইটি মূলতঃ হিজরি দ্বাদশ শতাব্দীর সূচনা লগ্নে আলোড়ন সৃষ্টিকারী মুসলিম সমাজ সংস্কারক, মুজাহিদ ও ইমাম মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব রহ.) এর লেখা كتاب التوحيد (কিতাবুত্তাওহীদ) এরই ব্যাখ্যা।

ঈমান আক্বীদা একজন মোমিন বান্দার জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ঈমান ও আক্বীদার দ্বারাই একজন মোমিনের আচার- আচরণ, আমল ও আখলাক নিয়ন্ত্রিত হয়। শিরক মিশ্রিত যে কোন আমল ইসলামের দৃষ্টিতে মূল্যহীন এবং আল্লাহর দরবারে তা প্রত্যাখ্যাত। তাই একজন মোমিনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো তার ঈমান, আকীদা ও যাবতীয় আমলকে শিরকমুক্ত রাখা, যাতে তার কোন আমল বরবাদ না হয়।

মুসলিম সমাজে এমন অনেক রুসুম- রেওয়াজ প্রচলিত রয়েছে যা ইসলামের দৃষ্টিতে শিরক ও বেদআতের অন্তর্ভুক্ত। এসব রুসুম- রেওয়াজ ও কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকা এবং সমাজ থেকে তা উচ্ছেদ করা প্রতিটি মোমিন বান্দাহর অপরিহার্য কর্তব্য।

এ বইটিতে পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদিসের আলোকে এবং অকাট্য যুক্তির মাধ্যমে মুসলিম সমাজে প্রচলিত শিরক ও বেদআত গুলিকে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

এ বইটির বঙ্গানুবাদের দায়িত্ব অর্পণ করার জন্য সৌদী আরবের রিয়াদস্থ ইমাম মুহাম্মদ বিন সউদ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় এবং দারুল আরাবিয়া বাংলাদেশ-এর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে বইটির সম্পাদনার ক্ষেত্রে দারুল আরাবিয়া বাংলাদেশ-এর চেয়ারম্যান মুহতারাম মাওলানা আবুল কালাম মোহাম্মদ ইউসুফ সাহেবের দক্ষ হস্তের পরশ বইটির মান ও সৌন্দর্যকে অধিকতর বৃদ্ধি করেছে বিধায় আমি তাঁর কাছে চির কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে এ মোনাজাত করি তিনি যেন আমাদের ঈমান, আক্বীদা ও আমলের ক্ষেত্রে সাইয়্যিদুল মুরসালীন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক প্রদর্শিত সরল ও সঠিক পথ প্রদর্শন করেন, মুসলিম উম্মাহকে যেন যাবতীয় শিরক, বিদআত ও কুসংস্কার থেকে হেফাজত করেন। পরকালীন মুক্তি ও কল্যাণ লাভের জন্য আমাদের এ সামান্য প্রচেষ্টাকে যেন কবুল করেন। আমীন।

এ, কে, এম, আবদুর রশীদ

তাং জিলহজ্জ, ১৪১৪ ইং
মে, ১৯৯৪ ইং

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার। আমরা তাঁরই গুণ গাই এবং তাঁরই কাছে সাহায্য চাই। তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাঁরই কাছে তাওবা করি। আমাদের নফ্‌সের অনিষ্টতা এবং আমাদের বদ-আমল থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। তিনি যাকে হেদায়েত করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আবার যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ হেদায়েত দান করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরিক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁরই বান্দা এবং রাসূল।

শাইখুল ইসলাম মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্‌হাব রহ. কর্তৃক প্রণীত গ্রন্থ 'কিতাবুত্তাওহীদ' এর উপর ইতিপূর্বে একটি বিষয় ভিত্তিক পর্যালোচনামূলক বই লিখেছি। এর দ্বারা কর্মব্যস্ত মানুষ এবং শিক্ষকতায় নিয়োজিত লোকদের যথেষ্ট উপকার ও কল্যাণ সাধিত হয়েছে। কারণ এতে ছিল বিষয়বস্তুর বিস্তারিত বিবরণ ও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা। অতঃপর এর চাহিদার দ্রুত বৃদ্ধির ফলে এ বই পূণর্মূদ্রণ ও প্রচার অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। এবার 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের' সংক্ষিপ্ত আক্বীদা এবং এর মৌলিক ও আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো ভূমিকায় পেশ করার বিষয়টি আমার কাছে সমীচীন বলে মনে হচ্ছে। তাই আল্লাহর সাহায্য কামনার মাধ্যমে তা পেশ করছি।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বীদা এই যে, তারা আল্লাহ, তাঁর সকল ফেরেশ্‌তা তাঁর ঐশী গ্রন্থাবলী, সকল রাসূল, পরকাল এবং তাক্‌দীরের ভাল-মন্দের উপর ঈমান রাখে।

তারা স্বাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহই হচ্ছেন একমাত্র রব, ইলাহ এবং মা'বুদ। পূর্ণাঙ্গ কামালিয়াতের দ্বারা তিনি একক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাই নিষ্ঠার সাথে তারা একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করে।

তারা বলে, একমাত্র আল্লাহই হচ্ছেন সবকিছুর স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপকার, রিজিকদাতা, সকল কিছুর দানকারী, নিষেধকারী এবং পরিকল্পনাকারী। তিনিই ইলাহ এবং আকাঙ্ক্ষিত একক মা'বুদ। তিনিই সেই প্রথম সত্তা যার পূর্বে কোন কিছুর অস্তিত্ব ছিল না। তিনিই সর্বশেষ সত্তা যার পরে কোন কিছুরই অস্তিত্ব থাকবে না। তিনিই 'যাহের' যার উর্ধে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। তিনিই 'বাতেন' যিনি ছাড়া চিরন্তন কোন সত্তা নেই।

তিনি সকল অর্থ ও বিবেচনায় শ্রেষ্ঠ জাত, মর্যাদা ও শক্তির দিক থেকে সর্বোচ্চ আসনের অধিকারী। তিনি মহান আরশে এমনিভাবে সমাসীন যেমনটি তাঁর আজমত, জালালত এবং উচ্চ মর্যাদার জন্য শোভনীয় ও সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাঁর জ্ঞান জাহের, বাতেন এবং ঊর্ধ্বলোক ও অধঃজগতকে বেষ্টন করে রেখেছে। জ্ঞানের দ্বারা তিনি বান্দার সাথেই রয়েছেন। বান্দাদের সকল অবস্থা তিনি জানেন। তিনি বান্দাদের অতি নিকটে রয়েছেন। তাদের ডাকে তিনি সাড়া দেন।

তিনি সর্বতভাবে সমস্ত সৃষ্টি জগতের কাছে মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে মুক্ত। কিন্তু সদা-সর্বদা সৃষ্টি জগতের সবকিছুই নিজের অস্তিত্বের ব্যাপারে এবং প্রয়োজন মিটানোর ব্যাপারে তাঁর মুখাপেক্ষী। কেউ কোন মুহূর্তের জন্যও তাঁর দৃষ্টির বাইরে থাকতে পারে না। তিনি ক্ষমাশীল, দয়াবান। দ্বীন ও দুনিয়ার যে কোন নেয়ামত তাঁরই কাছ থেকে আগমন করে। আবার যে কোন দুঃখ তিনিই দূর করেন। তিনিই কল্যাণ দানকারী এবং দুঃখ লাঘবকারী।

তাঁর করুণার নিদর্শন স্বরূপ তিনি রাতের শেষ তৃতীয়াংশ দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন এবং বান্দাদেরকে তাদের প্রয়োজনের কথা তাঁর কাছে পেশ করতে বলেন। তিনি বলতে থাকেন, আমাকে ডাকার মত কে আছে? আমি তার ডাকে সাড়া দেব। আমার কাছে চাওয়ার মত কে আছে? আমি তাকে দান করব। আমার কাছে ক্ষমা চাওয়ার মত কে আছে? আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। ফজর পর্যন্ত এভাবে তিনি ডাকতে থাকেন। তিনি তাঁর মর্জি মোতাবেক আকাশে অবতরণ করেন এবং নিজ ইচ্ছা মোতাবেক কাজ করেন। "কোন কিছুই তাঁর মত নয়, তিনি সব কিছুই দেখেন এবং শুনেন।"

তারা বিশ্বাস করে যে, তিনিই একমাত্র হাকিম [মহা কৌশলি]। তাঁর "শরীয়ত" ও নির্ধারিত 'তাকদীর' উভয় ক্ষেত্রে মহা কৌশল নিহিত আছে। কোন কিছুই তিনি অনর্থক সৃষ্টি করেননি। একমাত্র কল্যাণ ও কৌশলের স্বার্থেই শরিয়তের বিধান দান করেছেন।

তিনি তাওবা কবুলকারী, মার্জনাকারী এবং ক্ষমাশীল। বান্দাদের তাওবা তিনি কবুল করেন এবং তাদের অন্যায়গুলোকে ক্ষমা করে দেন। যারা তাওবা করেন, ক্ষমা চায় এবং তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করে তাদের বড় বড় গুনাহকে তিনি ক্ষমা করে দেন। যে ব্যক্তি সামান্য আমলের মাধ্যমেও তাঁর শুকরিয়া জ্ঞাপন করে তার শুকরিয়া তিনি গ্রহণ করেন। আর শুকরিয়া জ্ঞাপনকারীদের জন্য তিনি তাঁর করুণা আরো বৃদ্ধি করে দেন।

তারা আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা এমনভাবে করে, যেভাবে আল্লাহ নিজে তাঁর প্রশংসা করেছেন এবং রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে তাঁর জাত-সত্তা সম্পর্কে প্রশংসা করেছেন। যেমনঃ

(১) হায়াতে কামেলা [অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ জীবন], শ্রবণশক্তি, দৃষ্টি শক্তি, পরিপূর্ণ কুদরত, মহত্ত্ব, বড়ত্ব, মাজদ, জালালত, সৌন্দর্য ও নিরঙ্কুশ প্রশংসার অধিকারী হওয়া।

(২) কর্মগুণ : যা তাঁর ইচ্ছা ও কুদরতের সাথে সম্পৃক্ত। যেমনঃ রহমত, সন্তুষ্টি, অসন্তুষ্টি এবং কথা বলার গুণ। তিনি কথা বলেন। যা ইচ্ছা তাই করেন, যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে করেন। তাঁর কথা নিঃশেষ হয় না, ধ্বংস হয় না। কুরআন আল্লাহর কালাম কিন্তু "মাখলুক" নয়। এ কালামের সূচনা হয়েছে তাঁরই কাছ থেকে। আবার তাঁরই কাছে ফিরে যাবে।

(৩) আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা করেই ছাড়েন। তাঁর এ সিফাত বা গুণ ছিল, আছে এবং থাকবে। যা ইচ্ছা করেন তাই বলেন, 'কুদরী' 'শরয়ী' এবং 'জাযায়ী' অর্থাৎ তাকদীর, শরীয়ত ও 'পরিণামের' বিধান মোতাবেক তিনি তার বান্দাদের উপর হুকুম জারি করেন। একমাত্র তিনিই হচ্ছেন হুকুমদাতা প্রভু। তিনি ছাড়া সবাই চাকর ও হুকুমের তাঁবেদার। তাই তাঁর রাজত্ব ও হুকুমের বাইরে যাওয়ার কোন অবকাশ বান্দার নেই।

তারা কুরআনে করিমে নাজিলকৃত সব কিছুই বিশ্বাস করে। এর সাথে সাথে সহীহ সুন্নতকেও বিশ্বাস করে। মুমিনগণ আখেরাতে প্রকাশ্যে আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পাবে। তাঁর দর্শন লাভের নেয়ামত এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে যে বিজয় অর্জিত হবে তার চেয়ে বড় নেয়ামত, ও সুখানুভূতি আর কিছুই নেই।

যারা ঈমান ও তাওহীদ ব্যতীত মৃত্যু বরণ করবে তারা চির জাহান্নামি হবে। পক্ষান্তরে ইমানদার ব্যক্তি যদি কবিরা গুনাহ করে বিনা তওবায় মৃত্যু বরণ করে, গুনাহ মাফ ও শাফাআ'তের কোন উপায় না থাকে, তবে জাহান্নামে গেলেও সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে না। বিন্দু পরিমাণ ঈমান অন্তরে থাকলেও একদিন না একদিন জাহান্নাম থেকে বের হবেই।

অন্তরের আক্বীদা ও আমল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। এমনকি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্যকলাপ এবং মুখের কথাও এর মধ্যে শামিল। পরিপূর্ণরূপে যে ব্যক্তি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কাজে লাগাবে সেই সত্যিকারের মোমিন, সেই সওয়াবের অধিকারী হবে এবং শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হক আদায়ের ব্যাপারে যে যতটুকু কম দায়িত্ব পালন করবে তার ঈমানও ততটুকু হ্রাস পাবে। এ কারণেই আনুগত্য ও কল্যাণমূলক কাজের দ্বারা ঈমান বৃদ্ধি পায় পক্ষান্তরে নাফরমানি ও অন্যায়মূলক কাজের মাধ্যমে ঈমান হ্রাস পায়।

তাদের মৌলিক নীতি হলো দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণমূলক কাজে চেষ্টা সাধনা করা এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া। তাই কল্যাণমূলক কাজে তারা খুবই আগ্রহ রাখে এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য চায়।

এমনিভাবে তারা তাদের যাবতীয় আচার-আচরণে পূর্ণ ইখলাসের পরিচয় দেয়। ইখলাসের ক্ষেত্রে তারা আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য করে। মা'বুদের সন্তুষ্টি লাভের জন্য এবং রাসূলের অনুসরণের জন্য উক্ত ইখলাস আল্লাহর জন্যই নিবেদন করে। মোমিনদেরকে তারা নসিহত করে সঠিক পথ অনুসরণ করার জন্য।

তারা আরো সাক্ষ্য দেয় যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা এবং তাঁরই রাসূল। হেদায়াত এবং দ্বীনে হক দিয়ে তাঁকে আল্লাহ পাঠিয়েছেন সমগ্র দ্বীনের উপর বিজয় অর্জন করার জন্য। তিনি সর্বশেষ নবী। মানুষ ও জিন জাতির কাছে সুসংবাদ দাতা এবং ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। আল্লাহর নির্দেশেই তিনি 'দায়ী ইলাল্লাহ' হিসেবে এবং উজ্জ্বল প্রদীপ হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণের জন্য তাঁকে পাঠানো হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সৃষ্টি জগৎ যেন একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করে এবং তাঁর রিজিকের মাধ্যমে তাঁর ইবাদতের জন্য তাঁর কাছে সাহায্য কামনা করে।

তারা জানে যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই হচ্ছেন সৃষ্টিকুলের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী, সবচেয়ে সত্যবাদী, সর্বোত্তম উপদেশ দাতা, এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বাগ্মী। তারা তাঁকে সম্মান করে এবং ভালোবাসে। সমগ্র সৃষ্টিকুলের মুহব্বতের উপর তাঁর মুহব্বতকে অগ্রাধিকার দেয়। দ্বীনের মৌলিক ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে তারা তাঁর আনুগত্য করে।

তারা যে কোন মানুষের কথা ও হিদায়াতের উপর তাঁর কথা ও হিদায়াতকে অগ্রাধিকার দেয়।

তারা আরো বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যে মর্যাদা, বৈশিষ্ট্য, কামালিয়াত বা পূর্ণাঙ্গতা দান করেছেন অন্য কারো জন্য তা দান করেননি। তিনি মান ও মর্যাদার দিক থেকে গোটা সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বোচ্চ আসনের অধিকারী। সকল মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যে তিনি পরিপূর্ণ। উম্মতের জন্য এমন কোন কল্যাণ নেই যা তিনি দেখিয়ে যাননি। এমন কোন অকল্যাণও নেই যার ব্যাপারে তিনি তাদেরকে সতর্ক করে দেননি।

এমনিভাবে আল্লাহর নাজিলকৃত সকল আসমানি কিতাবকে তারা বিশ্বাস করে। আল্লাহর প্রেরিত সকল রাসূলকে তারা বিশ্বাস করে। কোন নবীর মধ্যে তারা পার্থক্য করে না। [কাউকে খাট করে দেখে না]।

তারা তাকদীরের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখে। তারা বিশ্বাস করে যে, বান্দার ভাল-মন্দ যাবতীয় কাজ আল্লাহর জ্ঞানের আওতাধীন। তারা মনে করে যে তাকদীরের লিখন সংঘটিত সকল কাজের উপর প্রয়োগ হয়েছে। তাঁর ইচ্ছা এতে কাজ করেছে। কোন না কোন হিকমত এর সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে। বান্দার জন্য তাকদীর এবং ইচ্ছা উভয়টাই সৃষ্টি করা হয়েছে। এর দ্বারাই তাদের ইচ্ছা

মোতাবেক তাদের কথা-বার্তা ও কর্ম-কাণ্ড সংঘটিত হয়। কোন ব্যাপারেই তাদেরকে জবরদস্তি করা হয় না। বরং তারা এ ব্যাপারে স্বাধীন। মোমিনদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ইমানকে ভালোবাসার বস্তু বানিয়ে দিয়েছেন, এবং ঈমানকে তাদের অন্তরে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে কুফরি, অশ্লীলতা, নাফরমানিকে তাদের অন্তরে ঘৃণার বস্তু বানিয়ে দিয়েছেন। এটা মূলত তাঁরই ন্যায় নীতি ও হিকমতের অংশ।

আহলে সুন্নাতের আরো একটি মৌলিক নীতি হচ্ছে, তারা বিশ্বাস করে, নসিহত হচ্ছে আল্লাহ, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূল, মুসলমানদের ইমাম ও সাধারণ মুসলমানদের জন্য। তারা শরিয়তের পক্ষ থেকে আরোপিত দায়িত্বানুযায়ী 'আমর বিল মা'রূফ' এবং 'নাহি আনিল মুনকার' এর কাজ করে। তারা পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার নির্দেশ দেয়। প্রতিবেশী, অধীনস্থ চাকর-বাকর ও কর্মচারী এবং তাদের উপর যারই অধিকার আছে তাদের প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দেয়। এমন কি গোটা সৃষ্টিকুলের প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দেয়।

তারা উন্নত ও মহৎ চরিত্রের আহ্বান জানায়। খারাপ ও দুশ্চরিত্রের অনিষ্টতা থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেয়। তারা আরো বিশ্বাস করে যে, ঈমান ও ইয়াক্বীনের দিক থেকে পূর্ণাঙ্গ মোমিন হচ্ছে তারা, যারা আমল ও আখলাকের দিক থেকে সবচেয়ে উত্তম, কথায় সবচেয়ে সত্যবাদী, কল্যাণ ও মর্যাদার দিক থেকে বেশি নিকটবর্তী আর দুশ্চরিত্র থেকে দূরবর্তী।

তারা শরিয়তের বিধান জারি করার ব্যাপারে তাদের রাসূলের কাছ থেকে যে নির্দেশ প্রাপ্ত হয়েছে তার পূর্ণ বৈশিষ্ট্যের দাবি অনুযায়ী অপরকে আদেশ দেয় এবং তার বিভ্রান্তি ও ত্রুটির ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়।

তারা মনে করে 'জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ' হচ্ছে দ্বীনের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। জিহাদ হতে হবে কখনো জ্ঞান ও দলিল প্রমাণের মাধ্যমে আবার কখনো অস্ত্রের মাধ্যমে। স্বীয় সামর্থ্য ও শক্তি অনুযায়ী দ্বীনের পক্ষে জিহাদ করা প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরজ।

তাদের আরো একটি মৌলিক নীতি হচ্ছে মুসলমানদের ঐক্যের প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করা এবং মুসলমানদের পারস্পরিক আন্তরিকতা ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে জোরদার করার জন্য প্রচেষ্টা করা। সাথে সাথে পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা, হানা-হানি, হিংসা-বিদ্বেষ এবং এমন সব কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে সতর্ক থাকা যেগুলো নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে নিয়ো যায়।

তাদের মূলনীতির আরো একটি দিক হচ্ছে, মানুষের জান-মাল, ইজ্জত-সম্মান ও অধিকার ইত্যাদি ক্ষেত্রে কাউকে কষ্ট না দেয়া, আর যাবতীয় আচার-

আচরণের মধ্যে ন্যায়-নীতি ও সুবিচার কায়েম করা। এতেই নিহিত রয়েছে সৃষ্টির প্রতি এহসান ও মর্যাদা।

তারা আরো বিশ্বাস করে, সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত বা জাতি হচ্ছে 'উম্মতে মুহাম্মদী'। তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী হচ্ছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবায়ে কেরাম। বিশেষ করে খোলাফায়ে রাশেদীন, জান্নাতের শুভ সংবাদপ্রাপ্ত সাহাবায়ে কেরাম, বদর যুদ্ধে এবং বাইয়া'তে রেদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবায়ে কেরাম, মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে অগ্রবর্তী সাহাবায়ে কেরাম। তারা সাহাবায়ে কেরামকে ভাল বাসে। তারা তাঁদের ভাল কাজের জন্য প্রশংসা করে এবং তাঁদের দোষ ত্রুটির ব্যাপারে চুপ থাকে।

হিদায়াতের কাজে নিয়োজিত উলামায়ে কেরাম এবং ন্যায়- পরায়ণ ইমামদেরকে সম্মান করার বিষয়টিকে তারা দ্বীনের কাজ মনে করে। মুসলমানদের মধ্যে যাদের উচ্চ মর্যাদা ও সম্মান রয়েছে তাদেরকেও তারা ইজ্জত করে। তারা তাঁদের জন্য আল্লাহর কাছে এই দোয়া করে, তাদেরকে যেন সংশয়, শিরক, বিচ্ছিন্নতা, মোনাফিকী, এবং চারিত্রিক অনিষ্টতা থেকে তিনি হেফাজত করেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত তাঁদেরকে যেন তাঁদের নবীর দ্বীনের উপর অটল অবিচল রাখেন।

এই মৌলিক নীতিমালাকে তারা বিশ্বাস করে। এগুলোকেই তাদের আক্বীদার অংশ মনে করে এবং এগুলোর প্রতিই মানুষকে আহ্বান জানায়।

১ম অধ্যায়:
তাওহীদ

১। আল্লাহ তা‘আলা এরশাদ করেছেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

“আমি জিন এবং মানব জাতিকে একমাত্র আমার ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছি।” (যারিয়াত . ৫৬)।

২। আল্লাহ তা‘আলা আরো এরশাদ করেছেন,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ (النحل: ٣٦)

“আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি। [তাঁর মাধ্যমে এ নির্দেশ দিয়েছি] তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, আর তাগুতকে বর্জন করো।” (নাহল: ৩৬)

আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র এরশাদ করেছেন,

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا (الإسراء: ٢٣)

ব্যাখ্যা

আত্তাওহীদ : এ শিরোনামই বইটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কি উদ্দেশ্য প্রণীত হয়েছে তারই প্রমাণ পেশ করছে। এ কারণেই বইটির লেখক কোন ভূমিকা দেয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি। এ বইটিতে “তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ ওয়াল ইবাদা” অর্থাৎ উলুহিয়্যাত এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে তাওহীদের বিস্তারিত বর্ণনাসহ তার হুকুম সীমা, শর্ত, মর্যাদা, প্রমাণ, মূলনীতি, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, কারণ, ফলাফল, দাবি, কিসে তা বৃদ্ধি পায়, কিসে তা শক্তিশালী হয় অথবা কিসে তা দুর্বল হয়, ক্ষীণ হয়, আবার কিসে তার সমাপ্তি ঘটে বা পূর্ণতা অর্জিত হয় ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। তাওহীদে মুতলাক বা নিরঙ্কুশ তাওহীদ হচ্ছে, আল্লাহ তা‘আলাকে সিফাতে কামাল বা পূর্ণাঙ্গ গুণাবলিতে একক বলে জানা এবং মানা। আজমত, জালালত, শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের গুণে তিনি যে একক, দৃঢ়তার সাথে তার ঘোষণা দেয়া এবং ইবাদতের মাধ্যমে তাঁর একত্বের প্রমাণ দান।

তাওহীদ তিন প্রকার .

১। তাওহীদুল আসমা ওয়াস্ সিফাত [অর্থাৎ আল্লাহর নাম ও গুণাবলির তাওহীদ] আল্লাহ তা‘আলা শ্রেষ্ঠত্ব মহত্ত্ব ও সৌন্দর্যের যাবতীয় গুণাবলিতে এক, একক এবং

৩। “তোমার রব এ নির্দেশ দিয়েছেন যে তাঁকে ছাড়া তোমরা আর কারো ইবাদত করো না। আর মাতা-পিতার সাথে সদ্‌ব্যবহার করো”। (ইসরা: ২৩)

৪। সূরা নিসাতে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

وَاعْبُدُوا اللهَّ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا (النساء: ٣٦)

“তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। আর তাঁর সাথে কাউকে শরিক করো না।” (নিসা: ৩৬)

৫। সূরা আনআমে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন,

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا (الأنعام: ١٥١)

“হে মুহাম্মদ বলো, [হে আহলে কিতাব] তোমরা এসো তোমাদের রব তোমাদের জন্য যা হারাম করে দিয়েছেন তা পড়ে শুনাই। আর তা হচ্ছে এই, “তোমরা তাঁর সাথে কাউকে শরিক করবে না।” (আনআম: ‘১৫১)

৬। ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন,

من أراد ان ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التى عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا..... وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا﴿١٥٣﴾

নিরঙ্কুশভাবে পূর্ণতার অধিকারী। এ ক্ষেত্রে কোনক্রমেই কেউ তাঁর অংশীদার হতে পারে না। উপরোক্ত আক্বীদা পোষণ করার নামই হচ্ছে আসমা ও সিফাতের তাওহীদ। আল্লাহ তা‘আলার আজমত এবং জালালতের সাথে শোভনীয় ও সামঞ্জস্যশীল অনেক ইসম ও সিফাত, [নাম ও গুণাবলি] এর অর্থ এবং হুকুম আহকাম কুরআন ও সুন্নায় বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে আল্লাহ তাঁর নিজ সত্তার জন্য এবং রাসূল সাহাবী তাঁর [আল্লাহর] জন্য যেগুলোকে ইতিবাচক বলে ঘোষণা দিয়েছেন, সেগুলোকে ইতিবাচক হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। এর কোন একটিকেও অস্বীকার করা যাবে না, নিরর্থক বা অকার্যকর বলা যাবে না, পরিবর্তন করা যাবে না এবং আকার আকৃতিও দেয়া যাবে না। সাথে সাথে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আল্লাহর কামালিয়াতের ক্ষেত্রে যেসব দোষ-ক্রটিকে নেতিবাচক হিসেবে ঘোষণা করেছেন সেগুলোকে নেতিবাচক হিসেবেই গ্রহণ করতে হবে।

"যে ব্যক্তি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মোহরাঙ্কিত অসিয়ত দেখতে চায়, সে যেন আল্লাহ তাআলার এ বাণী পড়ে নেয়, "হে মুহাম্মদ বলো, তোমাদের রব তোমাদের উপর যা হারাম করেছেন তা পড়ে শুনাই। আর তা হলো, তোমরা তাঁর সাথে কাউকে শরিক করবে না . . . . আর এটাই হচ্ছে আমার সরল, সোজা পথ"।

৭। সাহাবী মুআয বিন জাবাল রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিছনে একটি গাধার পিঠে বসে ছিলাম। তিনি আমাকে ডাক দিয়ে বললেন,"

يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد، وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا (أخرجاه في الصحيحين)

"হে মুআয, তুমি কি জানো, বান্দার উপর আল্লাহর কি হক রয়েছে? আর আল্লাহর উপর বান্দার কি হক আছে? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, বান্দার উপর আল্লাহর হক হচ্ছে তারা তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক করবে না। আর আল্লাহর উপর বান্দার হক হচ্ছে "যারা তার সাথে

২। রুবুবিয়্যাতের তাওহীদ (توحيد الربوبية)

সৃষ্টি করা, রিজিক দান, এবং [সমগ্র সৃষ্টি জগৎ] নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলাই হচ্ছেন এক ও অভিন্ন রব বা প্রতিপালক। যিনি অফুরন্ত নেয়ামতের মাধ্যমে গোটা সৃষ্টি জগৎকে প্রতিপালন করছেন। তাঁর বিশেষ সৃষ্টি তথা আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং তাঁদের অনুসারীগনকে সহীহ আক্বীদা, উত্তম চরিত্র, কল্যাণমূলক জ্ঞান এবং নেক আমলের মাধ্যমে সমৃদ্ধ ও দীক্ষিত করেছেন। ইহকালীন ও পরকালীন সুখ শান্তি লাভের ক্ষেত্রে সৃজনশীল মন ও আত্মার জন্য এটাই হচ্ছে কল্যাণময় শিক্ষা। বান্দার এ আক্বীদা পোষণের নামই হচ্ছে রুবুবিয়্যাতের তাওহীদ।

৩। তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ বা (توحيد العبادة) একমাত্র আল্লাহ তাআলাকেই তাঁর সমগ্র সৃষ্টি জগতের উপর উলুহিয়্যাত এবং উবুদিয়্যাতের অধিকারী হিসেবে জানা এবং স্বীকার করা আর যাবতীয় ইবাদতের মাধ্যমে তাঁর একত্বের প্রমাণদান। সাথে সাথে একমাত্র আল্লাহর জন্যেই ইবাদতকে নিরঙ্কুশ করা।

কাউকে শরিক করবে না, তাহলে তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন না।” আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি কি এ সুসংবাদ লোকদেরকে জানিয়ে দেব না? তিনি বললেন, তুমি তাদেরকে এ সুসংবাদ দিওনা, তাহলে তারা ইবাদত ছেড়ে দিয়ে [আল্লাহর উপর ভরসা করে] হাত গুটিয়ে বসে থাকবে। (বুখারী ও মুসলিম)

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়:

১। জ্বিন ও মানব জাতি সৃষ্টির রহস্য।

২। ইবাদতই হচ্ছে তাওহীদ। কারণ এটা নিয়েই বিবাদ।

৩। যার তাওহীদ ঠিক নেই, তার ইবাদতও ঠিক নেই। এ কথার মধ্যে ﴿وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٣﴾ এর অর্থ নিহিত আছে।

৪। রাসূল পাঠানোর অন্তর্নিহিত হিকমত বা রহস্য।

৫। সকল উম্মতই রিসালতের আওতাধীন ছিল।

৬। আম্বিয়ায়ে কেরামের দীন এক ও অভিন্ন।

৭। মূল কথা হচ্ছে, তাগুতকে অস্বীকার করা ব্যতীত ইবাদতের মর্যাদা অর্জন করা যায় না।

৮। আল্লাহর ইবাদত ব্যতীত আর যারই ইবাদত করা হয়, সেই তাগুত হিসেবে গণ্য।

৯। সালাফে-সালেহীনের কাছে সূরা আনআমের উল্লেখিত তিনটি মুহকাম আয়াতের বিরাট মর্যাদার কথা জানা যায়। এতে দশটি বিষয়ের কথা রয়েছে। এর প্রথমটিই হচ্ছে; শিরক নিষিদ্ধ করণ।

১০্ সূরা ইস্রায় কতগুলো মুহকাম আয়াত রয়েছে। এবং তাতে

শেষোক্ত তাওহীদের জন্য প্রথমোক্ত উভয় প্রকারের তাওহীদই অনিবার্য। এ জন্যই প্রথমোক্ত উভয় প্রকার তাওহীদই শেষোক্ত তাওহীদের অন্তর্ভুক্ত। কেননা উলুহিয়্যাত এমন একটি ব্যাপক গুনের নাম, কামালিয়াত, রুবুবিয়্যাত এবং শ্রেষ্ঠত্বের সমস্ত গুণাবলি যার অন্তর্ভুক্ত। তাই তাঁর আজমত ও জালালত অর্থাৎ শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের গুণে এবং সৃষ্টির প্রতি তাঁর অপরিসীম করুণা ও মেহেরবানির গুণেই তিনি ইলাহ এবং মা'বুদ হওয়ার যোগ্য। তাঁর সিফাতে কামাল তথা পরিপূর্ণ গুণাবলি এবং একক রুবুবিয়্যাতের দাবি হচ্ছে, তিনি ব্যতীত অন্য কাউকে ইবাদতের হকদার হতে পারে না।

আঠারোটি বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ বিষয়গুলোর সূচনা করেছেন তাঁর বাণী-

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا ﴿٢٢﴾

এর মাধ্যমে, আর সমাপ্তি ঘোষণা করেছেন তাঁর বাণী-

وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا

এর মাধ্যমে। সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা এ বিষয়টির সুমহান মর্যাদাকে উপলব্ধি করার জন্য তাঁর বাণী,

ذَٰلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ

এর মাধ্যমে আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন।

১১। সূরা নিসার 'আল- হুকুকুল আশারা' [বা দশটি হক] নামক আয়াতের কথা জানা গেলো। যার সূচনা হয়েছে আল্লাহ তাআলার বাণী,

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

এর মাধ্যমে। যার অর্থ হচ্ছে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, আর তাঁর সাথে কাউকে শরিক করো না।

১২। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অন্তিমকালের অসিয়তের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন।

১৩। আমাদের উপর আল্লাহ তাআলার হক সম্পর্কে জ্ঞানার্জন।

১৪। বান্দা যখন আল্লাহর হক আদায় করবে, তখন আল্লাহ তাআলার উপর বান্দার হক সম্পর্কে জ্ঞানার্জন।

১৫। অধিকাংশ সাহাবীই এ বিষয়টি জানতেন না।

১৬। কোন বিশেষ স্বার্থে এলেম (জ্ঞান) গোপন রাখার বৈধতা।

১৭। আনন্দদায়ক বিষয়ে কোন মুসলিমকে খোশখবর দেয়া মুস্তাহব।

১৮। আল্লাহর অপরিসীম রহমতের উপর ভরসা করে আমল বাদ দেয়ার ভয়।

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দুনিয়াতে যত নবী-রাসূল আগমন করেছেন, তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল এ তাওহীদের দিকেই মানুষকে আহ্বান করা। বইটির প্রণেতা এ অধ্যায়টিতে কুরআন ও সুন্নাহর যে সব উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেছেন, তা দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তাআলা গোটা সৃষ্টি জগৎকে তাঁরই ইবাদত করার জন্য এবং তাঁরই প্রতি একনিষ্ঠ হওয়ার জন্য সৃষ্টি করেছেন। এটাই হচ্ছে বান্দার উপর আল্লাহর ফরজকৃত অপরিহার্য হক বা অধিকার।

১৯। অজানা বিষয়ে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির الله ورسوله أعلم [অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সবচেয়ে ভাল জানেন] বলা।

২০। কাউকে বাদ রেখে অন্য কাউকে জ্ঞান দানে বিশেষিত করার বৈধতা।

২১। একই গাধার পিঠে পিছনে আরোহণকারীর প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দয়া ও নম্রতা প্রদর্শন।

২২। একই পশুর পিঠে একাধিক ব্যক্তি আরোহণের বৈধতা।

২৩। মুআয বিন জাবাল রা. এর মর্যাদা।

২৪। আলোচিত বিষয়টির মর্যাদা ও মহত্ব।

যাবতীয় আসমানি গ্রন্থ এবং সমস্ত নবী ও রাসূল, এ তাওহীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন এবং বিপরীত ধ্যান-ধারণা তথা শিরক ও অংশিবাদিতাকে নিষিদ্ধ করেছেন। বিশেষ করে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মহা গ্রন্থ আল কুরআন এ তাওহীদকে ফরজ করেছেন। দৃঢ়তার সাথে এর ঘোষণা দিয়েছেন এবং বলিষ্ঠ ভাষায় এর বর্ণনা দিয়েছেন। সাথে সাথে একথা জানিয়ে দিয়েছেন যে, এ তাওহীদ ব্যতীত কোন ইবাদত-বন্দেগি গ্রহণযোগ্য নয়। সকল আকলী [যুক্তি ভিত্তিক] নকলী [তথ্যগত] প্রান্তিক ও নফসী প্রমাণাদি এ তাওহীদেরই অপরিহার্যতার প্রমাণ পেশ করে।

অতএব, তাওহীদ হচ্ছে আল্লাহ তাআলার হক যা বান্দার উপর ওয়াজিব। তাওহীদ দ্বীনের সর্বশ্রেষ্ঠ বুনিয়াদ। সকল মূলনীতির মূল এবং আমলের ভিত্তি।

২য় অধ্যায় :

তাওহীদের মর্যাদা

১। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ (الأنعام:٨٢)

"যারা ঈমান এনেছে এবং ঈমানকে জুলুম [শিরক] এর সাথে মিশ্রিত করেনি" [তাদের জন্যই রয়েছে শান্তি ও নিরাপত্তা] (আনআম : ৮২)

২। সাহাবী উবাদা ইবনে সামেত রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল সাহাবী এরশাদ করেছেন,

من شهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق، والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. (أخرجاه)

"যে ব্যক্তি এ সাক্ষ্য দান করল যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি একক। তাঁর কোন শরিক নেই। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। ঈসা আ. আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। তিনি তাঁর এমন এক কালিমা যা তিনি মরিয়াম আ. এর প্রতি প্রেরণ করেছেন এবং তিনি তাঁরই পক্ষ থেকে প্রেরিত রুহ বা আত্মা। জান্নাত সত্য জাহান্নাম

ব্যাখ্যা

তাওহীদের মর্যাদা :

পূর্বের অধ্যায়ে তাওহীদ ওয়াজিব হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাওহীদ যে বান্দার উপর একটি সুমহান ফরজ কাজ, তাও আলোচিত হয়েছে। এ অধ্যায়ে তাওহীদের ফজিলত, বান্দার উপর এর প্রশংসনীয় প্রভাব এবং সুফলের বিষয় আলোচিত হয়েছে। তাওহীদের মত উত্তম প্রভাবশীল ও অসীম ফজিলত পূর্ণ অন্য কোন বস্তু নেই। কেননা এ তাওহীদের ফলাফল এবং ফজিলত থেকেই দুনিয়া ও আখেরাতের মঙ্গল ও কল্যাণ অর্জিত হয়।

গ্রন্থ প্রণেতার وما يكفر من الذنوب কথাটুকু মূলত: 'আম' বিষয়ের উপর 'খাস' বিষয়ের আতফ্ করা হয়েছে। [অর্থাৎ সাধারণ বিষয়কে বিশেষ বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে] কেননা গুনাহ মাফ করা, আর গুনাহ সমূহ মিটিয়ে দেয়া মূলত : তাওহীদের অসীম ফজিলত ও প্রভাবেরই অন্তর্ভুক্ত। মূল আলোচনায় এর প্রমাণাদি উল্লেখ করা হয়েছে।

সত্য। সে ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা জান্নাত দান করবেন, তার আমল যাই হোক না কেন। (বুখারী ও মুসলিম)

সাহাবী ইতবানের হাদিসে বর্ণিত আছে, ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদিসটি সংকলন করেছেন,

فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله.

"আল্লাহ তা'আলা এমন ব্যক্তির উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিয়েছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেছে।'

৩। প্রখ্যাত সাহাবী আবু সাঈদ খুদরী রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি এরশাদ করেছেন, মুসা আ. বললেন,

يارب علمني شيئاً أذكرك وأدعوك به، قال: قل يا موسى لا إله إلا الله، قال: كل عبادك يقولون هذا، قال: يا موسى لو أن السموات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. (رواه ابن حبان والحاكم وصححه)

তাওহীদের ফজিলত:

দুনিয়া ও আখেরাতের নানা ধরনের বিপদ-আপদ ও দুর্দশা থেকে পরিত্রাণ লাভের প্রধান অবলম্বন হচ্ছে তাওহীদ।

তাওহীদের সবচেয়ে বড় উপকারিতা হচ্ছে, তাওহীদ বান্দার চির জাহান্নামি হওয়ার পথ রোধ করে, যদি তার অন্তরে সরিষা দানা পরিমাণ তাওহীদও বিদ্যমান থাকে। ঐ বান্দার অন্তরে যদি তাওহীদ পরিপূর্ণভাবে অর্জিত হয়, তাহলে তা সম্পূর্ণ রূপে বান্দার জন্য জাহান্নামের পথ রোধ করে।

তাওহীদবাদী ব্যক্তি পরিপূর্ণ হেদায়াত পায় এবং দুনিয়া ও আখেরাতে পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করে,

আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও পুণ্য লাভের একমাত্র উপায় হচ্ছে "তাওহীদ"। খালেস দিলে বা একনিষ্ঠ চিত্তে যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাফাআত লাভের দ্বারা সেই হবে সবচেয়ে ধন্য।

তাওহীদের সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব এই যে, বান্দার যাবতীয় জাহেরী-বাতেনী কথা ও কাজ আল্লাহর কাছে গৃহীত হওয়া, পূর্ণতা লাভ করা এবং সওয়াব প্রাপ্তি ইত্যাদি বিষয়গুলো তাওহীদের উপর নির্ভরশীল।

তাওহীদ এবং আল্লাহর প্রতি ইখলাস যখনই মজবুত হবে, তখনই উপরোক্ত বিষয়গুলো পরিপূর্ণরূপে সম্পন্ন হবে।

“হে আমার রব, আমাকে এমন জিনিস শিক্ষা দিন যা দ্বারা আমি আপনাকে স্মরণ করব এবং আপনাকে ডাকবো। আল্লাহ বললেন, ‘হে মুসা, তুমি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলো। মুসা বললেন, “আপনার সব বান্দাই তো এটা বলে।” তিনি বললেন, “হে মুসা, আমি ব্যতীত সপ্তাকাশে যা কিছু আছে তা, আর সাত তবক জমিন যদি এক পাল্লায় থাকে আরেক পাল্লায় যদি শুধু লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ থাকে, তাহলে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর পাল্লাই বেশি ভারী হবে।”

(ইবনে হিব্বান, হাকিম)

৪। বিখ্যাত সাহাবী আনাস রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, ‘আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে এ কথা বলতে শুনেছি,

قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بى شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. (رواه الترمذي وحسنه)

“আল্লাহ তাআলা বলেছেন, “হে আদম সন্তান, তুমি দুনিয়া ভর্তি গুনাহ নিয়ে যদি আমার কাছে হাজির হও, আর আমার সাথে কাউকে শরিক না করা অবস্থায় মৃত্যু বরণ করো, তাহলে আমি দুনিয়া পরিমাণ মাগফিরাত নিয়ে তোমার দিকে এগিয়ে আসবো”। (তিরমিযী)

তাওহীদের আরো ফজিলত হচ্ছে, তাওহীদ বান্দার জন্য নেক কাজ করার পথকে সুগম করে দেয়, অন্যায় কাজ পরিত্যাগ করাকে সহজ করে দেয় এবং বিপদাপদে শান্তনা জোগায়। তাই ঈমান ও তাওহীদের ক্ষেত্রে মুখলিস ব্যক্তি তার রবের সন্তুষ্টি ও সওয়াব কামনা করার দরুন আল্লাহর আনুগত্য করা খুবই সহজ হয়ে যায়। এমনিভাবে তার কুপ্রবৃত্তি যে সব পাপ কাজ করার জন্য তাকে প্ররোচিত করে আল্লাহর গজব এবং শাস্তির ভয় থাকার কারণে সে সব কাজ পরিত্যাগ করাও তার জন্য সহজ হয়ে যায়।

বান্দার হৃদয়ে যখন তাওহীদ পূর্ণতা লাভ করে তখন আল্লাহ তাআলা বান্দার অন্তরে ঈমানের প্রতি ভালোবাসা দান করেন এবং তার অন্তরে তাওহীদকে সুসজ্জিত করেন। কুফরি, ফাসেকী এবং নাফরমানিকে তার জন্য ঘৃণার বস্তু বানিয়ে দেন। সাথে সাথে তাকে হেদায়াত প্রাপ্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেন।

তাওহীদ বান্দার দুঃখ-দুর্দশা ও কষ্ট লাঘব করে। বান্দা তাওহীদ ও ঈমানের পূর্ণতা অনুযায়ী দুঃখ কষ্ট ব্যথা ও বেদনাকে উদার চিত্তে এবং প্রশান্ত মনে গ্রহণ করে নেয়। সাথে সাথে আল্লাহর দেয়া ভাগ্যলিপির দুঃখ দুর্দশাকে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেয়।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো জানা যায়:-

১। আল্লাহর অসীম করুণা।

২। আল্লাহর নিকট তাওহীদের অপরিসীম সওয়াব।

৩। গুনাহ সত্ত্বেও তাওহীদের দ্বারা পাপ মোচন।

৪। সূরা আন আন-আমের ৮২ নং আয়াতের তাফসীর।

৫। উবাদা বিন সামেতের হাদিসে বর্ণিত পাঁচটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেয়া।

৬। উবাদা বিন সামেত এবং ইতবানের হাদিসকে একত্র করলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে এবং ধোঁকায় নিপতিত লোকদের ভুল সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়বে।

তাওহীদের সুমহান মর্যাদার বিষয় হচ্ছে এই যে, তাওহীদ বান্দাকে মাখলুকের দাসত্ব, তার সাথে সম্পর্ক, তার প্রতি ভয়, তার কাছ থেকে কিছু পাওয়ার আশা এবং তারই উদ্দেশ্যে কাজ করা ইত্যাদি থেকে মুক্তি দান করে। [অর্থাৎ সে যাই করে আল্লাহর সন্তুষ্টির লাভের জন্যই করে] মূলত: এটাই হচ্ছে বান্দার জন্য প্রকৃত সম্মান ও মর্যাদার বিষয়। এর দ্বারাই আল্লাহ তাআলাকে ইলাহ এবং মা'বুদ হিসেবে মেনে নিয়ে প্রকৃত গোলামে পরিণত হয়। ফলে সে আল্লাহ ছাড়া আর কিছুই কামনা করে না। তাঁকে ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না। একমাত্র তাঁর দরবার ছাড়া আর কারো কাছে আশ্রয় চায় না। এভাবেই তার পরিপূর্ণ কামিয়াবী আর সফলতা অর্জিত হয়।

তাওহীদের আরো ফজিলত এই যে, তাওহীদ বান্দার হৃদয়ে যখন পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং পূর্ণ ইখলাসের সাথে তা অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তার অল্প আমলই অনেক আমলে পরিণত হয়। তার কথা ও কাজের সওয়াব সীমা ও সংখ্যার হিসেব ছাড়াই বৃদ্ধি পেতে থাকে। কেননা বান্দার পাল্লায় ইখলাসকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে যার ফলে সপ্তাকাশ ও জমিনে তথা সৃষ্টি জগতে যা কিছু আছে তা সব মিলিয়েও কালিমার সমকক্ষ হয় না। এ অধ্যায়ে আলোচিত আবু সাঈদ খুদরী রা. এর হাদিস ও বেতাকার হাদিসই এর প্রমাণ। যাতে লেখা আছে "লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং যা ওজন করা হয়েছে পাপ পঙ্কিলতায় ভর্তি এমন নিরানব্বইটি খাতার সাথে যার বিস্তৃতি হচ্ছে দৃষ্টি শক্তির শেষ সীমা পর্যন্ত।

৭। ইতবান রা. হতে বর্ণিত হাদিসে উল্লেখিত শর্তের ব্যাপারে সতর্কী করণ।

৮। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর ফজিলতের ব্যাপারে সতর্কীকরণের প্রয়োজনীয়তা নবিগণের জীবনেও ছিল।

৯। সমগ্র সৃষ্টির তুলনায় এ কালিমার পাল্লা ভারী হওয়ার ব্যাপারে সতর্কীকরণ, যদিও এ কলেমার অনেক পাঠকের পাল্লা ইখলাসের সাথে পাঠ না করার কারণে হালকা হয়ে যাবে।

১০। সপ্তাকাশের মত সপ্ত জমিন বিদ্যমান থাকার প্রমাণ।

১১। জমিনের মত আকাশেও বসবাসকারীর অস্তিত্ব আছে।

১২। আল্লাহর সিফাত বা গুণাবলিকে ইতিবাচক বলে সাব্যস্ত করা যা আশআরী সম্প্রদায়ের চিন্তা ধারার সম্পূর্ণ বিপরীত।

১৩। সাহাবী আনাস রা. এর হাদিস সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর ইতবান রা. এর হাদিসে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী।

فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي به وجه الله

এর মর্মার্থ হচ্ছে শিরক বর্জন করা। শুধু মুখে বলা এর উদ্দেশ্য নয়।

১৪। নবী ঈসা আ. এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয়ই আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল হওয়ার বিষয়টি গভীর ভাবে চিন্তা করা।

১৫। "কালিমাতুল্লাহ" বলে ঈসা আ. কে খাস করার বিষয়টি জানা।

[অর্থাৎ পাপে ভর্তি বিশাল খাতাগুলোর ওজনের চেয়ে 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ' লিখিত বেতাকা বা কার্ডের ওজন বেশি। এটা সম্ভব হয়েছে কলেমা পাঠকের পূর্ণ ইখলাসের কারণে। কত লোকই তো এ কলেমা পাঠ করে কিন্তু এ [উচ্চ] স্তরে উন্নীত হতে পারে না। এর কারণ হচ্ছে কালিমা পাঠকের অন্তর পূর্ণ তাওহীদ এবং ইখলাসের দিক থেকে পূর্বোক্ত বান্দা যে স্তরে পৌঁছেছে তার সমান স্তর দূরের কথা এমনকি তার কাছাকাছি স্তরেও পৌঁছতে সক্ষম হয়নি। তাওহীদের আরো মর্যাদা এই যে, তাওহীদবাদী ব্যক্তিদের ইহ জীবনের সাফল্য, বিজয় সম্মান, হেদায়াত লাভ, সহজ পথের সুবিধা, দূরাবস্থার সংশোধন এবং কথা ও কাজে দিক নির্দেশনার ক্ষেত্রে আল্লাহর তা'আলা স্বয়ং জিম্মাদার হয়ে যান।

১৬। হযরত ঈসা আ. আল্লাহর পক্ষ থেকে রুহ (পবিত্র) আত্মা হওয়া সম্পর্কে অবগত হওয়া।
১৭। জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতি ঈমান আনার মর্যাদা।
১৮। আমল যাই হোক না কেন, এ কথার মর্মার্থ উপলব্ধি করা।
১৯। মিজানের দুটি পাল্লা আছে এ কথা জানা।
২০। আল্লাহর চেহারার উল্লেখ আছে, এ কথা জানা।

তাওহীদের ফজিলত এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাওহীদবাদীদের উপর থেকে দুনিয়া ও আখেরাতের অনিষ্ঠতা ও অকল্যাণ দূর করে দেন। এবং উত্তম ও প্রশান্তিময় জীবন দান করেন। এর ফলে আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করার মাধ্যমেই তারা শান্তি লাভ করে। এসব কথার অসংখ্য প্রমাণ কুরআন ও হাদিসে রয়েছে।

৩য় অধ্যায় .

তাওহীদের উপরে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি বিনা হিসেবে জান্নাতে যাবে

১। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন,

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿النحل:١٢٠﴾

“নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিলেন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর হুকুম পালনকারী একটি উম্মত বিশেষ। এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।” (নাহলঃ১২০)

২। আল্লাহ তাআলা আরো এরশাদ করেছেন,

وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿إبراهيم : ٥٩﴾

“আর যারা তাদের রবের সাথে শিরক করে না” (মুমিনুন: ৫৯)

৩। হুসাইন বিন আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, একবার আমি সাঈদ বিন জুবাইরের কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি বললেন, গতকাল রাত্রে যে নক্ষত্রটি ছিটকে পড়েছে তা তোমাদের মধ্যে কে দেখতে পেয়েছে? তখন বললাম, “আমি”। তারপর বললাম, ‘বিষাক্ত প্রাণী কর্তৃক দংশিত হওয়ার কারণে আমি নামাজে উপস্থিত থাকতে পারিনি’। (তিনি বললেন, ‘তখন তুমি কি চিকিৎসা করেছ?

ব্যাখ্যা

যে ব্যক্তি নিজকে তাওহীদের উপরে প্রতিষ্ঠিত করবে, সে বিনা হিসেবে জান্নাতে যাবে।

এ অধ্যায়টি পূর্বোক্ত অধ্যায়ের পরিপূরক এবং আওতাধীন। তাওহীদের উপরে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে, শিরকে আকবার ও আসগার (বড় ও ছোট শিরক), আক্বীদা সংক্রান্ত যাবতীয় কথা, কাজ ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যাবতীয় বেদআত ও পাপ পঙ্কিলতা থেকে তাওহীদকে পরিশুদ্ধ, পবিত্র ও নিষ্কলুষ রাখা। এটা করতে হবে যাবতীয় কথা, কাজ ও ইচ্ছার মধ্যে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ইখলাস বা একনিষ্ঠতা প্রদর্শনের মাধ্যমে, মূল তাওহীদের পরিপন্থী বিষয় তথা শিরকে আকবার থেকে মুক্ত থাকার মাধ্যমে এবং পূর্ণাঙ্গ তাওহীদের পরিপন্থী তথা শিরকে আসগার ও যাবতীয় বিদয়াত থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে।

বললাম “ঝাড় ফুঁক করেছি” তিনি বললেন, কিসে তোমাকে এ কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে? [অর্থাৎ তুমি কেন এ কাজ করলে?] বললাম, ‘একটি হাদিস’ [এ কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে] যা শা’বী আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি বললেন, তিনি তোমাদেরকে কি বর্ণনা করেছেন? বললাম ‘তিনি বুরাইদা বিন আল হুসাইব থেকে আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, চোখের দৃষ্টি বা চোখ লাগা এবং জ্বর ব্যতীত অন্য কোন রোগে ঝাড়- ফুঁক নেই।’ তিনি বললেন, ‘ সে ব্যক্তিই উত্তম কাজ করেছে, যে শ্রুত জিনিস শেষ পর্যন্ত আমল করতে পেরেছে’। কিন্তু ইবনে আব্বাস রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

عرضت عليّ الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت: فإذا سواد عظيم، فقيل لي : هذه أمتك، ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب.

“আমার সম্মুখে সমস্ত জাতিকে উপস্থাপন করা হলো। তখন আমি এমন একজন নবীকে দেখতে পেলাম যার সাথে অল্প সংখ্যক লোক রয়েছে। এরপর আরো একজন নবীকে দেখতে পেলাম যার সাথে মাত্র দু’জন লোক রয়েছে। আবার এমন একজন নবীকে দেখতে পেলাম যার সাথে কোন লোকই নেই। ঠিক এমন সময় আমার সামনে এক বিরাট জনগোষ্ঠী পেশ করা হলো। তখন আমি ভাবলাম, এরা আমার উম্মত। কিন্তু আমাকে বলা হলো এরা হচ্ছে মুসা আ. এবং তাঁর জাতি।

তাওহীদকে কলুষিত করে তোলে, তার পূর্ণতা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করে এবং তার সুফল লাভের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে এমন ধরনের যাবতীয় পাপ কাজ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে তাওহীদকে পবিত্র করতে হবে।

ঈমান, তাওহীদ এবং ইখলাস দ্বারা যার হৃদয় ভরে যায়, আল্লাহ তাআলার যাবতীয় নির্দেশ মেনে নেয়, গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং গুণাহর পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে তাওহীদের ব্যাঘাত ঘটায় না, বর্ণিত এসব গুণাবলির মাধ্যমে তাওহীদকে যে ব্যক্তি আঁকড়ে ধরে সে ব্যক্তিই বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করে স্বীয় মর্যাদাপূর্ণ স্থান বেছে নেয়ার ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

এরপর আরো একটি বিরাট জনগোষ্ঠীর দিকে আমি তাকালাম। তখন আমাকে বলা হলো, এরা আপনার উম্মত। এদের মধ্যে সত্তুর হাজার লোক রয়েছে যারা বিনা হিসেবে এবং বিনা আজাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। একথা বলে তিনি দরবার থেকে উঠে বাড়ির অভ্যন্তরে চলে গেলেন। এরপর লোকেরা ঐ সব ভাগ্যবান লোকদের ব্যাপারে বিতর্ক শুরু করে দিলো। কেউ বলল, তারা বোধ হয় রাসূল সাল্লাললাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সহচার্য লাভকারী ব্যক্তিবর্গ। আবার কেউ বলল, তারা বোধ হয় ইসলাম পরিবেশে অথবা মুসলিম মাতা-পিতার ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে আর আল্লাহর সাথে তারা কাউকে শরিক করেনি। তারা এ ধরনের আরো অনেক কথা বলাবলি করল। অতঃপর রাসূল সাল্লাললাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মধ্যে উপস্থিত হলে বিষয়টি তাঁকে জানানো হলো। তখন তিনি বললেন,

هم الذين لا يسترقون، ولا يتطيرون، ولا يكتون، وعلى ربهم يتوكلون.

"তারা হচ্ছে ঐ সব লোক যারা ঝাড়-ফুক করে না। পাখি উড়িয়ে ভাগ্যের ভাল-মন্দ যাচাই করে না। শরীরে সেক বা দাগ দেয় না। আর তাদের রবের উপর তারা ভরসা করে।" একথা শুনে ওয়াকাশা বিন মুহসিন দাঁড়িয়ে বলল, আপনি আমার জন্য দোয়া করুন যেন আল্লাহ তাআলা আমাকে এই সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের দলভুক্ত করে নেন। তিনি বললেন, আমি দোয়া করলাম, "তুমি তাদের দলভুক্ত"। অতঃপর অন্য একজন লোক দাঁড়িয়ে বলল, আল্লাহর কাছে আমার জন্যও দোয়া করুন যেন তিনি আমাকেও তাদের দলভুক্ত করে নেন। তিনি বললেন, "তোমার পূর্বেই ওয়াকাশা সে সুযোগ নিয়ে গেছে।"

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়:

১। তাওহীদের ব্যাপারে মানুষের বিভিন্ন স্তরে অবস্থান সম্পর্কিত জ্ঞান।

তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিশেষ প্রমাণ হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার প্রতি পরিপূর্ণ ভয় থাকা। তাঁর উপর এমনভাবে তাওয়াক্কুল বা ভরসা করা যার ফলে কোন বিষয়েই তার অন্তর মাখলুকের প্রতি আকৃষ্ট হয় না। অন্তর দ্বারা তার কাছে সম্মান ও মর্যাদা কামনা করে না। তার মুখ নিঃসৃত কোন কথা অথবা তার কোন অবস্থার দ্বারা মাখলুকের কাছে কিছুই চায়না বরং তার ভিতর ও বাহির, কথা ও কাজ, ভালোবাসা ও

২। তাওহীদ বাস্তবায়নের মর্মার্থ।

৩। নবী ইবরাহীম (আ:) মুশরিক ছিলেন না বলে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা।

৪। বড় বড় বুজুর্গ ব্যক্তিগণ শিরক মুক্ত ছিলেন বলে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা।

৫। ঝাড়-ফুঁক এবং আগুনের দাগ পরিত্যাগ করা তাওহীদপন্থী হওয়ার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

৬। আল্লাহর উপর ভরসা বা তাওয়াক্কুলই বান্দার মধ্যে উল্লেখিত গুণ ও স্বভাবসমূহের সমাবেশ ঘটায়।

৭। বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশকারী সৌভাগ্যবান লোকেরা কোন আমল ব্যতীত উক্ত মর্যাদা লাভ করতে পারেননি, এটা জানার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের জ্ঞানের গভীরতা।

৮। মঙ্গল ও কল্যাণের প্রতি তাঁদের অপরিসীম আগ্রহ।

৯। সংখ্যা ও গুণাবলরি দিক থেকে উম্মতে মুহাম্মদীর ফজিলত।

১০। নবী মুসা আ. এর সাহাবীদের মর্যাদা।

১১। সব উম্মতকে রাসূল সাল্লাললাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মুখে উপস্থিত করা হবে।

১২। প্রত্যেক উম্মতই নিজ নিজ নবীর সাথে পৃথকভাবে হা শরের ময়দানে উপস্থিত হবে।

১৩। নবিগণের আহ্বানে সাড়া দেয়ার মত লোকের স্বল্পতা।

১৪। যে নবীর দাওয়াত কেউ গ্রহণ করেনি তিনি একাই হা শরের ময়দানে উপস্থিত হবেন।

১৫। এ জ্ঞানের শিক্ষা হচ্ছে, সংখ্যাধিক্যের দ্বারা ধোঁকা না খাওয়া আবার সংখ্যাল্পতার কারণে অবহেলা না করা।

১৬। চোখ-লাগা এবং জ্বরের চিকিৎসার জন্য ঝাড়-ফুঁকের অনুমতি।

১৭। সালাফে সালেহীনের জ্ঞানের গভীরতা।

ক্রোধ এবং তার সার্বিক অবস্থার উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য করা। এক্ষেত্রে মানুষ বিভিন্ন মর্যাদা ও স্তরের অধিকারী হয়ে থাকে।

قد أحسن من انتهى إلى ما سمع.

"সে ব্যক্তিই ভাল কাজ করেছে যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা শুনেছে তাই আমল করেছে" এ কথাই এর প্রমাণ পেশ করে। তাই প্রথম হাদিস দ্বিতীয় হাদিসের বিরোধী নয়।

১৮। মানুষের মধ্যে যে গুণ নেই তার প্রশংসা থেকে সালাফে সালেহীন বিরত থাকতেন।

১৯। أنت منهم (তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত) ওয়াকাশার ব্যাপারে একথা নবুওয়তেরই প্রমাণ পেশ করে।

২০। ওয়াকাশা রা. এর মর্যাদা ও ফজিলত।

২১। কোন কথা সরাসরি না বলে হিকমত ও কৌশল অবলম্বন করা।

ولكل درجات مما عملوا.

"আমল অনুযায়ী প্রত্যেকেরই মর্যাদা রয়েছে।"

মনের আশা- আকাঙ্ক্ষা আর বাস্তবতা বর্জিত দাবির নাম তাওহীদের বাস্তবায়ন নয়। বরং তাওহীদ প্রতিষ্ঠিত হয় অন্তরে এমন ঈমান আক্বীদা এবং এহসানের হাকিকত [মূল শিক্ষা] বদ্ধ মূল করার মাধ্যমে যা সুন্দর চরিত্র, মহৎ ও নেক কাজের দ্বারা সত্যে পরিণত হয়।

এভাবে যে ব্যক্তি তাওহীদকে অন্তরে গেঁথে নিল সেই আলোচিত অধ্যায়ে নির্দেশিত যাবতীয় ফজিলত লাভ করতে সক্ষম হলো।

৪র্থ অধ্যায় .

শিরক সম্পর্কীয় ভীতি

১। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন-

إِنَّ اللهَّ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (النساء: ٤٨)

"আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করা গুনাহ মাফ করবেন না। শিরক ছাড়া অন্যান্য যে সব গুনাহ রয়েছে সেগুলো যাকে ইচ্ছা মাফ করে দিবেন।" (নিসাঃ৪৮)

২। ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার কাছে এ দোয়া করেছিলেন,

وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ (إبراهيم: ٣٥)

"আমাকে এবং আমার সন্তানদের মূর্তিপূজা থেকে রক্ষা কর" (ইবরাহীম . ৩৫)

ব্যাখ্যা

শিরকের প্রতি ভয়:

তাওহীদুল উলুহিয়্যা ওয়াল ইবাদা অর্থাৎ উলুহিয়্যাত এবং ইবাদতের তাওহীদের মধ্যে শিরকের উপস্থিতি তাওহীদকে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করে দেয়।

শিরক দু'রকমের।

১। শিরকে আকবার জলি (প্রকাশ্য বড় শিরক)

২। শিরকে আসগার খফী (অপ্রকাশ্য ছোট শিরক)

শিরকে আকবার :

শিরকে আকবার হচ্ছে আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার বানানো। আল্লাহকে ডাকার মত অন্যকে ডাকা। আল্লাহকে ভয় করার মত অন্যকে ভয় করা। তাঁর কাছে যা কামনা করা হয় অন্যের কাছে তা কামনা করা। তাঁর ভালোবাসারমত অন্যকেও ভালোবাসা। আল্লাহর সাথে যাকে অংশীদার করা হয় যে কোন ধরনের ইবাদত তার জন্য নির্দিষ্ট করা। এ ধরনের শিরকে লিপ্ত ব্যক্তির মধ্যে বিন্দুমাত্র তাওহীদও অবশিষ্ট থাকে না। তাই এ ধরনের মুশরিকদের জন্য আল্লাহ তাআলা জান্নাত হারাম করে

৩। এক হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন,

.أخوف ما أخاف عليكم، الشرك الأصغر' فسئل عنه فقال : الرياء

“ আমি তোমাদের জন্য সে জিনিসটি সবচেয়ে বেশি ভয় করি তা হচ্ছে শিরকে আসগার অর্থাৎ ছোট শিরক। তাকে শিরকে আসগার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তরে বললেন, (ছোট শিরক হচ্ছে) “রিয়া”।

৪। ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

من مات وهو يدعومن دون الله ندا دخل النار. (رواه البخاري)

“যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে। সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।” (বুখারী)

৫। সাহাবী জাবের রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করে মৃত্যু বরণ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি তাঁর সাথে কাউকে শরিক করে মৃত্যু বরণ করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।” (মুসলিম)

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় .

১। শিরককে ভয় করা।

২। রিয়া শিরকের মধ্যে শামিল।

৩। রিয়া হল ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

দিয়েছেন। জাহান্নামই হচ্ছে তাদের শেষ ঠিকানা। গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত ইবাদতকে ইবাদত, ওয়াসীলা, অথবা অন্য যে কোন নামে আখ্যায়িত করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কারণ এর সবগুলোই হচ্ছে শিরকে আকবার বা বড় শিরক। এক্ষেত্রে বিচার্য বিষয় হচ্ছে জিনিসের হাকিকত বা প্রকৃত পরিচয় এবং তার অর্থ। শব্দ ও বাক্য এ ক্ষেত্রে বিচার্য বিষয় নয়।

শিরকে আসগার:

যে সব কথা ও কাজের মাধ্যমে মানুষ শিরকের দিকে ধাবিত হয়, সেসব কথা ও কাজই শিরকে আসগার বা ছোট শিরক হিসেবে গণ্য। যেমন : মাখলুকের ব্যাপারে এমনভাবে সীমা লঙ্ঘন করা যা ইবাদতের পর্যায়ে পৌঁছে না। [ইবাদতের পর্যায়ে পৌঁছোলে তা শিরকে আকবারে পরিণত হবে] যেমন গাইরুল্লাহর নামে কসম করা, রিয়া বা লোক দেখানো কাজ করা ইত্যাদি।

৪। নেককার লোকদের জন্য সবচেয়ে ভয়ের বিষয় হচ্ছে শিরকে আসগর (ছোট শিরক)

৫। জান্নাত ও জাহান্নাম কাছাকাছি হওয়া।

৬। জান্নাত ও জাহান্নাম নিকটবর্তী হওয়ার বিষয়টি একই হাদিসে বর্ণিত হওয়া।

৭। আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করে মৃত্যুবরণ করলে মৃত ব্যক্তি জান্নাতে যাবে। পক্ষান্তরে আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক বানিয়ে মৃত্যু বরণ করলে মৃত ব্যক্তি যত বড় আবেদই হোক না কেন সে জাহান্নামে যাবে।

৮। ইবরাহীম খলিল আ. এর দোয়ার প্রধান বিষয় হচ্ছে, তাঁকে এবং তাঁর সন্তানদেরকে মূর্তিপূজা তথা শিরক থেকে রক্ষা করা।

৯। رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ "হে আমার রব, এ মূর্তিগুলো বহু লোককে গুমরাহ করেছে" এ কথা দ্বারা ইবরাহীম আ. বহু লোকের অবস্থা থেকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করেছেন।

১০। এখানে লা-ইলাহি ইল্লাল্লাহর তাফসীর রয়েছে যা ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন।

১১। শিরক মুক্ত ব্যক্তির মর্যাদা।

শিরকে আকবার তাওহীদকে অস্বীকার করে। চিরস্থায়ী জাহান্নামকে ওয়াজিব করে। আর জান্নাতকে হারাম করে। এ শিরক থেকে মুক্ত হওয়া ব্যতীত শান্তি লাভ করা অসম্ভব। অবস্থা যদি এই হয় তাহলে বান্দার অপরিহার্য কর্তব্য হচ্ছে এ শিরককে অর্থাৎ শিরকে আকবারকে সবচেয়ে বেশি ভয় করা। শিরকে আকবারের পথ, পদ্ধতি, মাধ্যম এবং যাবতীয় উপায়- উপকরণ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করা। এ শিরক থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা উচিত যেভাবে দোয়া করেছেন আম্বিয়ায়ে কেরাম, নেককার বুজুর্গ এবং সৃষ্টির সেরা বান্দাহগণ।

প্রত্যেক বান্দার উচিত তার অন্তরে ইখলাসের উন্নতি সাধন ও শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য চেষ্টা সাধনা করা।

আর এ চেষ্টা চালাতে হবে উলুহিয়্যাত, ইনাবত, ভয়, ভীতি, আশা- আকাঙ্ক্ষা ও কামনা- বাসনায় আল্লাহর সাথে পূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে বান্দার জাহেরী ও বাতেনী যাবতীয় কাজ-কর্ম সম্পন্ন করা কিংবা পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও সওয়াব অর্জন করা। ইখলাসের ধর্মই হচ্ছে শিরকে আকবার ও আসগার তথা ছোট বড় সব ধরনের শিরককে মিটিয়ে দেয়া। যেকোনো ধরনের শিরকে লিপ্ত হওয়ার কারণ হচ্ছে বান্দার ইখলাসের দুর্বলতা।

৫ম অধ্যায় :
“লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ” এর প্রতি সাক্ষ্যদানের আহ্বান

১। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ (يوسف: ١٠٨)

“(হে মুহাম্মদ) আপনি বলে দিন, এটাই আমার পথ। পূর্ণ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সাথে আমি আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাই।” (ইউসুফ : ১০৮)

২। সাহাবী ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত আছে, রাসূল সাহাবী যখন মুআ’য বিন জাবাল রা. কে ইয়ামানের শাসনকর্তা নিয়োগ করে পাঠালেন তখন [রাসূল সাহাবী মুআ’যকে লক্ষ্য করে] বললেন,

إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم إن الله افترض عليهم خمس صلوات فى كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم. فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. (أخرجاه)

“তুমি এমন এক কাওমের কাছে যাচ্ছ যারা আহলে কিতাব। [যারা কোন আসমানী কিতাবে বিশ্বাসী] সর্ব প্রথম যে জিনিসের দিকে তুমি তাদেরকে আহ্বান জানাবে তা হচ্ছে, “লা-ইলাহ ইল্লাল্লাহুর সাক্ষ্য

ব্যাখ্যা
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু এর সাক্ষ্যদানের আহ্বান

লেখক এ অধ্যায়টি পূর্বোক্ত অধ্যায়গুলোর সাথে যে ক্রমিক অনুযায়ী সাজিয়েছেন তা মূলত: আলোচিত অধ্যায়গুলোর মাঝে নিযুক্ত নিগুড় সম্পর্কের কারণেই করেছেন। কেননা পূর্বোল্লিখিত অধ্যায়গুলোতে তাওহীদের আবশ্যকতা মর্যাদা এর প্রতি উৎসাহ দান এবং পূর্ণতা অর্জনের কথা বর্ণিত হয়েছে। জাহেরী এবং বাতেনী।

উভয় দিক থেকে তাওহীদের সাক্ষ্যদান এর বিপরীত বিষয় তথা শিরকে ভয় করা এবং তাওহীদের মহিমায় বান্দা যেন নিজেকে পরিপূর্ণ রূপ মহিমান্বিত করতে পারে এসব বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

দান”। অন্য বর্ণনায় আছে, আল্লাহর ওয়াহদানিয়্যাত বা একত্ববাদের স্বীকৃতি প্রদান। এ বিষয়ে তারা যদি তোমার আনুগত্য করে তবে তাদেরকে জানিয়ে দিয়ো যে, আল্লাহ তাআলা তাদের উপর দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে তারা যদি তোমার কথা মেনে নেয় তবে তাদেরকে জানিয়ে দিয়ো যে, আল্লাহ তাআলা তাদের উপর জাকাত ফরজ করে দিয়েছেন, যা বিত্তশালীদের কাছ থেকে নিয়ে গরিবদেরকে দেয়া হবে। তারা যদি এ ব্যাপারে তোমার আনুগত্য করে তবে তাদের উৎকৃষ্ট মালের ব্যাপারে তুমি খুব সাবধানে থাকবে। আর মজলুমের ফরিয়াদকে ভয় করে চলবে। কেননা মজলুমের ফরিয়াদ এবং আল্লাহ তাআলার মাঝখানে কোন পরদা নেই।” (বুখারী ও মুসলিম)

৩। সাহাল বিন সাআদ রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাহাবী খাইবারের [যুদ্ধের] দিন বললেন,

لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه،

“আগামীকাল এমন ব্যক্তির কাছে আমি ঝান্ডা প্রদান করব যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাকে ভালোবাসে। তার হাতে আল্লাহ তাআলা বিজয় দান করবেন। কাকে ঝান্ডা প্রদান করা হবে এ উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতার মধ্যে লোকজন রাত্রি যাপন করল। যখন সকাল হয়ে গেলো তখন লোকজন রাসূল সাহাবী এর নিকট গেলো তাদের প্রত্যেকেই আশা পোষণ করছিল যে ঝান্ডা তাকেই দেয়া হবে, তখন তিনি বললেন, আলী বিন আবি তালিব কোথায়? বলা হলো, তিনি চক্ষুর পীড়ায় ভুগছেন। তাদেরকে

অতঃপর লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর দিকে দাওয়াত দানের মাধ্যমে [বান্দা নিজের তাওহীদকে পূর্ণাঙ্গ করার পর] অন্যের তাওহীদকেও পূর্ণাঙ্গ করে তোলার কথা আলোচনা করা হয়েছে। কারণ বান্দা তাওহীদের সকল স্তরকে পূর্ণ করে যতক্ষণ পর্যন্ত অন্যের তাওহীদকে পূর্ণাঙ্গ করে তোলার সচেষ্ট না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত স্বীয় তাওহীদের পূর্ণতা অর্জিত হবে না। আর এটাই হচ্ছে সকল আম্বিয়ায়ে কেরামের পথ। কেননা তাঁরা নিজ নিজ কওমকে সর্ব প্রথম এক ও একক লা-শরিক আল্লাহর ইবাদতের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। আর নবিকুল শিরোমণি মুহাম্মদ সাহাবী এর এটাই ছিল কর্ম পদ্ধতি। তিনি দাওয়াতেরই সুমহান দায়িত্ব বিচক্ষণতার সাথে পালন করেছেন। আর মানুষকে স্বীয় রবের পথে হিকমত, উত্তম উপদেশ এবং সর্বোত্তম ভাষার মাধ্যমে আহ্বান করেছেন।

আলী রা. এর কাছে পাঠানো হলো। অতঃপর তাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট নিয়ে আসা হলো। তিনি আলীর চোখে থু থু দিলেন এবং তার জন্য দোয়া করলেন। তখন তিনি এমনভাবে সুস্থ হয়ে উঠলেন যেন তার চোখে কোন ব্যথাই ছিল না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রা. এর হাতে পতাকা তুলে দিয়ে বললেন, "তুমি বীর পদক্ষেপে ভিতরে ঢুকে পড়ো। এমনকি তাদের [দুশমনদের] নিজস্ব যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে উপস্থিত হও। তারপর তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানাও এবং তাদের উপরে আল্লাহ তাআলার যে সব হক রয়েছে সে সম্পর্কে তাদের যা করণীয় তা জানিয়ে দাও। আল্লাহর কসম তোমার দ্বারা যদি আল্লাহ তাআলা একজন মানুষকেও হেদায়েত দান করেন তাহলে সেটা হবে তোমার জন্য লাল উটের চেয়েও উত্তম।"

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়,

১। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণকারীর নীতি ও পথ হচ্ছে আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান করা।

২। ইখলাসের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা। কেননা অনেক লোক হকের পথে মানুষকে আহ্বান জানালেও মূলত: তারা নিজের নফ্‌স বা স্বার্থের দিকেই আহ্বান জানায়।

৩। তাওহীদের দাওয়াতের জন্য অন্তর দৃষ্টি সম্পন্ন জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অপরিহার্য।

৪। উত্তম তাওহীদের প্রমাণ হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার প্রতি গাল-মন্দ আরোপ করা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র থাকা।

৫। আল্লাহ তাআলার প্রতি গাল-মন্দ আরোপ করা নিকৃষ্ট এবং শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

তিনি দ্বীনের দাওয়াতের পথে কখনো নীরব থাকেননি, নিথর হয়ে পড়েননি, যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা তাঁর মাধ্যমে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত না করেছেন, সৃষ্টির সেরা মানুষকে তাঁর মাধ্যমে হেদায়াত না করেছেন এবং স্বীয় করুণা ও বরকতের দ্বারা তাঁর দ্বীনের দাওয়াতকে বিশ্বের পূর্ব-পশ্চিম দিগন্তে পৌঁছে না দিয়েছেন ততদিন পর্যন্ত দাওয়াত দ্বীনকে ক্ষান্ত করেননি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে মানুষকে ইসলামের দিকে

৭। তাওহীদই হচ্ছে সর্ব প্রথম ওয়াজিব।

৮। সর্বাগ্রে এমন কি নামাজেরও পূর্বে তাওহীদের দায়িত্ব পালন করতে হবে।

৯। আল্লাহর ওয়াহদানিয়াতের অর্থ হচ্ছে, “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ” এর সাক্ষ্য প্রদান করা। অর্থাৎ “আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোন ইলাহ নেই” এ ঘোষণা দেয়া।

১০। একজন মানুষ আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও সে তাওহীদ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকতে পারে কিংবা তাওহীদের জ্ঞান থাকলেও তা দ্বারা আমল নাও করতে পারে।

১১। শিক্ষা দানের প্রতি পর্যায়ক্রমে গুরুত্বারোপ।

১২। সর্ব প্রথম অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শুরু করা।

১৩। জাকাত প্রদানের খাত সম্পর্কিত জ্ঞান।

১৪। শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রের সংশয় ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব উন্মোচন করা বা নিরসন করা।

১৫। জাকাত আদায়ের সময় বেছে বেছে উৎকৃষ্ট মাল নেয়ার প্রতি নিষেধাজ্ঞা।

১৬। মজলুমের বদ দোয়া থেকে বেঁচে থাকা।

১৭। মজলুমের ফরিয়াদ এবং আল্লাহ তাআলার মধ্যে কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকার সংবাদ।

১৮। সাইয়্যিদুল মুরসালীন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বড় বড় বজুর্গানে

দাওয়াত দিতেন এবং তাঁর প্রেরিত দূত, প্রতিনিধি ও অনুসারীগণকে নির্দেশ দিতেন, তারা যেন সর্বাগ্রে আল্লাহর দিকে, তাঁর একত্ববাদের দিকে সকল মানুষকে আহ্বান জানায় কেননা যাবতীয় আমল সহীহ হওয়া এবং কবুল হওয়ার বিষয়টি তাওহীদের উপরই নির্ভরশীল। আল্লাহর ওয়াহদানিয়াত কায়েম করা যেমনিভাবে বান্দার কর্তব্য ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহর বান্দাহগণকে উত্তম পন্থায় দাওয়াত দেওয়াও তার কর্তব্য। তার হাতে যারাই হেদায়াত লাভ করবে তাদের সমপরিমাণ সওয়াব সে [দাওয়াত দানকারী ব্যক্তি] পাবে। আর তাতে দাওয়াত গ্রহণকারীর সওয়াব হতে বিন্দুমাত্রও কমবে না।

দ্বীনের উপর যে সব দুঃখ- কষ্ট এবং কঠিন বিপদাপদ আপতিত হয়েছে তা তাওহীদেরই প্রমাণ পেশ করে।

১৯। "আমি আগামীকাল এমন একজনের হাতে পতাকা প্রদান করব যার হাতে আল্লাহ বিজয় দান করবেন।" রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এ উক্তি নবুয়তেরই একটি নিদর্শন।

২০। আলী রা. এর চোখে থু থু প্রদানে চোখ আরোগ্য হয়ে যাওয়াও নবুয়তের একটি নিদর্শন।

২১। আলী রা. এর মর্যাদা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ।

২২। আলী রা. এর হাতে পতাকা তুলে দেয়ার পূর্বে রাতে পতাকা পাওয়ার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের উদ্বেগ ও ব্যাকুলতার মধ্যে রাত্রি যাপন এবং বিজয়ের সুসংবাদে আশ্বস্ত থাকার মধ্যে তাদের মর্যাদা নিহিত আছে।

২৩। বিনা প্রচেষ্টায় ইসলামের পতাকা তথা নেতৃত্ব লাভ করা আর চেষ্টা করেও তা লাভে ব্যর্থ হওয়া, উভয় অবস্থায়ই তাকদীরের প্রতি ঈমান রাখা।

২৪। "বীর পদক্ষেপে এগিয়ে যাও" রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এ উক্তির মধ্যে ভদ্রতা ও শিষ্টচার শিক্ষা দানের ইঙ্গিত রয়েছে।

২৫। যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে ইসলামের দাওয়াত পেশ করা।

২৬। ইতিপূর্বে যাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয়েছে এবং যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়েছে তাদেরকেও যুদ্ধের আগে ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে।

অতএব, একজন আলেমের কর্তব্য হচ্ছে উক্ত তাওহীদ ও কলেমার কথা বর্ণনা করা। একজন আলেমের উপর দাওয়াত, উপদেশ এবং হিদায়াতের দায়িত্ব ও কর্তব্য একজন অজ্ঞ লোকের চেয়ে অনেক বেশি।

এমনিভাবে শরীর, শক্তি অথবা ধন-সম্পদ, সম্মান, প্রভাব, প্রতিপত্তির দিক থেকে সক্ষম ব্যক্তির উপর উক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য যার এ সব কিছুই নেই তার চেয়ে অনেক বেশি আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন- فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

২৭। أخبرهم بما يجب عليهم রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী হিকমত ও কৌশলের সাথে দাওয়াত পেশ করার ইঙ্গিত বহন করে।

২৮। দীন ইসলামে আল্লাহর হক সম্পর্কে জ্ঞানার্জন।

২৯। আলী রা. এর হাতে একজন মানুষ হেদায়াত প্রাপ্ত হওয়ার সওয়াব।

৩০। ফতোয়ার ব্যাপারে কসম করা।

তোমাদের শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী আল্লাহকে ভয় করো। ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা করুণা করেন যে একটি সামান্য কথা দিয়ে হলেও দ্বীনের সহযোগিতা করে। একজন বান্দার যতটুকু শক্তি ও সামর্থ্য আছে দ্বীনের দাওয়াতের কাজে ততটুকু দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন না করার মধ্যেই তার ধ্বংস নিহিত।

৬ষ্ঠ অধ্যায় :
তাওহীদ এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্য দানের ব্যাখ্যা

১। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ (الاسراء: ٥٧)

"এসব লোকেরা যাদেরকে ডাকে তারা নিজেরাই তাদের রবের নৈকট্য লাভের আশায় অসীলার অনুসন্ধান করে (আর ভাবে) কোনটি সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী।" (ইসরাঃ ৫৭)

২। আল্লাহ তাআলা আরো এরশাদ করেছেন,

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٢٦﴾ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي (الزخرف: ٢٦-٢٧)

"সে সময়ের কথা স্মরণ করো যখন ইবরাহীম তার পিতা ও কওমের লোকদেরকে বলেছিলেন, তোমরা যার ইবাদত করো তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আর আমার সম্পর্ক হচ্ছে কেবল মাত্র তাঁরই সাথে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন।" (যুখরুফ : ২৬)

৩। আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে ঘোষণা করেছেন,

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِّ (التوبة: ٣١)

ব্যাখ্যা

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্যদান ও তাওহীদের তাফসীর লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্য প্রদান এবং তাওহীদ মূলতঃ একই অর্থবোধক বিষয়। তবে সমার্থবোধক দু'টি বিষয়কে 'আতফ' বা সংযুক্ত করা হয়েছে। এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। লেখক নিজেই একথা উল্লেখ করেছেন। তাওহীদের মর্মকথা হচ্ছে আল্লাহর যাবতীয় সীফাতে কামালকে জানা ও মানা ও একনিষ্ঠভাবে তারই ইবাদত করা।

এখানে দুটি বিষয় নিহিত রয়েছে। প্রথম বিষয়টি হচ্ছে, আল্লাহ ছাড়া বাকি সবকিছুর [গাইরুল্লাহ] মধ্যে উলুহিয়্যাতের গুণকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা। আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী কোন নবী হোক আর ফিরিশতা হোক, আল্লাহর সৃষ্টি জগতের কেউ উলুহিয়্যাত ও উবুদিয়্যাত অর্থাৎ মা'বুদ হওয়ার অধিকারী হতে পারে না। এ ব্যাপারে সৃষ্টি জগতের কারো কোন হিসসা বা অংশ নেই। এ কথাগুলো জানা এবং এর প্রতি দৃঢ়

“তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজেদের আলেম ও দরবেশ লোকদেরকে নিজেদের রব বানিয়ে নিয়েছে” (তাওবা: ৩১)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ (البقرة:١٦٥)

“মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা আল্লাহ ছাড়া অপর কোন শক্তিকে আল্লাহর অংশীদার বা সমতুল্য হিসেবে গ্রহণ করে এবং তাকে এমনভাবে ভালোবাসে যেমনিভাবে একমাত্র আল্লাহকেই ভালোবাসা উচিত।” (বাকারা : ১৬৫)

৫। সহীহ বুখারীতে বর্ণিত রয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন,

من قال لا إله إلا الله، وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، وحسابه على الله عز وجل.

“যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ [আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই] বলবে, আর আল্লাহ ব্যতীত যারই ইবাদত করা হয় তাকেই অস্বীকার করবে তার জান ও মাল হারাম [অর্থাৎ মুসলমানদের কাছে সম্পূর্ণ নিরাপদ] গোপন তৎপরতা ও অন্তরের কুটিলতা বা মুনাফিকির জন্য] তার শাস্তি আল্লাহর উপরই ন্যস্ত।”

পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। আর তা হচ্ছে তাওহীদ এবং

বিশ্বাস স্থাপন করার মাধ্যমেই গাইরুল্লাহর উলুহিয়্যাতের গুণকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করতে হয়।

আর দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, এক ও একক লা-শরিক আল্লাহর জন্যই উলুহিয়্যাতকে নিশ্চিত করা এবং উলুহিয়্যাতের সব অর্থ তথা কামালিয়াতের পূর্ণ গুণাবলিকে এক আল্লাহর জন্যই সাব্যস্ত করা। বান্দার জন্য শুধুমাত্র এ আক্বীদাই যথেষ্ট নয়, যতক্ষণ না সে দ্বীনের কলেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহকে ইখলাসের সাথে বাস্তবায়িত করবে। সে একমাত্র আল্লাহরই জন্য ঈমান, ইসলাম, ইহসান, আল্লাহর হক এবং সৃষ্টির হক প্রতিষ্ঠিত করবে। এর দ্বারা তাঁরই সন্তুষ্টি এবং সওয়াব হাসিলের প্রত্যাশা করবে।

বান্দাহকে একথা জানতে হবে যে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর চূড়ান্ত তাফসীর এবং তা বাস্তবায়নের মূল কথা হচ্ছে, গাইরুল্লাহর ইবাদত থেকে মুক্তি ও পবিত্রতা অর্জন করা।

আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা, আল্লাহকে ভালোবাসার মতই শরিকগুলোকে

শাহাদাতের তাফসীর। কয়েকটি সুস্পষ্ট বিষয়ের মাধ্যমে এর বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যেমন :

(ক) সূরা ইসরার আয়াত, এ আয়াতে সে সব মুশরিকদের সমুচিত জওয়াব দেয়া হয়েছে যারা বুজুর্গ ও নেক বান্দাদেরকে (আল্লাহকে ডাকার মত] ডাকে। আর এটা যে 'শিরকে আকবার' এ কথার বর্ণনাও এখানে রয়েছে।

(খ) সূরা তাওবার আয়াত। এতে আহলে কিতাব অর্থাৎ ইহুদি খ্রিস্টানরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের আলেম ও দরবেশ ব্যক্তিদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে। আরো বর্ণনা করা হয়েছে যে, এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়নি। এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, অন্যায় ও পাপ কাজে আলেম ও আবিদদের আনুগত্য করা যাবে না। তাদের কাছে দোয়াও করা যাবে না।

(গ) কাফেরদেরকে লক্ষ্য করে ইবরাহীম খলীল আ. এর কথা

إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٢٦﴾ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي (الزخرف: ٢٦-٢٧)

দ্বারা তাঁর রবকে যাবতীয় মা'বুদ থেকে আলাদা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা এখানে এটাই বর্ণনা করেছেন যে [বাতিল মা'বুদ থেকে] পবিত্র থাকা আর প্রকৃত মাবুদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করাই হচ্ছে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর ব্যাখ্যা। তাই আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿الزخرف:٢٨﴾

"আর ইবরাহীম এ কথাটি পরবর্তীতে তার সন্তানের মধ্যে রেখে গেলো,

ভালোবাসা, তাঁর আনুগত্যের মতই তাদের আনুগত্য করা, তাঁর জন্য যা করা হয় তাদের জন্য তাই করা হচ্ছে কলেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর প্রকৃত অর্থের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

লেখক বর্ণনা করেছেন যে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ প্রকাশের জন্য শ্রেষ্ঠ বর্ণনা হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এ বাণী-

من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله

"যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" বলবে আর গাইরুল্লাহর ইবাদতকে অস্বীকার করবে। তার জান-মাল পবিত্র অর্থাৎ মুসলমানদের কাছে নিরাপদ। তার গোপন তৎপরতা ও অন্তরের কুটিলতার হিসাব আল্লাহর উপর ন্যস্ত।"

যেন তারা তার দিকে ফিরে আসে।"

(ঘ) সূরা বাকারার কাফেরদের বিষয় সম্পর্কিত আয়াত। যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿القرة:١٦٧﴾

"তারা কখনো জাহান্নাম থেকে বের হতে পারবে না।"

এখানে আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করেছেন যে, মুশরিকরা তাদের শরিকদেরকে [যাদেরকে তারা আল্লাহর সমকক্ষ বা অংশীদার মনে করে] আল্লাহকে ভালোবাসার মতই ভালোবাসে।

এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, তারা আল্লাহকে ভালোবাসে, কিন্তু এ ভালোবাসা তাদেরকে ইসলামে দাখিল করতে পারেনি। তাহলে আল্লাহর শরিককে যে ব্যক্তি আল্লাহর চেয়েও বেশি ভালোবাসে সে কীভাবে ইসলামকে গ্রহণ করবে। আর যে ব্যক্তি শুধুমাত্র শরিককেই ভালোবাসে। আল্লাহর প্রতি তার কোন ভালোবাসা নেই তার অবস্থাই বা কি হবে?

(ঙ) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী .

من قال لا إله إلا الله، وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله.

"যে ব্যক্তি লা- ইলাহ ইল্লাল্লাহু বলবে আর আল্লাহ ব্যতীত যারই

কেবল মাত্র কালিমার শাব্দিক উচ্চারণকেই জান-মালের নিরাপত্তার কারণ বলা হয়নি এমনকি শব্দসহ এর অর্থ জানাকেও নয়, এর স্বীকৃতি প্রদানকেও নয়। এমনকি লা-শরিক এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না করাকেও জান-মালের নিরাপত্তার কারণ বলা হয়নি। জান-মালের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা ঠিক তখনই দেয়া হবে যখন আল্লাহ ব্যতীত যাবতীয় মাবুদকে অস্বীকার করার বিষয়টি কালিমার সাথে সম্পৃক্ত হবে। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ, সংশয় ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকলে জান-মালের নিরাপত্তার কোন নিশ্চয়তা নেই।

উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা এটাই সুস্পষ্ট রূপে প্রমাণিত হয় যে, লা-শরিক এক আল্লাহর ইবাদত অপরিহার্য, এ বিশ্বাস অবশ্যই থাকতে হবে। আক্বীদাগত দিক এবং মৌখিক উচ্চারণ, উভয় দিক থেকে এর স্বীকৃতি দিতে হবে। আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করতে হবে। ধ্যান-ধারণা, কথা-বার্তা এবং কাজ কর্মের মাধ্যমে তাওহীদের পরিপন্থী যাবতীয় বিষয় থেকে মুক্ত থাকতে হবে। যারা তাওহীদকে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে নিয়োজিত তাদেরকে ভালোবাসা, তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা এবং তাদেরকে সাহায্য করা ব্যতীত তাওহীদ পরিপূর্ণ হবে না।

ইবাদত করা হয় তাকেই অস্বীকার করবে, তার ধন-সম্পদ ও রক্ত পবিত্র।” [অর্থাৎ জান, মাল, মুসলমানের কাছে নিরাপদ] এ বাণী হচ্ছে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা। কারণ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর শুধুমাত্র মৌখিক উচ্চারণ, শব্দসহ এর অর্থ জানা, এর স্বীকৃতি প্রদান, এমনকি শুধুমাত্র লা-শারীক আল্লাহকে ডাকলেই জান-মালের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা পাওয়া যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত উক্ত কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাথে গাইরুল্লাহর ইবাদত তথা মিথ্যা মা'বুদগুলোকে অস্বীকার করার বিষয়টি সংযুক্ত না হবে। এতে যদি কোন প্রকার সন্দেহ, সংশয় কিংবা দ্বিধা সংকোচ পরিলক্ষিত হয় তাহলে জান-মাল ও নিরাপত্তার কোন নিশ্চয়তা নেই। অতএব, এটাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয়, সুস্পষ্ট বর্ণনা ও অকাট্য দলিল।

কাফের মুশরিকদের প্রতি ঘৃণা পোষণ তাদের বিরোধিতার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মুখের কথা আর অর্থহীন দাবির কোন মূল্য নেই। বরং বান্দার জ্ঞান-বুদ্ধি, আক্বীদা-বিশ্বাস, কথা-বার্তা, এবং কাজ-কর্ম তার দাবির সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল হতে হবে।

উপরোক্ত বিষয়গুলোর একটি অপরটির জন্য অপরিহার্য। এগুলোর কোন একটি বাদ পড়লে অবশিষ্ট বিষয়গুলো স্বাভাবিক ভাবেই বাদ পড়ে যাবে।

৭ম অধ্যায় :

বালা মুসীবত দূর করা অথবা প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে রিং, তাগা [সূতা] ইত্যাদি পরিধান করা শিরক

১। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ (الزمر: ٣٨)

[হে রাসূল] "আপনি বলে দিন, তোমরা কি মনে করো, আল্লাহ যদি আমার কোন ক্ষতি করতে চান তাহলে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে ডাকো, তারা কি তাঁর [নির্ধারিত] ক্ষতি হতে আমাকে রক্ষা করতে পারবে?" (ঝূমারঃ ৩৮)।

২। সাহাবী ইমরান বিন হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "এটা কি?" লোকটি বলল, এটা দুর্বলতা দূর করার জন্য দেয়া হয়েছে। তিনি বললেন, "এটা খুলে ফেলো। কারণ এটা তোমার দুর্বলতাকেই শুধু বৃদ্ধি করবে। আর এটা তোমার সাথে থাকা অবস্থায় যদি তোমার মৃত্যু হয়, তবে তুমি কখনো সফলকাম

ব্যাখ্যা

বালা মুসীবত দূর করা কিংবা প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে রিং, সূতা ইত্যাদি ব্যবহার করা শিরক

এ অধ্যায়টি সঠিকভাবে বুঝার বিষয়, এর বিভিন্ন উপকরণের হুকুম-আহকাম গুলো জানার উপর নির্ভরশীল। এ ব্যাপারে বিস্তারিত কথা হচ্ছে এই যে, বিভিন্ন কারণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত তিনটি বিষয় বান্দাকে অবশ্যই জানতে হবে। আর তা হচ্ছে,

১। শরীয়ত এবং তাকদীরের দিক থেকে প্রমাণিত উপায় উপকরণ ব্যতীত কোন কিছুকেই উপকরণ মনে করা যাবে না।

২। বান্দা উপকরণের উপর নির্ভরশীল হতে পারবে না বরং সে নির্ভরশীল হবে উপকরণের স্রষ্টা ও নির্ধারিত তাকদীরের উপর। এর সাথে সাথে শরীয়ত সম্মত পন্থায় কাঙ্ক্ষিত কাজটি সম্পন্ন করবে এবং এর দ্বারা কল্যাণ লাভে আগ্রহী হবে।

৩। বান্দাকে এ কথা অবশ্যই জেনে রাখতে হবে যে, উপকরণ যত বড় আর শক্তিশালীই হোক না কেন তা সম্পৃক্ত হচ্ছে আল্লাহর এমন ফয়সালা ও তাকদীরের

হতে পারবে না।" (আহমদ)

৩। উকবা বিন আমের রা. হতে একটি "মারফু" হাদিসে বর্ণিত আছে, من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له.

"যে ব্যক্তি তাবিজ ঝুলায় (পরিধান করে) আল্লাহ যেন তার আশা পূরণ না করেন। যে ব্যক্তি কড়ি, শঙ্খ বা শামুক ঝুলায় তাকে যেন আল্লাহ রক্ষা না করেন।" অপর একটি বর্ণনায় আছে,

من تعلق تميمة فقد أشرك.

"যে ব্যক্তি তাবিজ ঝুলালো সে শিরক করল।"

৪। ইবনে আবি হাতেম হুযাইফা থেকে বর্ণনা করেছেন, "জ্বর নিরাময়ের জন্য হাতে সূতা বা তাগা পরিহিত অবস্থায় তিনি একজন লোককে দেখতে পেয়ে তিনি সে সূতা কেটে ফেললেন এবং কুরআনের এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন,

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِّ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ (يوسف: ١٠٦)

সাথে যেখান থেকে বের হয়ে আসার কোন পথ নেই। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা যেমন চান তেমনই করবেন। যদি তিনি এর উপকরণ সমূহকে কার্যকর রাখতে চান তাহলে তার হেকমতের দাবি অনুযায়ী তা কার্যকর থাকবে। যাতে বান্দা মুসাব্বিব (কারণ সৃষ্টিকারী) এবং কারণসমূহের মধ্যে অন্তর্নিহিত সম্পর্কের ভিত্তিতে তার পূর্ণ হিকমতের কথা জানতে পারে। আল্লাহ যদি চান তাহলে এগুলোকে তার ইচ্ছা মোতাবেক পরিবর্তন করবেন। যাতে বান্দা উপকরণ ও তদসংক্রান্ত বিষয়ের উপর নির্ভরশীল না হয় এবং আল্লাহর পূর্ণ হিকমতের কথা জানতে পারে। কার্য পরিচালনা ও সম্পাদনের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও ইচ্ছা একমাত্র আল্লাহ তাআলার। যাবতীয় উপায়-উপকরণ গ্রহণের ক্ষেত্রে বান্দার চিন্তা ও কর্মে উপরোক্ত ধারণা পোষণ করা ওয়াজিব।

এতটুকু জানার পর যে ব্যক্তি রিং, বালা, সূতা ইত্যাদি পরিধান করল এবং এর দ্বারা বালা-মুসীবত দূর করা কিংবা তা আসার আগেই প্রতিরোধ করা সম্ভব বলে বিশ্বাস করল সে আল্লাহর সাথে শিরক করল। বান্দা যদি এ ধারণা পোষণ করে যে, রিং বালা, সূতাই মুসীবত দূর করতে এবং প্রতিরোধ করতে সক্ষম তাহলে এটা হবে শিরকে আকবার। শুধু তাই নয়, এটা আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের মধ্যে শিরক। কেননা বান্দা এমতাবস্থায় সৃষ্টি ও বিশ্বনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আল্লাহর অংশীদার রয়েছে বলে বিশ্বাস করে।

" তাদের অধিকাংশই মুশরিক অবস্থায় আল্লাহকে বিশ্বাস করে"

(ইউসুফঃ ১০৬)

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়,

১। রিং (বালা) ও সূতা ইত্যাদি রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে পরিধান করার ব্যাপারে অধিক কঠোরতা।

২। স্বয়ং সাহাবীও যদি এসব জিনিস পরিহিত অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেন তাহলে তিনিও সফলকাম হতে পারবেন না। এতে সাহাবায়ে কেরামের এ কথারই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ছোট শিরক কবিরা গুনাহর চেয়েও মারাত্মক।

৩। অজ্ঞতার অজুহাত গ্রহণযোগ্য নয়।

৪। لا تزيدك إلا وهنا ইহা তোমার দুর্বলতা ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করবে না।" এ কথা দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে রিং বা সূতা পরিধান করার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই বরং অকল্যাণ আছে।

৫। যে ব্যক্তি উপরোক্ত কাজ করে তার কাজকে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

৬। এ কথা সুস্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি (রোগ নিরাময়ের জন্য কোন কিছু

এরকম করা আল্লাহর উবুদিয়্যাতের মধ্যে শিরক করার অন্তর্ভুক্ত। কেননা এমতাবস্থায় বান্দা পরিধানকৃত বস্তুকে ইলাহ হিসেবে গণ্য করে এবং কল্যাণ লাভের আশায় তার অন্তরকে উক্ত বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত করে রাখে। আর সে যদি একথা বিশ্বাসও করে যে, একমাত্র আল্লাহ তাআলাই বালা-মুসীবত দূর করেন এবং উঠিয়ে নেন তবে এগুলোকে সে এমন অসিলা হিসেবে বিশ্বাস করে যার দ্বারা বালা-মুসীবত দূর করা যায়। এমতাবস্থায় সে এমন জিনিসকে মুসীবত দূর করার উপকরণ বা অছিলা হিসেবে গণ্য করল যা শরিয়তের দিক থেকে অছিলা হিসেবে আদৌ গণ্য নয়। এ রকম করা শরীয়তে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

এ ধরনের কাজকে শরীয়ত দৃঢ়ভাবে নিষেধ করে। আর শরীয়ত যে জিনিসটি নিষেধ করে তা আদৌ কল্যাণকর নয়।

তাকদীর এমন কোন প্রতিশ্রুতি কিংবা অপ্রতিশ্রুত উপকরণ নয় যার মাধ্যমে উদ্দেশ্য হাসিল করা যায়। আর উপকার সাধনকারী বৈধ কোন ঔষধের মধ্যেও গণ্য নয়।

[রিং সূতা] শরীরে লটকাবে তার কুফল তার উপরই বর্তাবে।

৭। এ কথাও সুস্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে তাবিজ ব্যবহার করল সে মূলতঃ শিরক করল।

৮। জ্বর নিরাময়ের জন্য সূতা পরিধান করাও শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

৯। সাহাবী হুযাইফা কর্তৃক কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করা দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কেরাম শিরকে আসগরের দলিল হিসেবে ঐ আয়াতকেই পেশ করেছেন যে আয়াতে শিরকে আকবার বা বড় শিরকের কথা রয়েছে। যেমনটি ইবনে আব্বাস রা. বাকারার আয়াতে উল্লেখ করেছেন।

১০। নজর বা চোখ লাগা থেকে আরোগ্য লাভ করার জন্য শামুক, কড়ি, শঙ্খ ইত্যাদি লটকানো বা পরিধান করাও শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

১১। যে ব্যক্তি তাবিজ ব্যবহার করে তার উপর বদ দোয়া করা হয়েছে, 'আল্লাহ যেন তার আশা পূরণ না করেন।' আর যে ব্যক্তি শামুক, কড়ি বা শঙ্খ (গলায় বা হাতে) লটকায় তাকে যেন আল্লাহ রক্ষা না করেন।

রিং ও সূতা হচ্ছে শিরকের উপকরণ মাত্র। কারণ এগুলো যে ব্যক্তি লটকাবে কিংবা ব্যবহার করবে তার অন্তর [রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে] ব্যবহৃত জিনিসের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে। এটা এক ধরনের শিরক এবং শিরকে উপনীত হওয়ার অসিলা।

যদি উপরোক্ত বিষয় অর্থাৎ রিং বা সূতা পরিধান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পাক জবানে বর্ণিত এমন কোন শরয়ী উপকরণ না হয় যা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সওয়াব হাসিল তার উপকারিতা জানা ও পরীক্ষিত, যার ফলে তার ব্যবহারকারী কল্যাণ লাভের আশায় ব্যবহৃত জিনিসের সাথে তার অন্তরকে সম্পৃক্ত করে তাহলে মোমিনের করণীয় হচ্ছে তার ঈমান ও তাওহীদকে পরিপূর্ণ করার জন্য এগুলো পরিত্যাগ করা। কেননা তাওহীদ পরিপূর্ণ হলে তাওহীদের পরিপন্থী কোন জিনিসের সাথে বান্দার অন্তর যুক্ত হবে না। তাছাড়া রিং বা সূতা লটকানোর কাজটি স্বল্প জ্ঞান-বুদ্ধির পরিচায়ক। কারণ এ ক্ষেত্রে বান্দা এমন কিছুর সাথে তার অন্তরকে সংযুক্ত করে যার সাথে দিলের সম্পৃক্তি মোটেই সমীচীন নয় বা কোন দিক থেকে কল্যাণকরও নয়। বরং নিঃসন্দেহে ক্ষতিকরণ।

শরিয়তের মূল কথা হচ্ছে, পৌত্তলিকতার অবসান এবং সৃষ্টির সাথে মনের সম্পর্ককে বিচ্ছিন্ন করে যাবতীয় কুসংস্কার আর অন্ধত্ব থেকে জ্ঞানকে মুক্ত রাখা। বিবেক বুদ্ধির উৎকর্ষতার জন্য কল্যাণকর বিষয়ে সাধনা করা। আত্মশুদ্ধি এবং দীন ও দুনিয়ার স্বার্থ সংরক্ষণের মাধ্যমে জ্ঞান-বুদ্ধিকে পরিপূর্ণ করা।

৮ম অধ্যায় :

ঝাড়-ফুঁক ও তাবিজ-কবজ

১। আবু বাসীর আনসারী রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সফর সঙ্গী ছিলেন। এ সফরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি নির্দিষ্ট এলাকায় একজন দূত পাঠালেন। এর উদ্দেশ্য ছিল কোন উটের গলায় যেন ধনুকের কোন রজ্জু লটকানো না থাকে অথবা এ জাতীয় রুজ্জু যেন কেটে ফেলা হয়। (বুখারী)

২। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, "আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একথা বলতে শুনেছি,

أن الرقى والتمائم والتولة شرك. (رواه أحمد وأبو داؤد)

"ঝাড়-ফুঁক ও তাবিক- কবজ হচ্ছে শিরক" (আহমাদ, আবু দাউদ)

৩। আবদুল্লাহ বিন উকাইম থেকে মারফু' হাদিসে বর্ণিত আছে,

من تعلق شيئا وكل إليه (رواه أحمد والترمذي)

"যে ব্যক্তি কোন জিনিস [অর্থাৎ তাবিজ- কবজ] লটকায় সে উক্ত জিনিসের

ব্যাখ্যা

ঝাড়-ফুঁক ও তাবিজ-কবজ .

তাবিজ হচ্ছে ঝুলিয়ে বা লটকিয়ে রাখার জিনিস যার সাথে এর ব্যবহারকারী ব্যক্তির অন্তর সম্পৃক্ত থাকে। এ বিষয়ের বক্তব্য পুর্বোক্ত রিং, বালা ও সূতা সম্পর্কিত বক্তব্যের অনুরূপ।

এর মধ্যে কোনটি শিরকে আকবার হিসেবে গণ্য। যেমনঃ শয়তান বা অন্য কোন মাখলুকের কাছে সাহায্য চাওয়ার মধ্যে যা শামিল তাই শিরকে আকবরের অন্তর্ভুক্ত। কারণ আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ যা করতে সক্ষম নয় সে ব্যাপারে গাইরুল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া শিরকে আকবার (বা বড় শিরক)

এর মধ্যে কোন কোনটি আবার হারাম। যেমনঃ তাবিজ-কবজে এমন নাম ব্যবহার করা যার অর্থ বোধগম্য নয়। এ জাতীয় নাম মানুষকে শিরকের দিকে ধাবিত করে।

আর ঝুলানো জিনিস অর্থাৎ তাবিজ-কবজের মধ্যে যেগুলোতে কুরআন, নবীর হাদিস অথবা ভাল ও ভক্তিমূলক দোয়া রয়েছে সেগুলো পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। কারণ "শারে" অর্থাৎ শরিয়তের বিধান দাতার পক্ষ থেকে এগুলোর নির্দেশ আসেনি। আরো একটি কারণ হচ্ছে তাবিজ-কবজ হারাম কাজের অছিলা [মাধ্যম] হিসেবে ব্যবহার করা হয়। আর বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, এর ব্যবহারকারীই এর প্রতি কোন সম্মান দেখায় না। বরং এগুলো সাথে নিয়েই বিভিন্ন অপবিত্র স্থানে প্রবেশ করে।

দিকেই সমর্পিত হয়"। [অর্থাৎ এর কুফল তার উপরই বর্তায়] (আহমাদ, তিরমিযী)

تمائم বা তাবিজ হচ্ছে এমন জিনিস যা চোখ লাগা বা দৃষ্টি লাগা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সন্তানদের গায়ে ঝুলানো হয়। ঝুলন্ত জিনিসটি যদি কুরআনের অংশ হয় তাহলে সালাফে সালেহীনের কেউ কেউ এর অনুমতি দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ অনুমতি দেননি বরং এটাকে শরীয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয় বলে গণ্য করতেন। ইবনে মাসউদ রা. এ অভিমতের পক্ষে রয়েছেন। আর رقى বা ঝাড়-ফুঁককে عزائم নামে অভিহিত করা হয়। যে সব ঝাড়-ফুঁক শিরক মুক্ত তা দলিলের মাধ্যমে খাস করা হয়েছে। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চোখের দৃষ্টি লাগা এবং সাপ বিচ্ছুর বিষের ব্যাপারে ঝাড়-ফুঁকের অনুমতি দিয়েছেন।

تولة এমন জিনিস যা কবিরাজদের বানানো। তারা দাবি করে যে, এ জিনিস [কবজ] দ্বারা স্ত্রীর অন্তরে স্বামীর ভালোবাসা আর স্বামীর অন্তরে স্ত্রীর ভালোবাসার উদ্রেক হয়। সাহাবী রুআইফি থেকে ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন, তিনি [রুআইফি] বলেছেন, "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته، أو تقلد وترا، أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه.

[যেমনঃ পায়খানা, প্রশ্রাব খানা ইত্যাদি]।

ঝাড়-ফুঁকের ব্যাপারে বিস্তারিত কথা হচ্ছে এই যে, ঝাড়-ফুঁক যদি কুরআন, সুন্নাহ অথবা উত্তম কথার দ্বারা হয় তাহলে তা ফুঁক দানকারীর জন্য সওয়াবের কাজ হবে। কেননা এর মধ্যে 'এহসান' [অন্যের প্রতি দয়া] নিহিত আছে। তাছাড়াও এর মধ্যে নিহিত রয়েছে পরোপকার। ঝাড়-ফুঁক চাওয়া তার জন্য উচিত নয়। কারণ পূর্ণ "তাওয়াক্কুল" এবং ঈমানের দাবি হচ্ছে কোন মাখলুকের কাছে বান্দা কিছু চাবে না। চাই তা ঝাড়-ফুঁকই হোক বা অন্য কিছু হোক। বরং বান্দার উচিত যখন কোন ব্যক্তির কাছে সে দোয়া চাবে তখন দোয়াকারীর স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা। আল্লাহর উবুদিয়্যাত প্রতিষ্ঠায় সাহায্যকারী হিসেবে তার প্রতি এহসান করা। সাথে সাথে নিজের স্বার্থ ও মঙ্গলের দিকে খেয়াল রাখা। এটাই হচ্ছে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা এবং তার প্রকৃত অর্থের গোপন রহস্য। আল্লাহর কামেল বান্দা ব্যতীত এর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা এবং এর ভিত্তিতে আমল করা সম্ভব নয়।

“হে রুআইফি, তোমার হায়াত সম্ভবত দীর্ঘ হবে। তুমি লোকজনকে জানিয়ে দিও, “যে ব্যক্তি দাড়িতে গিরা দেবে, অথবা গলায় তাবিজ- কবজ ঝুলাবে অথবা পশুর মল কিংবা হাড় দ্বারা এস্তেঞ্জা করবে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জিম্মাদারী থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।”

সাঈদ বিন জুবাইর থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة (رواه وكيع)

“যে ব্যক্তি কোন মানুষের তাবিজ- কবজ ছিড়ে ফেলবে বা কেটে ফেলবে সে ব্যক্তি একটি গোলাম আযাদ করার মত কাজ করল।” (ওয়াকী)

ইবরাহীম থেকে বর্ণিত হাদিসে তিনি বলেন, তাঁরা সব ধরনের তাবীজ- কবজ অপছন্দ করতেন, চাই তার উৎস কুরআন হোক বা অন্য কিছু হোক।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। ঝাড়-ফুঁক ও তাবিজ-কবজের ব্যাখ্যা।

২। (تولة) “তাওলাহ” এর ব্যাখ্যা।

৩। কোন ব্যাতিক্রম ছাড়াই উপরোক্ত তিনটি বিষয় শিরক এর অন্ত র্ভুক্ত।

৪। সত্যবাণী তথা কুরআনের সাহায্যে [চোখের] দৃষ্টি লাগা এবং সাপ বিচ্ছুর বিষ নিরাময়ের জন্য ঝাড়–ফুঁক করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত নয়।

৫। তাবিজ- কবজ কুরআন থেকে হলে তা শিরক হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

ঝাড়-ফুঁকে যদি গাইরুল্লাহকে ডাকা হয় আর গাইরুল্লাহর কাছে রোগমুক্তি কামনা করা হয় তাহলে এটা হবে শিরকে আকবার। কারণ এরকম করার অর্থ হবে গাইরুল্লাহর কাছে দোয়া করা এবং সাহায্য চাওয়া।

এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা তুমি ভালবাবে উপলব্ধি করবে। ঝাড়-ফুঁকের কারণ ও উদ্দেশ্যের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকার পরও তুমি সর্বাবস্থায় এ ব্যাপারে কাউকে হুকুম করা থেকে সাবধান থাকবে।

৬। খারাপ দৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য পশুর রশি বা অন্য কিছু বুঝলানো শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

৭। যে ব্যক্তি ধনুকের রজ্জু গলায় ঝুলায় তার উপর কঠিন অভিসম্পাত।

৮। কোন মানুষের তাবিজ- কবজ ছিড়ে ফেলা কিংবা কেটে ফেলার ফজিলত।

৯। ইবরাহীমের কথা পূর্বোক্ত মতভেদের বিরোধী নয়। কারণ এর দ্বারা আব্দুল্লাহর সঙ্গী- সাহাবীদেরকে বুঝানো হয়েছে।

৯ম অধ্যায় .

গাছ, পাথর ইত্যাদি দ্বারা বরকত হাসিল করা

১। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى ﴿١٩﴾

" তোমরা কি [পাথরের তৈরী মুর্তি] 'লাত' আর "উয্যা" দেখেছো?" (আন নাজমঃ ১৯)।

২। আবু ওয়াকিদ আল-লাইছী রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, "আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে হুনাইনের [যুদ্ধের] উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। আমরা তখন সবেমাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছি [নও মুসলিম]। একস্থানে পৌত্তলিকদের একটি কুলগাছ ছিল যার চারপাশে তারা বসতো এবং তাদের সমরাস্ত্র ঝুলিয়ে রাখতো। গাছটিকে তারা ذات أنواط [যাত আনওয়াত] বলতো। আমরা একদিন একটি কুলগাছের পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল মুশরিকদের যেমন "যাতু আনওয়াত" আছে আমাদের জন্যও অনুরূপ "যাতু আনওয়াত" [অর্থাৎ একটি গাছ] নির্ধারণ করে দিন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنوا إسرائيل لموسى:

اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿١٣٨﴾ (الأعراف: ١٣٨)

ব্যাখ্যা

গাছ পাথর ইত্যাদি দ্বারা বরকত হাসিল করা

গাছ, পাথর ইত্যাদি দ্বারা বরকত হাসিল করা শিরক এবং মুশরিকদের কর্ম কান্ডের অন্তর্ভুক্ত। কেননা উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, কোন ধরনের গাছ, পাথর, স্থান, নিদর্শন ইত্যাদি দ্বারা বরকত হাসিল করা শরীয়ত সম্মত নয়। এ কাজের মাধ্যমে

“আল্লাহু আকবার, তোমাদের এ দাবীটি পূর্ববর্তী লোকদের রীতি-নীতি ছাড়া আর কিছুই নয়। যার হাতে আমার জীবন তাঁর কসম করে বলছি, তোমরা এমন কথাই বলেছো যা বনী ইসরাইল মুসা আ. কে বলেছিল। তারা বলেছিল, “হে মুসা, মুশরিকদের যেমন মা’বুদ আছে আমাদের জন্য তেমন মা’বুদ বানিয়ে দাও। মুসা আ. বললেন, তোমরা মূর্খের মতো কথা বার্তা বলছো” (আরাফঃ ১৩৮)। তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের রীতি-নীতিই অবলম্বন করছো। (তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয় গুলো জানা যায়ঃ-

১। সূরা নাজম এর أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى এর তাফসীর।

২। সাহাবায়ে কেরামের কাংখিত বিষয়টির পরিচয়।

৩। তারা [সাহাবায়ে কেরাম] শিরক করেননি।

৪। তাঁরা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে চেয়েছিলেন এ কথা ভেবে যে, আল্লাহ তা [কাংখিত বিষয়টি] পছন্দ করেন।

৫। সাহাবায়ে কেরামই যদি এ ব্যাপারে অজ্ঞ থাকেন তাহলে অন্য লোকেরা তো এ ব্যাপারে আরো বেশি অজ্ঞ থাকবে।

৬। সাহাবায়ে কেরামের জন্য যে অধিক সওয়াব দান ও গুনাহ মাফের ওয়াদা রয়েছে অন্যদের ব্যাপারে তা নেই।

৭। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের কাছে অপারগতার কথা বলেননি বরং তাঁদের কথার শক্ত জবাব এ কথার মাধ্যমে দিয়েছেনঃ

الله أكبر إنها السنن، لتتبعن سنن من كان قبلكم.

“আল্লাহু আকবার নিশ্চয়ই এটা পূর্ববর্তী লোকদের নীতি। তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের নীতি অনুসরণ করছো।” উপরোক্ত

শরীয়তে সীমা লঙ্ঘন করা হয়। আর তা পর্যায় ক্রমে উক্ত জিনিস গুলোর কাছে দোয়া করা এবং এ গুলোর ইবাদত করার দিকে মানুষকে ধাবিত করে। এ রকম করাটাই হচ্ছে শিরকে আকবার, যার সীমা ও বিস্তৃতি সম্পর্কে ইতি পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। সব ক্ষেত্রেই এ নীতি প্রযোজ্য। এমনকি ‘মাকামে ইবরাহীম’, ‘হুজরাতুন্নবী’ [নবী স.) এর

তিনটি কথার দ্বারা বিষয়টি অধিক গুরুত্ব লাভ করেছে।

৮। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে "উদ্দেশ্য"। এখানে এ কথাও জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরামের দাবি মূলতঃ মুসা আ. এর কাছে বনী ইসরাইলের মা'বুদ বানিয়ে দেয়ার দাবীরই অনুরূপ ছিল।

৯। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক না সূচক জবাবের মধ্যেই তাঁদের জন্য "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর" মর্মার্থ অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে নিহিত আছে।

১০। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফতোয়া দানের ব্যাপারে "হলফ" করেছেন।

১১। শিরকের মধ্যে 'আকবার' ও 'আসগার' রয়েছে। কারণ, তাঁরা এর দ্বারা দীন থেকে বের হয়ে যাননি।

১২। "আমরা কুফরি যমানার খুব কাছাকাছি ছিলাম" [অর্থাৎ আমরা সবেমাত্র মুসলমান হয়েছি] এ কথার দ্বারা বুঝা যায় যে অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম এ ব্যাপারে অজ্ঞ ছিলেন না।

১৩। আশ্চর্যজনক ব্যাপারে যারা 'আল্লাহু আকবার' বলা পছন্দ করে না, এটা তাদের বিরুদ্ধে একটা দলিল।

১৪। পাপের পথ বন্ধ করা।

১৫। জাহেলি যুগের লোকদের সাথে নিজেদের সামঞ্জস্যশীল করা নিষেধ।

১৬। শিক্ষাদানের সময় প্রয়োজন বোধে রাগ করা।

১৭। إنها السنن "এটা পূর্ববর্তী লোকদের নীতি" এ বাণী একটা চিরন্তন নীতি।

১৮। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সংবাদ বলেছেন, বাস্তবে তাই ঘটেছে। এটা নবুয়তেরই নিদর্শন।

হুজরা মোবারক [বাইতুল মোকাদ্দাসের পবিত্র পাথর এবং অন্যান্য পবিত্র স্থানের ব্যাপারেও একই কথা।

'হাজরে আসওয়াদ' [কৃষ্ণ পাথর] স্পর্শ করা, চুম্বন দেয়া, পবিত্র কা'বা ঘরের রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করা কিংবা চুম্বন দেয়া এ সবই হচ্ছে আল্লাহর উবুদিয়্যাত, তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন, তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কাছে নতি স্বীকার করার নিদর্শন।

১৯। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা ইহুদি ও খৃষ্টানদের চরিত্র সম্পর্কে যে দোষ-ত্রুটির কথা বলেছেন, তা থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করার জন্যই বলেছেন।

২০। তাদের [আহলে কিতাবের] কাছে এ কথা স্বীকৃত যে ইবাদতের ভিত্তি হচ্ছে [আল্লাহ কিংবা রাসুলের] নির্দেশ। এখানে কবর সংক্রান্ত বিষয়ে শর্তকতা অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে।

من ربك [তোমার রব কে?] দ্বারা যা বুঝানো হয়েছে তা সুস্পষ্ট। [অর্থাৎ আল্লাহ শিরক করার নির্দেশ না দেয়া সত্বেও তুমি শিরক করেছো। তাহলে তোমার রব কে যার হুকুমে শিরক করেছো?]। من نبيك [তোমার নবী কে] এটা নবী কর্তৃক গায়েবের খবর [অর্থাৎ কবরে কি প্রশ্ন করা হবে এ কথা নবী ছাড়া কেউ বলতে পারেনা। এখানে এ কথার দ্বারা বুঝানো হচ্ছে কে তোমার নবী? তিনি তো শিরক করার কথা বলেননি। তারপর ও তুমি শিরক করেছো। তাহলে তোমার শিরক করার নির্দেশ দাতা নবী কে?]

ما دينك [তোমার দীন কি] এ কথা তাদের اجعل لنا آلهة [আমাদের জন্যও ইলাহ ঠিক করে দিন} এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন করা হবে। [অর্থাৎ তোমার দ্বীনতো শিরক করার নির্দেশ দেয়নি তাহলে তোমাকে শিরকের নির্দেশ দান কারী দ্বীন কি?]

২১। মুশরিকদের রীতি-নীতির মত আহলে কিতাবের [অর্থাৎ

এগুলো হচ্ছে ইবাদতের প্রাণ শক্তি, সৃষ্টি কর্তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তাঁরই ইবাদত হিসেবে গণ্য। পক্ষান্তরে গাছ, পাথর ইত্যাদি দ্বারা বরকত হাসিলের বিষয়টি হচ্ছে মাখলুকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তাকে মা'বুদ হিসেবে গ্রহণ করার শামিল।

'আল্লাহর কাছে দোয়া করা, যা ইখলাস ও তাওহীদের পরিচায়ক', আর 'মাখলুকের কাছে দোয়া করা' যা শিরক ও কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করার মাঝে যে বিরাট পার্থক্য নিহিত রয়েছে, উপরোক্ত দু'টি বিষয়ের মধ্যেও ঠিক একই পার্থক্য নিহিত রয়েছে।

আসমানী কিতাব প্রাপ্তদের] রীতি-নীতিও দোষনীয়।

২২। যে বাতিল এক সময় অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিলো তা পরিবর্তনকারী একজন নওমুসলিমের অন্তর পূর্বের সে অভ্যাস ও স্বভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। ونحن حدثاء عهد بكفر [আমরা কুফরি যুগের খুব নিকটবর্তী ছিলাম বা নতুন মুসলমান ছিলাম] সাহাবীদের এ কথার দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয়।

১০ম অধ্যায়

গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে যবেহ করা

১। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ (الأنعام: ١٦٢-١٦٣)

"আপনি বলুন, "আমার সালাত, আমার কোরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ [সবই] আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের উদ্দেশ্যে নিবেদিত, যার কোন শরিক নেই" (আনআম : ১৬২)

২। আল্লাহ তাআলা আরো এরশাদ করেছেন,

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴿٢﴾ (الكوثر: ٢)

"আপনি আপনার রবের উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ুন এবং কোরবানী করুন। (আল-কাউসার : ২)

৩। আলী রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, "রাসূল সাহাবী চারটি বিষয়ে আমাকে অবহিত করেছেন,

(ক) لعن الله من ذبح لغير الله

"যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে (পশু) যবেহ করে তার উপর আল্লাহর লা'নত।"

(খ) لعن الله من لعن والديه

"যে ব্যক্তি নিজ পিতা- মাতাকে অভিশাপ দেয় তার উপর আল্লাহর লা'নত।"

ব্যাখ্যা

গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে [পশু] যবেহ করা নিঃসন্দেহে শিরক। কেননা নামাজের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার নির্দেশ যেমন সুস্পষ্ট তেমনি আল্লাহর উদ্দেশ্যে যবেহ করার ব্যাপারেও তাঁর নির্দেশ দ্ব্যর্থহীন। আল্লাহ তাআলা তাঁর মহাগ্রন্থে২০১৯ বিভিন্ন স্থানে পশু যবেহ করার বিষয়টি নামাজের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন।

(গ) لعن الله من آوى محدثا

"যে ব্যক্তি কোন বিদআতীকে আশ্রয় দেয় তার উপর আল্লাহর লা'নত।"

(ঘ) لعن الله من غير منار الأرض

"যে ব্যক্তি জমির সীমানা [চিহ্ন] পরিবর্তন করে তার উপর আল্লাহর লা'নত"। (মুসলিম)

৪। তারিক বিন শিহাব কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন :

دخل الجنة رجل فى ذباب، ودخل النار رجل فى ذباب، قالوا : وكيف ذلك يا رسول الله ؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما : قرب، قال: ليس عندي شيء أقرب، قالوا له: قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله، فدخل النار، وقالوا للآخر: قرب، فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه، فدخل الجنة. (رواه احمد)

"এক ব্যক্তি একটি মাছির ব্যাপারে জান্নাতে প্রবেশ করেছে। আর এক ব্যক্তি একটি মাছির ব্যাপারে জাহান্নামে গিয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এমনটি কিভাবে হলো? তিনি বললেন, 'দু'জন লোক এমন একটি কওমের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল যার জন্য একটি মূর্তি নির্ধারিত ছিল। উক্ত মূর্তিকে কোন কিছু নযরানা বা উপহার না দিয়ে কেউ সে স্থান অতিক্রম করতোনা। উক্ত কওমের লোকেরা দু'জনের একজনকে বলল, 'মূর্তির জন্য তুমি কিছু নযরানা পেশ করো'। সে বলল,

---

এ কথা যখন প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করা একটি মহৎ ইবাদত ও আনুগত্যের অন্তর্ভূক্ত, তখন গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করা শিরকে আকবার, যা মানুষকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয়ার মত অপরাধ।

শিরকে আকবারের সীমা এবং যে তাফসীর শিরকের বিভিন্ন প্রকার ও শ্রেণীকে একত্রিত করেছে [অর্থাৎ শিরকে আকবরের সীমা ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা দ্বারা যা বুঝা যায়]

‘নযরানা দেয়ার মত আমার কাছে কিছুই নেই’ তারা বলল, ‘অন্ততঃ একটা মাছি হলেও নযরানা স্বরূপ দিয়ে যাও’। অতঃপর সে একটা মাছি মূর্তিকে উপহার দিলো। তারাও লোকটির পথ ছেড়ে দিলো। এর ফলে মৃত্যুর পর সে জাহান্নামে গেলো। অপর ব্যক্তিকে তারা বলল, “মূর্তিকে তুমিও কিছু নযরানা দিয়ে যাও। সে বলল, ‘একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নৈকট্য লাভের জন্য আমি কাউকে কোন নযরানা দেইনা’ এর ফলে তারা তার গর্দান উড়িয়ে দিলো। [শিরক থেকে বিরত থাকার কারণে] মৃত্যুর পর সে জান্নাতে প্রবেশ করল।” (আহমদ)

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয় গুলো জানা যায় :

১। قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي এর তাফসীর।

২। فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ এর তাফসীর।

৩। প্রথম অভিশপ্ত ব্যক্তি হচ্ছে গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে পশু যবেহকারী।

৪। যে ব্যক্তি নিজ পিতা-মাতাকে অভিশাপ দেয় তার উপর আল্লাহর লা’নত। এরমধ্যে এ কথাও নিহিত আছে যে তুমি কোন ব্যক্তির পিতা-মাতাকে অভিশাপ দিলে সেও তোমার পিতা-মাতাকে অভিশাপ দেবে।

৫। যে ব্যক্তি বিদআতীকে আশ্রয় দেয় তার উপর আল্লাহর লা’নত। বিদআতী হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে দ্বীনের মধ্যে এমন কোন নতুন বিষয় আবিস্কার

তার ফল হচ্ছে এই যে, বান্দার কোন প্রকার ইবাদত অথবা এর সামান্যতম অংশ গাইরুল্লাহর জন্য নিবেদিত করা শিরকে আকবরের অন্তর্ভুক্ত। তাই যে ধ্যান-ধারণা, কথা-বার্তা ও কাজ কর্ম শারে’ [শরীয়ত প্রণেতা] এর পক্ষ থেকে নির্দেশিত হয়েছে বলে প্রমাণিত সে গুলো এক আল্লাহর জন্য সম্পন্ন করার নামই হচ্ছে তাওহীদ, ঈমান ও ইখলাস।

পক্ষান্তরে এগুলো গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে সম্পন্ন করার নামই হচ্ছে শিরক এবং কুফর। শিরকে আকবার নির্ণয়ের এ ব্যাপক মূলনীতি [যা থেকে কিছুই বাদ পড়েনি] গ্রহণ করা উচিত।

বা উদ্ভাবন করে, যাতে আল্লাহর হক ওয়াজিব হয়ে যায়। এর ফলে সে এমন ব্যক্তির আশ্রয় চায় যে তাকে উক্ত বিষয়ের দোষ ত্রুটি বা অশুভ পরিণতি থেকে রক্ষা করতে পারে।

৬। যে ব্যক্তি জমির সীমানা বা চিহ্ন পরিবর্তন করে তার উপর আল্লাহর লা'নত। এটা এমন চিহ্নিত সীমানা যা তোমার এবং তোমার প্রতিবেশীর জমির অধিকারের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে। এটা পরিবর্তনের অর্থ হচ্ছে, তার নির্ধারিত স্থান থেকে সীমানা এগিয়ে আনা অথবা পিছনে নিয়ে যাওয়া।

৭। নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর লা'নত এবং সাধারণভাবে পাপীদের উপর লা'নতের মধ্যে পার্থক্য।

৮। এ গুরুত্বপূর্ণ কাহিনীটি মাছির কাহিনী হিসেবে পরিচিত।

৯। তার জাহান্নামে প্রবশে করার কারণ হচ্ছে ঐ মাছি, যা নযরানা হিসেবে মূর্তিকে দেয়ার কোন ইচ্ছা না থাকা সত্বেও কওমের অনিষ্টতা হতে বাঁচার উদ্দেশ্যেই সে [মাছিটি নযরানা হিসেবে মূর্তিকে দিয়ে শিরকী] কাজটি করেছে।

১০। মোমিনের অন্তরে শিরকের [মারাত্মক ও ক্ষতিকর] অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ। নিহত [জান্নাতী] ব্যক্তি নিহত হওয়ার ব্যাপারে কি ভাবে ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু তাদের দাবির কাছে সে মাথা নত করেনি। অথচ তারা তার কাছে কেলমাত্র বাহ্যিক আমল ছাড়া আর কিছুই দাবি করেনি।

শিরকে আসগার হচ্ছে বান্দার এমন সব উপায় উপকরণ, যে গুলো কামনা-বাসনা, কথা-বার্তা ও কাজ-কর্মের মাধ্যমে বান্দাকে শিরকে আকবারের দিকে ধাবিত করে যদিও তা ইবাদতের পর্যায়ে উপনীত হয়নি।

তাই তোমার উচিত শিরকে আকবার ও আসগারের মূলনীতির প্রতি দৃষ্টি রেখে চলা। কেননা এ জ্ঞান অত্র গ্রন্থটির বর্তমান অধ্যায়ের পূর্ব ও পরবর্তী অধ্যায়গুলো বুঝার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে। আর এর সাহায্যেই তুমি এমন সব বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবে যে সব বিষয়ে অধিক সংশয় ও দ্বিধা-দ্বন্ধের অবকাশ আছে।

১১। যে ব্যক্তি জাহান্নামে গিয়েছে সে একজন মুসলমান। কারণ সে যদি কাফের হতো তাহলে এ কথা বলা হতোনা دخل النار فى ذباب একটি মাছির ব্যাপারে সে জাহান্নামে প্রবেশ করেছে। [অর্থাৎ মাছি সংক্রান্ত শিরকী ঘটনার পূর্বে সে জান্নাতে যাওয়ার যোগ্য ছিল]

১২। এতে সেই সহীহ হাদিসের পক্ষে সাক্ষ্য পাওয়া যায়, যাতে বলা হয়েছে, الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك

"জান্নাত তোমাদের কোন ব্যক্তির কাছে তার জুতার ফিতার চেয়েও নিকটবর্তী। জাহান্নামও তদ্রুপ নিকটবর্তী।"

১৩। এটা জেনে নেয়া প্রয়োজন যে, অন্তরের আমলই হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য। এমনকি মূর্তি পূজারীদের কাছেও এ কথা স্বীকৃত।

১১ তম অধ্যায়
যে স্থানে গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে [পশু] যবেহ করা হয় সে স্থানে আল্লাহর উদ্দেশ্যে যবেহ করা শরীয়ত সম্মত নয়

১। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا. (التوبة: ١٠٨)

"হে নবী, আপনি কখনো সেখানে দাঁড়াবেন না।" তাওবাহ . ১০৮)

২। সাহাবী ছাবিত বিন আদ্দাহহাক রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন,

نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا : لا قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم قالو: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر فى معصية الله، ولافيما لا يملك ابن آدم. (رواه أبو داود وإسناده على شرطهما)

এক ব্যক্তি বুওয়ানা নামক স্থানে একটি উট কুরবানী করার জন্য মান্নত করল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, "সে স্থানে

ব্যাখ্যা

যে স্থানে গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে কিছু যবেহ করা হয় সেখানে আল্লাহর উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করা শরীয়ত সম্মত নয়। এ অধ্যায়টি পূর্বোক্ত অধ্যায়ের পরপরই সন্নিবেশিত করা উত্তম হয়েছে। কারণ পূর্বের অধ্যায়টিতে উদ্দেশ্য এবং এ অধ্যায়ে তার মাধ্যমগুলো আলোচনা করা হয়েছে। পূর্বের অধ্যায়টি ছিল শিরকে আকবারের অন্তর্ভুক্ত। আর এ অধ্যায়টিতে শিরকের নিকটবর্তী মাধ্যম গুলোর কথা আলোচিত হয়েছে।

যে স্থানে মুশরিকরা তাদের দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করে সে স্থানটি

এমন কোন মূর্তি ছিল কি, জাহেলি যুগে যার পূজা করা হতো” সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ‘না,। তিনি বললেন, “সে স্থানে কি তাদের কোন উৎসব বা মেলা অনুষ্ঠিত হতো? “তাঁরা বললেন, ‘না’ [অর্থাৎ এমন কিছু হতোনা] তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তুমি তোমার মান্নত পূর্ণ করো।” তিনি আরো বললেন, “আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজে মান্নত পূর্ণ করা যাবে না। আদম সন্তান যা করতে সক্ষম নয় তেমন মান্নতও পূরা করা যাবে না। (আবু দাউদ)

এ অধ্যায় থেকে যে সব বিষয় জানা যায় তা নিম্নরূপঃ

১।। لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا।। এর তাফসীর।

২। দুনিয়াতে যেমনি ভাবে পাপের [ক্ষতিকর] প্রভাব পড়তে পারে, তেমনিভাবে [আল্লাহর] আনুগত্যের [কল্যাণময়] প্রভাবও পড়তে পারে।

৩। দুর্বোধ্যতা দূর করার জন্য কঠিন বিষয়কে সুস্পষ্ট ও সহজ বিষয়ের দিকে নিয়ে যাওয়া যায়।

৪। প্রয়োজন বোধে “মুফতী” জিজ্ঞাসিত বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ [প্রশ্ন কারীর কাছে] চাইতে পারেন।

৫। মান্নতের মাধ্যমে কোন স্থানকে খাস করা কোন দোষের বিষয় নয়, যদি তাতে শরিয়তের কোন বাধা-বিপত্তি না থাকে।

৬। জাহেলি যুগের মূর্তি থাকলে তা দূর করার পরও সেখানে মান্নত করতে নিষেধ করা হয়েছে।

৭। জাহেলি যুগের কোন উৎসব বা মেলা কোন স্থানে অনুষ্ঠিত হয়ে

শিরকের নিদর্শনে [তাদের ভাষায় পূণ্য লাভের স্থানে] পরিণত হয়। কারণ এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, দেব-দেবীর নৈকট্য লাভ করা এবং আল্লাহর সাথে শরিক করা। এ কারণেই যদি কোন মুসলমান আল্লাহকে সন্তুষ্টি করার নিয়তেও উক্ত স্থানে পশু যবেহ করে, তবু তা হবে মুশরিকদের অনুরূপ কাজ এবং মুশরিকদের দৃষ্টিতে তাদের পূণ্যময় স্থানের অংশীদার। মুশরিকদের কোন কাজের সাথে বাহ্যিক মিল, অধিকন্তু তাদের সাথে আভ্যন্তরীন মিল এবং তাদের প্রতি আসক্তিরই পরিচায়ক।

থাকলে, তা বন্ধ করার পরও সেখানে মান্নত করা নিষিদ্ধ।

৮। এসব স্থানের মান্নত পূরণ করা জায়েজ নয়। কেননা এটা অপরাধমূলক কাজের মান্নত।

৯। মুশরিকদের উৎসব বা মেলার সাথে কোন কাজ সাদৃশ্যপূর্ণ ও সামঞ্জস্যশীল হওয়ার ব্যাপারে খুব সাবধান থাকতে হবে।

১০। পাপের কাজে কোন মান্নত করা যাবে না।

১১। যে বিষয়ের উপর আদম সন্তানের কোন হাত নেই সে বিষয়ে মান্নত পূরা করা যাবে না।

এ কারণেই 'শারে' অর্থাৎ শরিয়তের বিধান দাতা, কাফেরদের নিদর্শন তাদের প্রকৃতি, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং তাদের সাথে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয়ে মিল ও সামঞ্জস্য রাখতে নিষেধ করেছেন। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলমানদেরকে কাফের ও মুশরিকদের এমন সব সাদৃশ্যমূলক বিষয় থেকে দূরে রাখা, যেগুলো তাদের প্রতি আকর্ষণ ও আসক্তির দিকে ধাবিত করে। এমনকি মুশরিকরা যে সময় গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে সেজদা করতো, বিজাতীয় অনুকরণের আশংকায় সে সময় নফল নামায পড়তে [মুসলমানদেরকে] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন।

১২ তম অধ্যায়

গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে মান্নত করা শিরক

১। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ. (الإنسان: ٧)

"তারা মান্নত পূরা করে" (ইনসান : ৭)

২। আল্লাহ তাআলা আরো এরশাদ করেছেন,

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ (البقرة: ٢٧٠)

"তোমরা যা কিছু খরচ করেছো আর যে মান্নত মেনেছো, তা আল্লাহ জানেন" (বাকারা : ২৭০)

৩। সহীহ বুখারীতে আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.

"যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যের কাজে মান্নত করে সে যেন তা পূরা করার মাধ্যমে তাঁর আনুগত্য করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজে মান্নত করে সে যেন তাঁর নাফরমানি না করে।" [অথাৎ মান্নত যেন পূরা না করে।"

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। নেক কাজে মান্নত পূরা করা ওয়াজিব।

২। মান্নত যেহেতু আল্লাহর ইবাদত হিসেবে প্রমাণিত, সেহেতু গাইরুল্লাহর জন্য মান্নত করা শিরক।

৩। আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজে মান্নত পূরণ করা জায়েয নয়।

১৩ তম অধ্যায়

গাইরুল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া শিরক

১। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿الجن:٦﴾

“মানুষের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোক কতিপয় জ্বিনের কাছে আশ্রয় চাইতেছিল, এর ফলে তাদের [জ্বিনদের] গর্ব ও আহমিকা আরো বেড়ে গিয়েছিল।” (জিন . ৬)

২। খাওলা বিনতে হাকীম রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, “আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ কথা বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন মঞ্জিলে অবতীর্ণ হয়ে বলল,

أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. (رواه مسلم)

“আমি আল্লাহ তাআলার পূর্ণাঙ্গ কালামের কাছে তাঁর সৃষ্টির সকল অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় চাই।” তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত সে ঐ মঞ্জিল ত্যাগ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন কিছুই তার ক্ষতি করতে পারবে না। (মুসলিম)

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১। সূরা জ্বিনের ৬ নং আয়াতের তাফসীর।

২। গাইরুল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া শিরকের মধ্যে গণ্য।

৩। হাদিসের মাধ্যমে এ বিষয়ের উপর [অর্থাৎ গাইরুল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া শিরক] দলিল পেশ করা। উলামায়ে কেরাম উক্ত হাদিস দ্বারা এ প্রমাণ পেশ করেন যে, কালিমাতুল্লাহ অর্থাৎ “আল্লাহর কালাম” মাখলুক [সৃষ্টি] নয়। তাঁরা বলেন ‘মাখলুকের কাছে আশ্রয় চাওয়া শিরক।’

৪। সংক্ষিপ্ত হলেও উক্ত দোয়ার ফজিলত।

৫। কোন বস্তু দ্বারা পার্থিক উপকার হাসিল করা অর্থাৎ কোন অনিষ্ট থেকে তা দ্বারা বেঁচে থাকা কিম্বা কোন স্বার্থ লাভ, এ কথা প্রমাণ করে না যে, উহা শেরকের অন্তর্ভুক্ত নয়।

১৪তম অধ্যায় .

গাইরুল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া অথবা দোয়া করা শিরক

১। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন,

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٦﴾ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ (يونس: ١٠٦-١٠٧)

"আল্লাহ ছাড়া এমন কোন সত্তাকে ডেকোনা, যা তোমার কোন উপকার করতে পারবে না এবং ক্ষতিও করতে পারবে না। যদি তুমি এমন কারো তাহলে নিশ্চয়ই তুমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহ যদি তোমাকে কোন বিপদে ফেলেন, তাহলে একমাত্র তিনি ব্যতীত আর কেউ তা থেকে তোমাকে উদ্ধার করতে পারবে না।" (ইউনুসঃ ১০৬, ১০৭)

২। আল্লাহ তাআলা আরো এরশাদ করেছেন,

فَابْتَغُوا عِنْدَ اللهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ (ألعنكبوت: ١٧)

"আল্লাহর কাছে রিজিক চাও এবং তাঁরই ইবাদত করো"।
(আনকাবুত : ১৭)

৩। আল্লাহ তাআলা অন্য এক আয়াতে এরশাদ করেছেন,

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (الأحقاف: ٥)

"তার চেয়ে অধিক ভ্রান্ত আর কে হতে পারে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ছাড়া এমন সত্তাকে ডাকে যে সত্তা কেয়ামত পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দিতে পারবে না"। (আহকাফ : ৫)

৪। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ (النمل: ٦٢)

"বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির ডাকে কে সাড়া দেয় যখন সে ডাকে ? আর কে তার কষ্ট দূর করে?" (নামল : ৬২)

৫। ইমাম তাবরানী বর্ণনা করেছেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে এমন একজন মুনাফেক ছিল, যে মোমিনদেরকে কষ্ট দিতো। তখন মুমিনরা পরস্পর বলতে লাগলো, চলো, আমরা এ মুনাফেকের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহায্য চাই। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন,

إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله

"আমার কাছে সাহায্য চাওয়া যাবে না। একমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইতে হবে।"

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১। সাহায্য চাওয়ার সাথে দোয়াকে আত্ফ্ করার ব্যাপারটি কোন عام বস্তুকে خاص বস্তুর সাথে সংযুক্ত করারই নামান্তর।

২। وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَআল্লাহর এ বাণীর তাফসীর।

ব্যাখ্যা

শিরকে আকবারের সীমারেখার ব্যাপারে ইতিপূর্বে আলোচিত মূলনীতি [অর্থাৎ যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে কোন ইবাদত করল সে মুশরিক] এর মর্মার্থ যখন তুমি উপলব্ধি করতে পারবে, তখন গ্রন্থকার কর্তৃক বর্ণিত এর পরবর্তী তিনটি অধ্যায় তুমি হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে। কেননা "মান্নত" ইবাদতের মধ্যে গণ্য। তাই যারা "মান্নত" পূরণ করে আল্লাহ তাদের প্রশংসা করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও নেক কাজে মান্নত পূরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এমন প্রতিটি জিনিসই "ইবাদত" যার প্রশংসা "শারে" [শরিয়তের বিধান দাতা] করেছেন অথবা যার সম্পাদনকারীর অথবা নির্দেশ কারীর প্রশংসা করেছেন।

৩। গাইরুল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া বা গাইরুল্লাহকে ডাকা 'শিরকে আকবার।'

৪। সব চেয়ে নেককার ব্যক্তিও যদি অন্যের সন্তুষ্টির জন্য গাইরুল্লাহর কাছে সাহায্য চায় বা দোয়া করে , তাহলেও সে জালিমদের অন্তর্ভূক্ত।

৫। এর পরবর্তী আয়াত অর্থাৎ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ এর তাফসীর।

৬। গাইরুল্লাহর কাছে দোয়া করা কুফরি কাজ হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়াতে এর কোন উপকারিতা নেই। [অর্থাৎ কুফরি কাজে কোন সময় দুনিয়াতে কিছু বৈষয়িক উপকারিতা পাওয়া যায়, কিন্তু গাইরুল্লাহর কাছে দোয়া করার মধ্যে দুনিয়ার উপকারও নেই]

৭। ৩য় আয়াত فَابْتَغُوا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ এর তাফসীর।

৮। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছে রিজিক চাওয়া উচিত নয়। যেমনিভাবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে জান্নাত চাওয়া উচিত নয়।

৯। ৪র্থ আয়াত অর্থাৎ

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

এর তাফসীর।

১০। যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর কাছে দোয়া করে, তার চেয়ে বড় পথভ্রষ্ট আর কেউ নয়।

তাই জাহেরী-বাতেনী কার্য-কলাপ ও কথা-বার্তার মধ্য থেকে যা আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন এবং যা দ্বারা তিনি সন্তুষ্ট হন এমন সব কিছুই আল্লাহর ইবাদত। মান্নতও এর [ইবাদতের] অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলা যাবতীয় অনিষ্টতা থেকে বেঁচে থাকার জন্য একমাত্র তাঁরই কাছে আশ্রয় চাওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। এমনিভাবে যাবতীয় বালা-মুসীবত ও দুঃখ-কষ্টের সময় একমাত্র তাঁরই কাছে সাহায্য চাওয়ার জন্য আদেশ করেছেন। এসব বিষয়ে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ইখলাস ও একনিষ্ঠতার নামই হচ্ছে ঈমান ও তাওহীদ। আর গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে এগুলো করার নামই হচ্ছে শিরক।

দোয়া এবং ইস্তেগাছার [সাহায্য চাওয়ার] মধ্যে পার্থক্য :

সাধারণভাবে সর্বাবস্থায় আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়ার নাম হচ্ছে 'দোয়া'। আর দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় আল্লাহর কাছে দোয়া করার নাম হচ্ছে 'ইস্তেগাছা'।

১১। যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর কাছে দোয়া করে সে গাইরুল্লাহ দোয়াকারী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবচেতন থাকে, অর্থাৎ তার ব্যাপারে গাইরুল্লাহ সম্পূর্ণ অনবহিত থাকে।

১২। مدعو [মাদউ'] অর্থাৎ যাকে ডাকা হয় কিংবা যার কাছে দোয়া করা হয়, দোয়াকারীর প্রতি তার রাগ ও শত্রুতার কারণেই হচ্ছে ঐ দোয়া যা তার [গাইরুল্লাহার] কাছে করা হয়। [কারণ প্রকৃত মাদউ'] কখনো এরকম শিরকী কাজের অনুমতি কিংবা নির্দেশ দেয়নি]।

১৩। গাইরুল্লাহকে ডাকার অর্থই হচ্ছে তার ইবাদত করা।

১৪। ঐ ইবাদতের মাধ্যমেই কুফরি করা হয়।

১৫। আর এটাই তার [গাইরুল্লাহর কাছে দোয়া কারীর] জন্য মানুষের মধ্যে সবচেয়ে পাপী ব্যক্তি হওয়ার একমাত্র কারণ।

১৬। পঞ্চম আয়াত অর্থাৎ

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ এর তাফসীর।

১৭। বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে এই যে, মূর্তি পূজারীরাও একথা স্বীকার করে যে, বিপদগ্রস্ত, অস্থির ও ব্যাকুল ব্যক্তির ডাকে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ সাড়া দিতে পারে না। এ কারণেই তারা যখন কঠিন মুসীবতে পতিত হয়, তখন ইখলাস ও আন্তরিকতার সাথে তারা আল্লাহকে ডাকে।

১৮। এর মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক তাওহীদের হেফাযত, সংরক্ষণ এবং আল্লাহ তাআলার সাথে আদব-কায়দা রক্ষা করে চলার বিষয়টি জানা গেলো।

এসব ব্যাপারে আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ হওয়াই বাঞ্চনীয়। তিনিই দোয়া কারীর ডাকে সাড়া দেন। তিনিই বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। আল্লাহকে বাদ দিয়ে যে ব্যক্তি কোন নবী, ফিরিস্তা, অলী অথবা অন্য কারো নিকট দোয়া করল কিংবা গাইরুল্লাহর কাছে এমন ব্যাপারে সাহায্য চাইলো, যে ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো কিছু করার ক্ষমতা নেই, সে মুশরিক, কাফির। সাথে সাথে সে দ্বীন থেকে বের হয়ে গেলো এবং জ্ঞান শূন্য উন্মাদে পরিণত হলো।

সৃষ্টি জগতের কারো কাছেই তার নিজের কিংবা অন্যের কল্যাণ সাধন অথবা মুসীবত দূর করার ক্ষমতা নেই। বরং সৃষ্টি কুলের সবাই সর্ব বিষয়ে আল্লাহর নিকট মূখাপেক্ষী।

১৫তম অধ্যায়

তাওহীদের মর্মকথা

১। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿١٩١﴾ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿١٩٢﴾ (الأعراف)

"তারা কি আল্লাহর সাথে এমন সব বস্তুকে শরিক করে যারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না। বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট হয়। আর তারা তাদেরকে [মুশরিকদেরকে] কোন রকম সাহায্য করতে পারে না।"
(আরাফ: ১৯১-১৯২)

২। আল্লাহ তাআলা আরো এরশাদ করেছেন,

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴿فاطر: ١٣﴾

"তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে [উপকার সাধন অথবা মুসীবত দূর করার জন্য] ডাকো তারা কোন কিছুরই মালিক নয়।" (ফাতের : ১৩)

৩। সহীহ বুখারীতে আনাস রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আঘাত প্রাপ্ত হলেন এবং তাঁর সামনের দাঁত ভেঙ্গে গেলো। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুঃখ করে বললেন,

كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت:

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ﴿١٢٨﴾ (آل عمران)

ব্যাখ্যা

আল্লাহর বাণী . أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون

"তারা কি আল্লাহর সাথে এমন জিনিসকে শরিক করে যারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারেনা। বরং তারা নিজেরাই সৃষ্টি হয়"। আল্লাহ তাআলার এ বাণী তাওহীদের দলিল ও প্রমাণাদির ক্ষেত্রে সূচনা মাত্র। তাওহীদের জন্য এত বেশি নকলী [কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক] এবং আকলি [জ্ঞানী ও বুদ্ধিবৃত্তিক] দলিল প্রমাণাদি রয়েছে যা অন্য বিষয়ের জন্য নেই।

ইতিপূর্বে আলোচিত দু'রকমের তাওহীদ অর্থাৎ রুববিয়্যাতের তাওহীদ এবং আসমা ও সিফাতের তাওহীদ হচ্ছে আল্লাহর একত্ববাদের সবচেয়ে বড় দলিল ও প্রমাণ।

“সে জাতি কেমন করে কল্যাণ লাভ করবে, যারা তাদের নবীকে আঘাত দেয়”। তখন لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ এ আয়াত নাজিল হলো। যার অর্থ হচ্ছে, [আল্লাহর] এ [ফয়সালার] ব্যাপারে আপনার কোন হাত নেই।’

৪। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ফজরের নামাজের শেষ রাকাতে রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد বলার পর এ কথা বলতে শুনেছেন اللهم العن فلانا وفلانا “আল্লাহ তুমি অমুক, অমুক, [নাম উল্লেখ করে] ব্যক্তির উপর তোমার লানত নাজিল করো।” তখন এ আয়াত নাজিল হয় لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ অর্থাৎ “এ বিষয়ে তোমার কোন এখতিয়ার নেই।” আরেক বর্ণনায় আছে, যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফওয়ান ইবনে উমাইয়্যা এবং সোহাইল বিন আমর আল-হারিছ বিন হিশামের উপর বদদোয়া করেন তখন এ আয়াত নাজিল হয়েছে। لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ

৫। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর যখন وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿٢١٤﴾ নাজিল হলো তখন আমাদেরকে কিছু বলার জন্য দাঁড়ালেন। অতঃপর তিনি বললেন,

يا معشر قريش ـ أو كلمة نحوها ـ اشتروا أنفسكم لا أغني غنكم من الله شيئا، يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا.

অতএব, সৃষ্টি ও বিশ্ব নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে যিনি এক, এবং সর্ব বিষয়ে যিনি “কামালে মুতলাক” [অর্থাৎ নিরঙ্কুশ পূর্ণতার অধিকারী, তিনি ছাড়া আর কেউ ইবাদতের হকদার নয়।

এমনিভাবে তাওহীদের আরো প্রমাণ হচ্ছে, মাখলুকের গুণাগুণ এবং কে ইবাদতের মধ্যে শিরক করছে সে সম্পর্কিত জ্ঞান। কেননা আল্লাহ ছাড়া ফিরিস্তা মানুষ, গাছ, পাথর, এবং অন্য যারই ইবাদত করা হোক না কেন সবই আল্লাহর মুখাপেক্ষী, এবং তাঁর কাছে ক্ষমতাহীন। বিন্দুমাত্র উপকার সাধনের কোন ক্ষমতা তাদের নেই। কোন

কিছুই তারা সৃষ্টি করতে পারেনা। বরং নিজেরাই [আল্লাহর] সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত। ক্ষতি, কল্যাণ, মৃত্যু, জীবন, পুনরুত্থান ইত্যাদির উপর তাদের কোন ইখতেয়ার নেই।

"হে কুরাইশ বংশের লোকেরা [অথবা এ ধরণেরই কোন কথা বলেছেন] তোমরা তোমাদের জীবনকে খরিদ করে নাও। [শিরকের পথ পরিত্যাগ করতঃ তাওহীদের পথ অবলম্বন করার মাধ্যমে জাহান্নামের শাস্তি থেকে নিজেদেরকে বাঁচাও] আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার ব্যাপারে আমি তোমাদের কোন উপকারে আসব না। হে আব্বাস বিন আবদুল মোত্তালিব আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার ব্যাপারে আমি আপনার জন্য কোন উপকার করতে সক্ষম নই। হে রাসূলুল্লাহর ফুফু সাফিয়্যাহ, আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার ব্যাপারে আমি আপনার কোন উপকার করতে সক্ষম নই। হে মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমা, আমার সম্পদ থেকে যা খুশী চাও। কিন্তু আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার ব্যাপারে তোমার কোন উপকার করার ক্ষমতা আমার নেই।"

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ-

১। এ অধ্যায়ে উল্লেখিত দু'টি আয়াতের তাফসীর।

২। উহুদ যুদ্ধের কাহিনী।

৩। নামাজে সাইয়্যেদুল মুরসালীন তথা বিশ্বনবী কর্তৃক "দোয়াতে কনুত" পাঠ করা এবং নেতৃস্থানীয় সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক আমীন বলা।

একমাত্র আল্লাহ তাআলাই সকল সৃষ্টির স্রষ্টা। রিজিক গ্রহণকারী প্রতিটি জীবের জন্যই তিনি কল্যাণ ও অকল্যানের একচ্ছত্র অধিপতি। তিনি কিছু দেয়া বা না দেয়ার একমাত্র মালিক। সবকিছুর মালিকানা তাঁরই হাতে নিবদ্ধ। সব কিছুই তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তনকারী। তিনিই সকল কামনা ও সাধনার আধার। সবকিছুই তাঁর করতলগত।

আল্লাহ তাআলা তাঁর মহাগ্রন্থের বহু জায়গায় এবং তাঁর রাসূলের পবিত্র জবানে [তাওহীদের উপর] যে দলিল-প্রমাণ পেশ করেছেন তার চেয়ে উত্তম দলিল আর কি হতে পারে? আল্লাহর ওহয়াদানিয়্যাত যে অত্যাবশ্যক ও হক, আর শিরক যে বাতিল, এ মহা

৪। যাদের উপর বদ দোয়া করা হয়েছে তারা কাফের।

৫। অধিকাংশ কাফেররা অতীতে যা করেছিলো তারাও তাই করেছে। যেমন, নবীদেরকে আঘাত করা, তাঁদেরকে হত্যা করতে চাওয়া এবং একই বংশের লোক হওয়া সত্ত্বেও মৃত ব্যক্তির নাক, কান কাটা।

৬। এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ নাজিল হওয়া।

৭। أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ ﴿١٢٨﴾(آل عمران) এরপর তারা তাওবা করল।

আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করলেন, আর তারাও আল্লাহর উপর ঈমান আনলো।

৮। বালা-মুসীবতের সময় দোয়া-কুনুত পড়া।

৯। যাদের উপর বদ দোয়া করা হয়, নামাজের মধ্যে তাদের নাম এবং তাদের পিতার নাম উল্লেখ করে বদ দোয়া করা।

১০। "কুনুতে নাযেলায়" নির্দিষ্ট করে অভিসম্পাত করা।

১১। وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ নাজিল হওয়ার পর নবী জীবনের ঘটনা।

১২। ইসলামের দাওয়াত প্রচারের ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অক্লান্ত

সত্যের জন্য বর্ণিত অধ্যায়ে যেমন রয়েছে স্বাভাবিক বুদ্ধি ভিত্তিক প্রমাণ তেমনি রয়েছে যুক্তি ভিত্তিক বর্ণিত প্রমাণ।

আশরাফুল খালক [সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি] মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ই যদি তাঁর নিকটতম লোকদের কল্যাণ সাধনে অক্ষম হন যিনি সৃষ্টির মধ্যে দয়া ও করুণার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, তাহলে অন্যের জন্য তা কি করে সম্ভব? অতএব ধ্বংস ঐ ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহর সাথে শরিক করে এবং কোন সৃষ্টিকে তাঁর সমকক্ষ মনে করে। এমতাবস্থায় তার দ্বীনি চেতনা বিলুপ্তির সাথে সাথে বুদ্ধি-বিবেক ও লোপ পায়। আল্লাহ তাআলার অসংখ্য গুণাগুণ, মহত্ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব এবং একক ভাবে "কামালে মুতলাক" [অর্থাৎ নিরঙ্কুশ পূর্ণতা] এর অধিকারী হওয়াটাই, তিনি ছাড়া আর কেউ ইবাদতের হকদার নয়' এর সবচেয়ে বড় দলিল ও প্রমাণ। এমনিভাবে মাখলুকের যাবতীয় [অপূর্ণাঙ্গ] গুণাবলি তার ইলাহ হওয়ার যোগ্যতাকে বাতিল করার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

সংগ্রাম ও সাধনার কথা। এমনকি এ মহৎ কাজের জন্য তাঁকে পাগল পর্যন্ত বলা হয়েছে। কোন মুসলিম যদি আজও সে ধরনের দাওয়াতী কাজ করে তবে সেও উক্ত অবস্থার শিকার হবে।

১৩। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দূরবর্তী এবং নিকটাত্মীয়-স্বজনদের ব্যাপারে বলেছেন لا أغني عنك من الله شيئا [আল্লাহর কাছে জবাব দিহি করার ব্যাপারে আমি তোমার সাহায্য করতে পারব না"] এমনকি তিনি ফাতেমা রা.কেও লক্ষ্য করে বলেছিলেন,

يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيئا

"হে ফাতেমা, আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার ব্যাপারে তোমার কোন উপকার আমি করতে সক্ষম হবো না" ।] তিনি সমস্ত নবীগণের নেতা হওয়া সত্ত্বেও নারীকুল শিরোমণির জন্য কোন উপকার করতে না পারার ঘোষণা দিয়েছেন। আর মানুষ যখন এটা বিশ্বাস করে যে, তিনি সত্য ছাড়া কিছুই বলেন না, তখন সে যদি বর্তমান যুগের কতিপয় খাস ব্যক্তিদের অন্তরে সুপারিশের মাধ্যমে অন্যকে বাঁচানোর ব্যাপারে যে ধ্যান-ধারণার সৃষ্টি হয়েছে তার দিকে দৃষ্টিপাত করে, তাহলে তার কাছে তাওহীদের মর্মকর্থা এবং দ্বীন সম্পর্কে মানুষের অজ্ঞতার কথা সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়বে।

কেননা তার সকল গুণাবলীতেই রয়েছে অপূর্ণাঙ্গতা। প্রতিটি বিষয়েই সে তার রবের মুখাপেক্ষী। তার কোন সিফাতে কামাল [পূর্ণগুণ] নেই। তার রব তাকে যতটুকু গুণের অধিকারী করেন ততটুকু গুনের অধিকারী সে হতে পারে। আর এটাই হচ্ছে তার [মাখলুকের] মধ্যে সামান্যতম উলুহিয়্যাতের অস্তিত্ব না থাকার প্রমাণ।

অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর সৃষ্টিকে চিনতে পেরেছে সে তার এ জ্ঞানকে এক ও লা-শরিক আল্লাহর ইবাদতের কাজে লাগিয়েছে। সাথে সাথে দ্বীনকে তাঁরই জন্য একনিষ্ঠ করেছে এবং তাঁরই প্রশংসা করেছে। স্বীয় জবান, অন্তর এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে তাঁরই গুণ গেয়েছে এবং শুকরিয়া আদায় করেছে। আল্লাহর ভয়, তাঁর প্রতি আশা-আকাংখাকে অবলম্বন করে মাখলুকের সাথে তার সম্পর্ককে ছিন্ন করেছে।

১৬তম অধ্যায় .

১। আল্লাহ তা'আলার বাণী,

حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿سبأ:٢٣﴾

"এমনকি শেষ পর্যন্ত যখন লোকদের অন্তর থেকে ভয়-ভীতি দূর হয়ে যাবে তখন তারা সুপারিশকারীদেরকে জিজ্ঞাসা করবে, তোমাদের রব কি জবাব দিয়েছেন? তারা বলবে, সঠিক জবাবই পাওয়া গিয়েছে আর তিনিই মহান ও শ্রেষ্ঠ। (সাবাঃ ২৩)

২। সহীহ্ বুখারীতে আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

إذا قضى الله الأمر فى السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، (حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ.سبأ:٢٣) فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض ـ وصفه سفيان بكفه، فحرّفها وبدّد بين أصابعه ـ فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها. وربما ألقاها قبل أن يدركه. فيكذب معها مائة كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟ فيصدّق بتلك الكلمة التى سمعت من السماء.

ব্যাখ্যা

আল্লাহর বাণী (حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ

"এমনকি শেষ পর্যন্ত যখন তাদের অন্তর থেকে ভয়-ভীতি দূর হয়ে যায়" তাওহীদ অনিবার্য হওয়া আর শিরক বাতিল হওয়ার এটা বিরাট প্রমাণ। আর এ প্রমাণ পেশ করা হয়েছে কুরআন ও সুন্নাহর এমন সব উক্তি বর্ণনার মাধ্যমে যা আল্লাহ তাআলার মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় বহন করে। পক্ষান্তরে সৃষ্টি বা মাখলুকের শ্রেষ্ঠত্বকে ম্লান করে দেয়। ফিরিস্তাকুল, আকাশ ও ভূমন্ডলের সবকিছুই তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে।

"যখন আল্লাহ তাআলা আকাশে কোন বিষয়ের ফয়সালা করেন, তখন তাঁর কথার সমর্থনে বিনয়াবনত হয়ে ফিরিস্তারা তাদের ডানাগুলো নাড়াতে থাকে। ডানা নাড়ানোর আওয়াজ যেন ঠিক পাথরের উপর শিকলের আওয়াজ। তাদের অবস্থা এভাবেই চলতে থাকে। যখন তাদের অন্তর থেকে এক সময় ভয়-ভীতি দূর হয়ে যায়, তখন তারা বলে, তোমাদের রব তোমাদেরকে কি বলেছেন? তারা জবাবে বলে, আল্লাহ হক কথাই বলেছেন। বস্তুতঃ তিনিই হচ্ছেন মহান ও শ্রেষ্ঠ। এমতাবস্থায় চুরি করে কথা শ্রবণকারীরা উক্ত কথা শুনে ফেলে। আর এসব কথা চোরেরা এ ভাবে পর পর অবস্থান করতে থাকে। এ হাদীসের বর্ণনাকারী সুফইয়ান বিন উয়াইনা চুরি করে কথা শ্রবণকারী [খাত চোর] দের অবস্থা বর্ণ করতে গিয়ে হাতের তালু দ্বারা এর ধরণ বিশ্লেষণ করেছেন এবং হাতের আঙ্গুলগুলো ফাঁক করে তাদের অবস্থা বুঝিয়েছেন। অতঃপর চুপিসারে শ্রবণকারী কথাগুলো শুনে তার নিজের ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেয়। শেষ পর্যন্ত এ কথা একজন যাদুকর কিংবা গণকের ভাষায় দুনিয়াতে প্রকাশ পায়। কোন কোন সময় গণক বা যাদুকরের কাছে উক্ত কথা পৌঁছানোর পূর্বে শ্রবণকারীর উপর আগুনের তীর নিক্ষিপ্ত হয়। আবার কোন কোন সময় আগুণের তীর নিক্ষিপ্ত হওয়ার পূর্বেই সে কথা দুনিয়াতে পৌঁছে যায়। ঐ সত্য কথাটির সাথে শত শত মিথ্যা কথা যোগ করে মিথ্যার বেশাতি করা হয়। অতঃপর শত মিথ্যার সাথে মিশ্রিত সত্য কথাটি যখন বাস্তবে রূপ লাভ করে তখন বলা হয়, অমুক-অমুক দিনে এমন এমন কথা কি

তারা যখন তাঁর কথা শুনে তখন তাদের অন্তর স্থির থাকতে পারে না। সমগ্র সৃষ্টিকুল তাঁর জালালত ও মহত্বের কাছে অবনত। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বের কথা সবাই স্বীকার করে। সবাই তাঁর অনুগত। তাঁর ভয়ে সবাই ভীত। অতএব যে সত্তা এ উচ্চ মর্যাদার অধিকারী তিনিই একমাত্র রব যিনি ছাড়া অন্য কেউ ইবাদত, প্রশংসা, গুণগান, শুকরিয়া, তাজীম এবং উলুহিয়্যাতের হকদার হতে পারে না। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ এসব বিষয়ে সামান্যতম অধিকার লাভ করার যোগ্যতা রাখে না।

তোমাদেরকে বলা হয়নি? এমতাবস্থায় আকাশে শ্রুত কথাটিকেই সত্যায়িত করা হয়।

৩। নাওয়াস বিন সামআন রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر، وتكلم بالوحي أخذت السموات منه رجفة، ـ أو قال: رعدة ـ شديدة خوفا من الله عزوجل، فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا وخروا لله سجّدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قَالَ الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل.

"আল্লাহ তাআলা যখন কোন বিষয়ে ওহি করতে চান এবং ওহির মাধ্যমে কথা বলেন তখন আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের ভয়ে সমস্ত আকাশ মন্ডলী কেঁপে উঠে অথবা বিকট আওয়াজ করে। আকাশবাসী ফিরিস্তাগণ এ নিকট আওয়াজ শুনে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে। এ অবস্থা থেকে সর্ব প্রথম যিনি মাথা উঠান, তিনি হচ্ছেন জিবরাঈল তারপর আল্লাহ তাআলা যা ইচ্ছা করেন ওহির মাধ্যমে জিবরাঈল এর সাথে কথা বলেন। জিবরাঈল এরপর ফিরিস্তাদের পাশ দিয়ে যেতে থাকেন। যতবারই আকাশ অতিক্রম করতে থাকেন ততবারই উক্ত আকাশের

কামালে মুতলাক [অর্থাৎ নিরঙ্কুশ পূর্ণতা], বড়ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বের গুণাবলি এবং নিরঙ্কুশ সৌন্দর্য যেহেতু আল্লাহরই জন্য নির্দিষ্ট সেহেতু অন্য কারো পক্ষে এসব গুণাবলতিতে গুণান্বিত হওয়া সম্ভব নয়।

তাই জাহেরী-বাতেনী সকল ইবাদত একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য। উবুদিয়্যাতের এ অধিকারে কোন দিক থেকেই কেউ তাঁর অংশীদার হতে পারে না।

ফিরিস্তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করে, ‘হে জিবরাঈল, আমাদের রব কি বলেছেন? জিবরাঈল উত্তরে বলেন, ‘আল্লাহ হক কথাই বলেছেন, তিনিই মহান ও শ্রেষ্ঠ’। একথা শুনে তারা সবাই জিবরাঈল যা বলেছেন তাই বলে। তারপর আল্লাহ তাআলা জিবরাঈলকে যেখানে ওহি নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন সে দিকে চলে যান।”

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১। সুরা সাবার ২৩ নং আয়াতের তাফসীর।

২। এ আয়াতে রয়েছে শিরক বাতিলের প্রমাণ। বিশেষ করে সালেহীনের সাথে যে শিরককে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এটিই সে আয়াত, যাকে অন্তর থেকে শিরক বৃক্ষের ‘শিকড় কর্তনকারী’ বলে আখ্যায়িত করা হয়।

৩। قَالَ الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ এ আয়াতের তাফসীর।

৪। হক সম্পর্কে ফিরিস্তাদের জিজ্ঞাসার কারণ।

৫। ‘এমন এমন কথা বলেছেন’ এ কথার মাধ্যমে জিবরাঈল কর্তৃক জবাব প্রদান।

৬। জিসদারত অবস্থা থেকে সর্ব প্রথম জিবরাইল কর্তৃক মাথা উঠানোর উল্লেখ।

৭। সমস্ত আকাশবাসীর উদ্দেশ্যে জিবরাইল কথা বলবেন। কারণ তাঁর কাছেই তারা কথা জিজ্ঞাসা করে।

৮। বেহুশ হয়ে পড়ার বিষয়টি আকাশবাসী সকলের জন্যই প্রযোজ্য।

৯। আল্লাহর কালামের প্রভাবে সমস্ত আকাশ প্রকম্পিত হওয়া।

১০। জিবরাঈল আল্লাহর নির্দেশিত পথে অহি সর্ব শেষ গন্তব্যে পৌঁছান।

১৭তম অধ্যায় :

শাফাআত [সুপারিশ]

১। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ (الأنعام: ٥١)

"তুমি কুরআনের মাধ্যমে সে সব লোকদের ভয় দেখাও, যারা তাদের রবের সামনে উপস্থিত হওয়াকে ভয় করে। সেদিন তাদের অবস্থা এমন হবে যে, আল্লাহ ছাড়া তাদের কোন সাহায্যকারী বন্ধু এবং কোন শাফাআতকারী থাকবে না।" (আনআ'মঃ ৫১)

২। আল্লাহ তাআলা আরো এরশাদ করেন,

قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا (الزمر: ٤٤)

"বলুন, সমস্ত শাফাআত কেবলমাত্র আল্লাহরই ইখতিয়ার ভুক্ত"। (ঝুমার: ৪৪)

৩। আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে এরশাদ করেছেন,

ব্যাখ্যা
শাফাআত [বা সুপারিশ]

লেখক আলোচিত অধ্যায় গুলোকে সুস্পষ্ট করে তোলার জন্য "শাফাআত" অধ্যায়টি আলোচনা করেছেন। কারণ, মুশরিকরা তাদের শিরক করার ব্যাপারে ফিরিস্তা, আম্বিয়া, এবং অলীদের কাছে তাদের দোয়া করার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে। তারা বলে, "আমরা তাদেরকে ডাকি ও তাদের কাছে দোয়া করি, সাথে সাথে এটাও আমরা জানি যে তারা মাখলুক, তারা আল্লাহর অধীন। যেহেতু আল্লাহ তাআলার কাছে তাদের মর্যাদাপূর্ণ স্থানে পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে এবং আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য শাফাআত করার জন্য আমরা তাদেরকে ডাকি, যেমনিভাবে উদ্দেশ্য হাসিল, প্রয়োজন মিটানো এবং কাংখিত লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য মর্যাদাবান ব্যক্তিরা মধ্যস্থতা করে রাজা-বাদশাহদের সান্নিধ্যে পৌঁছে দেয়। তাদের এ যুক্তি একেবারেই বাতিল এবং

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ (البقرة: ٢٥٥)

“তাঁর [আল্লাহর] অনুমতি ব্যতীত তাঁর দরবারে কে শাফাআত [সুপারিশ] করতে পারে?” (বাকারাহ . ২৫৫)

৪। আল্লাহ তাআলা অন্যত্র এরশাদ করেছেন,

وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى ﴿ألنجم:٢٦﴾

“আকাশ মন্ডলে কতইনা ফিরিস্তা রয়েছে। তাদের শাফাআত কোন কাজেই আসবে না, তবে হ্যাঁ, তাদের শাফাআত যদি এমন কোন ব্যক্তির পক্ষে হয় যার আবেদন শুনতে তিনি ইচ্ছা করবেন এবং তা পছন্দ করবেন।” (নাজম : ২৬)

৫। আল্লাহ তাআলা আরো এরশাদ করেন,

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ (سبأ: ٢٢)

“[হে মুহাম্মদ, মুশরিকদেরকে] বলো, তোমরা তোমাদের সেই সব

অন্তঃসারশূণ্য। তাদের উপরোক্ত বক্তব্য রাজাধিরাজ মহান আল্লাহ তাআলা যাকে সবাই ভয় করে, সমস্ত সৃষ্টি জগৎ যার করতলগত, তাঁর সাথে দুনিয়ার পর মুখাপেক্ষী রাজাদের তুলনা করারই নামান্তর। দুনিয়ার রাজা-বাদশাহরা নিজেদের কাজ পরিপূর্ণভাবে সমাধা করার জন্য এবং প্রভাব ও শক্তি খাটানোর জন্য মন্ত্রীবর্গের মুখাপেক্ষী হয়।

মুশরিকদের উপরোক্ত দাবি আল্লাহ তাআলা বাতিল ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ তাআলা যেমনি ভাবে গোটা বিশ্বের মালিক এবং স্বার্বভৌমত্বের অধিকারী, তেমনি ভাবে সব ধরনের শাফাআতও তাঁরই এখতিয়ারভূক্ত বলে ঘোষণা করেছেন। তাঁরই অনুমতি ব্যতীত কেউ তাঁর কাছে শাফাআত করতে পারবে না। যার কথা ও কাজে তিনি সন্তুষ্ট, তাকে ছাড়া আর কাউকে তিনি শাফাআতের অনুমতি দিবেন না। আর তাওহীদ এবং ইখলাস পূর্ণ কাজ ব্যতীত তিনি অন্য কিছুতে সন্তুষ্ট হন না।

মা'বুদদেরকে ডেকে দেখো, যাদেরকে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত নিজেদের মা'বুদ মনে করে নিয়েছো, তারা না আকাশের, না জমিনের এক অনু পরিমাণ জিনিসের মালিক।" (সাবা : ২২)

আবুল আব্বাস ইবনে তাইমিয়াহ রহ. বলেন, মুশরিকরা আল্লাহ ছাড়া যার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, তার সবই আল্লাহ তাআলা অস্বীকার করেছেন।

গাইরুল্লাহর জন্য রাজত্ব অথবা আল্লাহর ক্ষমতায় গাইরুল্লাহর অংশীদারিত্ব অথবা আল্লাহর জন্য কোন গাইরুল্লাহ সাহায্যকারী হওয়ার বিষয়কে তিনি অস্বীকার করেছেন। বাকি থাকলো শাফাআতের বিষয়। এ ব্যাপারে কথা হচ্ছে এই যে, "আল্লাহ তাআলা শাফাআত [সুপারিশ] এর জন্য যাকে অনুমতি দিবেন তার ছাড়া আর কারো শাফাআত কোন কাজে আসবে না।"

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى (الأنبياء: ٢٨)

"তিনি [আল্লাহ] যার ব্যাপারে সন্তুষ্ট হবে, কেবলমাত্র তার পক্ষেই তারা শাফাআত [সুপারিশ] করবে।" (আম্বিয়া : ২৮)

আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন যে, মুশরিকদের ভাগ্যে কোন ধরনের শাফাআতই নেই। সাথে সাথে এটাও বলে দিয়েছেন যে, তাঁর অনুমতি সাপেক্ষে যে শাফাআত কুরআন ও সুন্নায় স্বীকৃত রয়েছে, তা তাঁরই পক্ষ থেকে রহমত স্বরূপ মুখলিস বান্দাদের জন্যই বিশেষভাবে নির্ধারিত। এর দ্বারা তিনি তাঁর করুণা হিসেবে শাফাআতকারীকে সম্মাণিত করবেন। আর সুপারিশকৃত ব্যক্তির প্রতি ক্ষমতা প্রদর্শন করবেন। প্রকৃত পক্ষে এরজন্য তিনিই হচ্ছে একমাত্র প্রশংসিত সত্তা। তিনিই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শাফাআতের জন্য অনুমতি প্রদান করবেন এবং 'মাকামে মাহমুদ প্রদান করে ভাগ্যবান করবেন। এটাই হচ্ছে শাফাআতের ব্যাপারে বিস্তারিত কথা, যার প্রমাণাদি কুরআন ও সুন্নায় পাওয়া যায়। এখানে গ্রন্থকার শাইখ তাকীউদ্দীন (রহ.) এর কথা উল্লেখ করেছেন, যা আলোচিত বিষয়টি অনুধাবন করার জন্য যথেষ্ট।

এ অধ্যায়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে, কুরআন ও সুন্নাহর এমন দলিল প্রমাণাদি উল্লেখ করা,

মুশরিকরা যে শাফাআতের আশা করে, কেয়ামতের দিন তার কোন অস্তিত্বই থাকবে না। কুরআনে কারীমও এধরনের শাফাআতকে অস্বীকার করেছে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানিয়েছেন,

أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده - لا يبدأ بالشفاعة أولا - ثم يقال له: ارفع رأسك، وقل يسمع، وسل تعط، واشفع تشفّع.

"তিনি অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবেন। অতঃপর তাঁর রবের উদ্দেশ্যে তিনি সেজদায় লুটিয়ে পড়বেন এবং আল্লাহর প্রশংসায় মগ্ন হবেন। প্রথমেই তিনি শাফাআত বা সুপারিশ করা শুরু করবেন না। অতঃপর তাঁকে বলা হবে, "হে মুহাম্মদ, তোমার মাথা উঠাও। তুমি তোমার কথা বলতে থাকো, তোমার কথা শ্রবন করা হবে। তুমি চাইতে থাকো, তোমাকে দেয়া হবে। তুমি সুপারিশ করতে থাকো, তোমার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।"

আবু হুরাইয়ারা রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার শাফাআত লাভে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি কে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বললেন, 'যে ব্যক্তি খালেস দিলে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে।"

এ হাদিসে উল্লেখিত শাফাআত [বা সুপারিশ] আল্লাহ তাআলার অনুমতি প্রাপ্ত এবং নেককার মুখলিস বান্দাদের জন্য নির্দিষ্ট। আল্লাহর সাথে যে ব্যক্তি কাউকে শরিক করবে তার ভাগ্যে এ শাফাআত জুটবে না।

যা দ্বারা মুশরিকদের সাথে তাদের যাবতীয় উপাস্য গুলোর সম্পর্ক ও ওসীলা বাতিল প্রমাণিত হয়। আল্লাহর রাজত্ব ও কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে তাদের কোন অধিকার নেই। এ অধিকার স্বতন্ত্রভাবে ও নেই, সামষ্টিকভাবেও নেই, সাহায্যকারী হিসেবেও নেই; এমনকি তার ক্ষমতা প্রকাশকারী হিসেবেও নেই। শাফাআতের ব্যাপারেও তাদের কিছুই করার নেই। এর সব কিছুই একমাত্র আল্লাহর মালিকানা ও কর্তৃত্বাধীন। অতএব এটাই প্রমাণিত ও সাব্যস্ত হলো যে, একমাত্র আল্লাহই মা'বুদ হওয়ার যোগ্য।

এ আলোচনার মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তাআলা মুখলিস বান্দাগণের প্রতি অনুগ্রহ করবেন এবং শাফাআতের জন্য অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তিদের প্রার্থনায় তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, শাফাআতকারীকে সম্মানিত করা এবং মাকামে মাহমূদ অর্থাৎ প্রশংসিত স্থান দান করা।

কুরআনে কারীম যে শাফাআতকে অস্বীকার করেছে, তাতে শিরক বিদ্যমান রয়েছে। এ জন্যই আল্লাহ তাআলার অনুমতি সাপেক্ষে শাফাআত এর স্বীকৃতির কথা কুরআনে বিভিন্ন জায়গায় এসেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করেছেন যে, শাফাআত একমাত্র তাওহীদবাদী নিষ্ঠাবানদের জন্যই নির্দিষ্ট।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয় গুলো জানা যায়ঃ

১। উল্লেখিত আয়াতসমূহের তাফসীর।

২। যে শাফাআতকে অস্বীকার করা হয়েছে তার প্রকৃতি।

৩। স্বীকৃত শাফাআতের গুণ ও বৈশিষ্ট্য।

৪। সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ শাফাআতের উল্লেখ। আর তা হচ্ছে “মাকামে মাহমুদ”

৫। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম [শাফাআতের পূর্বে] যা করবেন তার বর্ণনা। অর্থাৎ তিনি প্রথমেই শাফাআতের কথা বলবেন না, বরং তিনি সেজদায় পড়ে যাবেন। তাঁকে অনুমতি প্রদান করা হলেই তিনি শাফাআত করতে পারবেন।

৬। শাফাআতের মাধ্যমে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তির উল্লেখ।

৭। আল্লাহর সাথে শিরককারীর জন্য কোন শাফাআত গৃহীত হবে না।

১৮তম অধ্যায় :

একমাত্র আল্লাহই হেদায়াতের মালিক

১। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ (ألقصص: ٥٦)

“আপনি যাকে পছন্দ করেন, তাকে আপনি হেদায়াত করতে পারবেন না”। (কাসাস: ৫৭)

২। সহীহ বুখারীতের ইবনুল মোসাইয়্যাব তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যখন আবু তালিবের মৃত্যু ঘনিয়ে এলো, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কাছে আসলেন। আবদুল্লাহ বিন আবি উমাইয়্যাহ এবং আবু জাহল আবু তালিবের পাশেই উপস্থিত ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, ‘চাচা, আপনি ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলুন। এ কালিমা দ্বারা আমি আল্লাহর কাছে আপনার জন্য কথা বলবো, তখন তারা দু’জন [আবদুল্লাহ ও আবু জাহল] তাকে বলল, ‘তুমি আবদুল মোত্তালিবের ধর্ম ত্যাগ করবে?’ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কলেমা পড়ার কথা আরেকবার বললেন। তারা দু’জন আবু

ব্যাখ্যা

আল্লাহর বাণী- إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ “আপনি যাকে পছন্দ করেন তাকে হেদায়াত করতে পারবেন না”

এ অধ্যায়টি পূর্বোক্ত অধ্যায়ের সদৃশ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামর এক বাক্যে সকল সৃষ্টির সেরা। সম্মান ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের ক্ষেত্রে এবং ‘ওসীলা’র দিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী। এতদসত্ত্বেও তিনি যাকে চান তাকে হেদায়াত দান করতে সক্ষম নন। হেদায়াতের পূর্ণ মালিকানা একমাত্র আল্লাহ তাআলার হাতে নিবদ্ধ। গোটা সৃষ্টি জগৎকে সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে তিনি যেমনিভাবে একক, ঠিক তেমনি ভাবে অন্তরের হেদায়াতের ক্ষেত্রেও একক ক্ষমতার অধিকারী। অতএব, এটা সুস্পষ্ট যে, তিনিই হচ্ছে “ইলাহে হক” [সত্য ইলাহ] তবে আল্লাহ তাআলার বাণী-

তালিবের উদ্দেশ্যে পূর্বোক্ত কথা আরেকবার বলল। আবু তালিবের সর্বশেষ অবস্থা ছিল এই যে, সে আবদুল মোত্তালিবের ধর্মের উপরই অটল ছিল এবং 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলতে অস্বীকার করেছিলো। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আপনার ব্যাপারে যতক্ষন পর্যন্ত আমাকে নিষেধ করা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনার জন্য মাগফিরাত কামনা করতে থাকবো।' এরপর আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাজিল করেন,

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ (التوبة :١١٣)

"মুশরিকদের জন্য মাগফিরাত কামনা করা নবী এবং ইমানদার ব্যক্তিদের জন্য শোভনীয় কাজ নয়।" (তাওবা: ১১৩)

আল্লাহ তাআলা আবু তালিবের ব্যাপারে এ আয়াত নাজিল করেন,

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ (ألقصص: ٥٦)

"আপনি যাকে পছন্দ করেন, তাকে হেদায়াত করতে পারবেন না। কিন্তু আল্লাহ যাকে চান তাকে হেদায়াত করেন।" (আল-কাসাস: ৫৬)

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয় গুলো জানা যায়ঃ

১। إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ এ আয়াতের তাফসীর।

২। সুরা তাওবার ১১৩ নং আয়াত অর্থাৎ

وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٢﴾ (الشورى)

"আপনি অবশ্যই সরল সঠিক পথের দিকে মানুষকে হেদায়াত দান করেন।" এ আয়াতে হেদায়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষের কাছে হেদায়াতের বর্ণনা দেয়া। অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হচ্ছেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহির মোবাল্লিগ [প্রচারক]; যা দ্বারা সৃষ্টি জগৎ হেদায়াত লাভ করতে পারে। [তিনি অন্তরের হেদায়াত দানের মালিক নন]

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ

এর তাফসীর।

৩। قل لا إله إلا الله অর্থাৎ “আপনি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলুন” রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথার ব্যাখ্যা। এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা এক শ্রেণীর তথা কথিত জ্ঞানের দাবীদারদের বিপরীত।

৪। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুপথ যাত্রী আবু তালিবের ঘরে প্রবেশ করে যখন বললেন, চাচা, আপনি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলুন, এ কথার দ্বারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কি উদ্দেশ্য ছিল তা আবু জাহল এবং তার সঙ্গীরা বুঝতে পেরেছিল। আল্লাহ আবু জাহেলের ভাগ্য মন্দ করলেন, সে নিজেও পথভ্রষ্ট থেকে গেলো, অপরকেও গোমরাহীর পরামর্শ দিলো। আল্লাহর চেয়ে ইসলামের মূলনীতি সম্পর্কে আর কে বেশি জানে?

৫। আপন চাচার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তীব্র আকাংখ্যা ও প্রাণপন চেষ্টা।

৬। যারা আবদুল মোত্তালিব এবং তার পূর্বসূরীদেরকে মুসলিম হওয়ার দাবি করে, তাদের দাবি খন্ডন।

৭। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় চাচা আবু তালেবের জন্য মাগফিরাত চাইলেও তার গুনাহ মাফ হয়নি, বরং তার মাগফিরাত চাওয়ার ব্যাপারে নিষেধজ্ঞা এসেছে।

৮। মানুষের উপর খারাপ লোকদের ক্ষতিকর প্রভাব।

৯। পূর্ব পুরুষ এবং পীর-বুজুর্গের প্রতি অন্ধ ভক্তির কুফল।

১০। আবু জাহল কর্তৃক পূর্ব পুরুষদের প্রতি অন্ধ ভক্তির যুক্তি প্রদর্শনের কারণে বাতিল পন্থীর অন্তরে সংশয়।

১১। সর্বশেষ আমলের শুভাশুভ পরিণতির প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কেননা আবু তালিব যদি শেষ মুহূর্তেও কালিমা পড়তো, তাহলে তার বিরাট উপকার হতো।

১২। গোমরাহীতে নিমজ্জিত লোকদের অন্তরে এ সংশয়ের মধ্যে বিরাট চিন্ত ার বিষয় নিহিত আছে। কেননা উক্ত ঘটনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈমান আনার কথা বারবার বলার পরও তারা [কাফির মুশরিকরা] তাদের পূর্ব পুরুষদের প্রতি অন্ধ অনুকরণ ও ভাল বাসাকেই যুক্তি হিসেবে পেশ করেছে। তাদের অন্তরে এর [গোমরাহীর তথা কথিত] সুস্পষ্টতা ও [তথা কথিত] শ্রেষ্ঠত্ব থাকার কারণেই অন্ধ অনুকরণকে যথেষ্ট বলে মনে করেছে।

১৯তম অধ্যায় :
নেককার পীর-বুজুর্গ লোকদেও ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘন করা আদম সন্তানের কাফের ও বেদ্বীন হওয়ার অন্যতম কারণ

১। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ. (ألنساء: ١٧١)

"হে আহলে কিতাব, তোমরা তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘন করো না।" (নিসা . ১৭১)

২। সহীহ হাদিসে ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআলার বাণী :

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿نوح: ٢٣﴾

"কাফেররা বলল, 'তোমরা নিজেদের মাবূদগুলোকে পরিত্যাগ

ব্যাখ্যা

নেককার, পীর, বুজুর্গ লোকদের ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘন করা আদম সন্তানের কাফের ও বেদ্বীন হওয়ার অন্যতম কারণ غلو (গুলু) হচ্ছে, সীমা লঙ্ঘন করা। অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহর সাথে "খাস" কোন হকের মধ্যে কোন নেককার ব্যক্তি বা পীর বুজুর্গকে হকদার বানানো। কেননা আল্লাহর হকের মধ্যে কোন অংশীদারই শরিক হতে পারে না। আল্লাহ তাআলা সর্বদিক থেকেই নিরঙ্কুশ কামালিয়াত বা পূর্ণতার অধিকারী। তিনি নিরঙ্কুশভাবে সমৃদ্ধশালী এবং কার্য পরিচালনার একচ্ছত্র মালিক। তিনি ব্যতীত আর কেউ উবুদিয়্যাত এবং উলুহিয়্যাতের অধিকারী হতে পারে না। তাই কোন ব্যক্তি যদি কোন মাখলুককে উপরোক্ত বিষয়ে আল্লাহর সামান্যতম অংশীদার মনে করে, তাহলে সে রবের সাথে মাখলুককে সমান করে ফেললো। আর এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় শিরক।

করো না। বিশেষ করে ‘ওয়াদ’, ‘সুআ’, ‘ইয়াগুছ’ ‘ইয়াউক’ এবং ‘নসর’ কে কখনো পরিত্যাগ করো না। (নূহ : ২৩)- এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, ‘এগুলো হচ্ছে নূহ আ. এর কওমের কতিপয় নেককার ও বুজুর্গ ব্যক্তিদের নাম, তারা যখন মৃত্যু বরণ করল, তখন শয়তান তাদের কওমকে কুমন্ত্রণা দিয়ে বলল, ‘যেসব জায়গায় তাদের মজলিস বসতো সে সব জায়গাগুলোতে তাদের [বুজুর্গ ব্যক্তিদের] মুর্তি স্থাপন করো এবং তাদের সম্মানার্থে তাদের নামেই মুর্তিগুলোর নামকরণ করো। তখন তারা তাই করল। তাদের জীবদ্দশায় মুর্তির পূজা করা হয়নি ঠিকই; কিন্তু মূর্তি স্থাপন কারীরা যখন মৃত্যু বরণ করল এবং মুর্তি স্থাপনের ইতিকথা ভুলে গেলো, তখনই মুর্তিগুলোর ইবাদত শুরু হলো।

ইবনুল কাইয়্যিম রহ.) বলেন, একাধিক আলেম ব্যক্তি বলেছেন, ‘যখন নেককার ও বুজুর্গ ব্যক্তিগণ মৃত্যু বরণ করলেন, তখন তাঁদের কওমের লোকেরা তাঁদের কবরের পাশে ধ্যান-মগ্ন হয়ে বসে থাকতো। এরপর তারা তাঁদের প্রতিকৃতি তৈরী করল। এভাবে বহুদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর তারা তাঁদের ইবাদতে লেগে গেলো।

৩। ওমর রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

---

হক তিন প্রকার। এক : আল্লাহ তাআলার খাস হক। এ হকের মধ্যে কোন অংশীদারই শরিক হতে পারে না। আর তা হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার উলুহিয়্যাত এবং উবুদিয়্যাত। এক্ষেত্রে তিনি একক, তাঁর কোন শরিক নেই। ভয়-ভীতি এবং আশা-আকাংখার দিক থেকে ‘রুগবত’ ও ‘ইনাবত’ একমাত্র তাঁরই জন্য নির্ধারিত।

দুই: নবীগণের খাস হক। আর তা হচ্ছে, তাঁদের প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মান এবং তাঁদের সাথে সংশ্লিষ্ট অধিকার সমূহ আদায় করা।

তিন : যৌথ অধিকার। আর তা হচ্ছে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনা। আল্লাহ ও রাসূলগণের আনুগত্য করা। আল্লাহর প্রতি মুহাব্বত ও তাঁর রাসূল গণের প্রতি মহাব্বত আল্লাহর হকের অধীন।

আহলে হক বা হক পন্থীগণ উপরোক্ত তিন প্রকার অধিকারের মধ্যে নিহিত

لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبده، فقولوا: عبد الله ورسوله

(أخرجاه)

"তোমরা আমার মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করো না যেমনিভাবে প্রশংসা করেছিলো নাসারারা মরিয়ম তনয় ঈসা আ. এর। আমি আল্লাহ তাআলার বান্দা মাত্র। তাই তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা এবং তাঁরই রাসূল বলবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

৪। ওমর রা. আরো বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو

"তোমরা বাড়া-বাড়ি ও সীমা অতিক্রমের ব্যাপারে সাবধান থাকো। কেননা, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো (দ্বীনের ব্যাপারে) সীমা লঙ্ঘন করার ফলে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।"

৫। মুসলিম শরীফে ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত এক হাদিসে, রাসূল এরশাদ করেছেন,

هلك المتنطعون. قالها ثلاثا

"দ্বীনের ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘন কারীরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।" এ কথা তিনি তিনবার বলেছেন।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। যে ব্যক্তি এ অধ্যায়টি সহ পরবর্তী দু'টি অধ্যায় উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে, ইসলাম সম্পর্কে মানুষ কতটুকু অজ্ঞ, তার কাছে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। সাথে সাথে আল্লাহ তাআলার কুদরত এবং মানব অন্তরের আশ্চর্য জনক পরিবর্তন ক্ষমতা লক্ষ্য করতে পারবে।

২। পৃথিবীতে সংঘটিত প্রথম শিরকের সূচনা, যা নেককার ও বুজুর্গ ব্যক্তিদের প্রতি সংশয় ও সন্দেহ থেকে উৎপত্তি হয়েছে।

পার্থক্য সম্পর্কে অবগত আছেন। তাই তাঁরা আল্লাহর উবুদিয়াতের শিক্ষাকে বাস্তবায়ন করেন এবং তাঁরই উদ্দেশ্যে দ্বীনকে একনিষ্ঠ করেন। এর সাথে সাথে আম্বিয়া ও আওলিয়ায়ে কেরামের হক, তাঁদের মান ও মর্যাদা অনুযায়ী আদায় করেন।

৩। সর্বপ্রথম যে জিনিসের মাধ্যমে নবীগণের দ্বীনে পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল এবং এর কারণ সম্পর্কে জ্ঞান লাভের সাথে সাথে একথাও জেনে নেয়া যে, আল্লাহ্ তাআলাই তাদেরকে [দ্বীন কায়েমের জন্য] পাঠিয়েছেন।

৪। 'শরীয়ত' এবং ফিতরাত' 'বিদআতকে' প্রত্যাখ্যান করা সত্তেও বেদআত গ্রহণ করার কারণ সম্পর্কে অবগতি লাভ।

৫। উপরোক্ত সকল গোমরাহীর কারণ হচ্ছে, হকের সাথে বাতেলের সংমিশ্রন, এর প্রথমটি হচ্ছে, সালেহীন বা নেককার ও বুজুর্গ লোকদের প্রতি [মাত্রাতিরিক্ত] ভালোবাসা।

আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, কতিপয় জ্ঞানী ধার্মিক ব্যক্তিদের এমন কিছু আচরণ, যার উদ্দেশ্য ছিল মহৎ, কিন্তু পরবর্তীতে কিছু লোক উক্ত কাজের উদ্দেশ্য ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে 'বেদআত ও শিরকে লিপ্ত হয়।

৬। সূরা নূহের ২৩ নং আয়াতের তাফসীর।

৭। মানুষের অন্তরে হকের প্রতি ঝোক প্রবণতার পরিমাণ কম। কিন্তু বাতিলের প্রতি ঝোক প্রবণতার পরিমাণ অপক্ষোকৃত বেশি।

৮। কোন কোন সালাফে-সালেহীন থেকে বর্ণিত আছে যে, বেদআত হচ্ছে কুফরির কারণ। তাছাড়া ইবলিস অন্যান্য পাপের চেয়ে এটাকেই বেশি পছন্দ করে। কারণ পাপ থেকে তওবা করা সহজ হলেও বেদআত থেকে তওবা করা সহজ নয়। [কারণ বিদয়াত তো সওয়াবের কাজ মনে করে করা হয় বলে পাপের অনুভূতি থাকে না, তাই তাওবারও প্রয়োজন অনুভুত হয় না]

৯। আমলকারীর নিয়ত যত মহৎই হোক না কেন, বিদআতের পরিণতি কি, তা শয়তান ভাল করেই জানে। এ জন্যই শয়তান আমল কারীকে বিদআতের দিকে নিয়ে যায়।

১০। "দ্বীনের ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘন করা না করা" এ নীতি সম্পর্কে এবং সীমা লংঘনের পরিণতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।

১১। নেক কাজের নিয়তে কবরের পাশে ধ্যান-মগ্ন হওয়ার ক্ষতি সম্পর্কে অবগত হওয়া।

১২। মূর্তি বানানো বা স্থাপনের নিষেধাজ্ঞা এবং তা অপসারণের কল্যাণ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।

১৩। উপরোল্লিখিত কিসসার অপরিসীম গুরুত্ব অনুধাবন করা এবং এর অতীব প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানা।

১৪। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো এই যে, বেদআত পন্থীরা তফসীর হাদিসের কিতাব গুলোতে শিরক বিদআতের কথাগুলো পড়েছে এবং আল্লাহর কালামের অর্থও তারা জানতো, শিরক ও বিদআতের ফলে আল্লাহ তাআলা এবং তাদের অন্তরের মাঝখানে বিরাট প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি হয়েছিল, তারপরও তারা বিশ্বাস করতো যে, নূহ আ. এর কওমের লোকদের কাজই ছিল শ্রেষ্ঠ ইবাদত। তারা আরো বিশ্বাস করতো যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা নিষেধ করেছিলেন সেটাই ছিল এমন কুফরি যার ফলে জান-মাল পর্যন্ত বৈধ হয়ে যায়। [অর্থাৎ হত্যা করে ধন-সম্পদ দখল করা যায়]।

১৫। এটা সুস্পষ্ট যে, তারা শিরক ও বেদআত মিশ্রিত কাজ দ্বারা সুপারিশ ছাড়া আর কিছুই চায়নি।

১৬। তাদের ধারণা এটাই ছিল যে, যেসব পন্ডিত ব্যক্তিরা ছবি মুর্তি তৈরী করেছিল তারাও শাফাআত লাভের আশা পোষণ করতো।

১৭। "তোমরা আমার মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করো না যেমনিভাবে খৃষ্টানরা মরিয়ম তনয়কে করতো।" রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এ মহান বাণীর দাওয়াত তিনি পূর্ণাঙ্গ ভাবে পৌঁছিয়েছেন।

১৮। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে উপদেশ দিয়েছেন যে দ্বীনের ব্যাপারে সীমা লংঘনকারীদের ধ্বংস অনিবার্য।

১৯। এ কথা সুস্পষ্ট যে, ইলমে দ্বীন ভুলে না যাওয়া পর্যন্ত মুর্তি পুজার সূচনা হয়নি। এর দ্বারা ইলমে দ্বীন থাকার মর্যাদা আর না থাকার পরিণতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ।

২০। ইলমে দ্বীন উঠে যাওয়ার কারণ হচ্ছে আলেমগণের মৃত্যু।

২০তম অধ্যায় :
নেককার বুজুর্গ ব্যক্তির কবরের পাশে ইবাদত করার ব্যাপারে যেখানে কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, সেখানে ঐ নেককার ব্যক্তির উদ্দেশ্যে ইবাদত কিভাবে জায়েয হতে পারে?

১। আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, উম্মে সালামা রা. হাবশায় যে গীর্জা দেখতে পেয়েছিলেন এবং তাতে যে ছবি প্রত্যক্ষ করেছিলেন তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে উল্লেখ করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح - أو العبد الصالح - بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله.

"তাদের মধ্যে কোন নেককার বুজুর্গ ব্যক্তির মৃত্যু বরণ করার পর তার কবরের উপর তারা মসজিদ তৈরী করতো এবং মসজিদে ঐ ছবিগুলো অংকন করতো। [অর্থাৎ তুমি সে জাতীয় ছবিগুলোই দেখেছ]। তারা হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট।" তারা দুটি ফেতনাকে একত্রিত করেছে। একটি হচ্ছে কবর পুজার ফেতনা। অপরটি হচ্ছে মূর্তি পূজার ফেতনা। (বুখারী)

২। সহীত বুখারী ও মুসলিমে আয়েশা রা. থেকে আরো একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মৃত্যু

ব্যাখ্যা

কোন নেককার বুজুর্গ লোকের কবরের পাশে ইবাদত করার ব্যাপারে যেখানে এত কঠোরতা সেখানে নেককার ব্যক্তির ইবাদত করা কিভাবে জায়েয হতে পারে? [অর্থাৎ কোনক্রমেই জায়েয হবে না।]

নেককার ও বুজুর্গ ব্যক্তিদের কবরের ব্যাপারে দ্বীনের সীমা অতিক্রম ও বাড়া-বাড়ি, কবরকে মূর্তিতে পরিণত করে এবং গাইরুল্লাহর ইবাদতের দিকে মানুষকে প্রলুব্ধ করে। এটাই হচ্ছে এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়।

ঘনিয়ে আসলো, তখন তিনি নিজের মুখমন্ডলকে স্বীয় চাদর দিয়ে ঢেকে ফেলতে লাগলেন। আবার অস্বস্তিবোধ করলে তা চেহারা থেকে সরিয়ে ফেলতেন। এমন অবস্থায়ই তিনি বললেন,

لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد.

"ইয়াহুদী নাসারাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত। তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ বানিয়েছে" তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সতর্ক করে দিয়েছেন। কবরকে ইবাদত খানায় পরিণত করার আশঙ্কা না থাকলে তাঁর কবরকে উন্মুক্ত রাখা হতো। (বুখারী ও মুসলিম)

৩। জুনদুব বিন আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর ইন্তেকালের পূর্বে এ কথা বলতে শুনেছি, "তোমাদের মধ্য থেকে কাউকে আমার খলীল [বন্ধু] হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে আমি আল্লাহর কাছে মুক্ত। কেননা আল্লাহ তাআলা আমাকে খলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। যেমনিভাবে তিনি ইবরাহীম আ.কে খলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আর আমি যদি আমার উম্মত হতে কাউকে খলীল হিসেবে গ্রহণ করতাম তাহলে অবশ্যই আবু বকরকে খলীল হিসেবে গ্রহণ করতাম।"

ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياءهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك.

"সাবধান, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে। সাবধান, তোমরা কবরকে মসজিদে পরিণত করো না। আমি তোমাদেরকে এ কাজ করতে নিষেধ করছি।"

লেখক অধ্যায় দুটিতে যা উল্লেখ করেছেন তা আরো পরিস্কার হবে নেককার, বুজুর্গ লোকদের কবরের পাশে যে সর্ব কার্যকলাপ হয় তার বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে। কবরের পাশে যেসব কার্যকলাপ হয় তা দু'রকমের। একটি শরীয়ত সম্মত [বৈধ], অপরটি নিষিদ্ধ [অবৈধ]

কবরের ব্যাপারে বৈধ কাজ হচ্ছে শরীয়ত সম্মত উপায়ে কবর যিয়ারত করা, তবে কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা যাবে না। সুন্নতকে অনুসরণ করে একজন মুসলিম কবর যিয়ারত করবে। সাধারণভাবে সমস্ত কবরবাসীর জন্য এবং খাসভাবে তার

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তেও এ কাজ [কবরকে মসজিদে পরিণত] করতে নিষেধ করেছেন। আর এ কাজ যারা করেছে (তাঁর কথার ধরন দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে) তাদেরকে তিনি লানত করেছেন। কবরের পাশে মসজিদ নির্মিত না হলেও সেখানে নামায পড়া রাসূল এর এ লানতের অন্তর্ভুক্ত।

خشي أن يتخذ مسجدا.

এ বাণীর দ্বারা এ মর্মার্থই বুঝানো হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম নবীর কবরের পাশে মসজিদ বানানোর মত লোক ছিলেন না। যে স্থানকে নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হয়েছে সে স্থানকেই মসজিদ হিসেবে গণ্য করা হয়। বরং এমন প্রতিটি স্থানের নামই মসজিদ যেখানে নামায আদায় হয়। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.

"পৃথিবার সব স্থানকেই আমার জন্য মসজিদ বানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং পবিত্র করে দেয়া হয়েছে।" (মুসলিম)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে 'মারফু' হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, "জীবন্ত অবস্থায় যাদের উপর দিয়ে কিয়ামত সংঘটিত হবে, আর যারা কবরকে মসজিদে পরিণত করে তারাই হচ্ছে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট। (মুসনাদে আহমাদ, আবু হাতিম এ হাদীসটি তাঁর সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছে।)

আত্মীয় স্বজন, পরিচিত ব্যক্তিবর্গের জন্য সে দোয়া করবে। এর ফলে সে ক্ষমা মাগফিরাত এবং আল্লাহর রহমত কামনার মাধ্যমে কবরবাসীদের প্রতি এহসান করবে। আবার সুন্নতের অনুসরণ, আখেরাতের স্মরণ এবং কবর যিয়ারত দ্বারা উপদেশ গ্রহণের মাধ্যমে সে নিজের প্রতিও এহসান করবে।

কবর সংক্রান্ত নিষিদ্ধ কাজও দু'ধরনের .

একটি হচ্ছে হারাম কাজ যা শিরকের অসিলা বা মাধ্যম হিসেবে গণ্য যেমন, কবর স্পর্শ করা এবং কবরবাসীকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের অসিলা হিসেবে গণ্য করা। কবরের পাশে নামাজ পড়া, বাতি জ্বালানো এবং কবরের উপরে সৌধ নির্মাণ করা।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলো জানা যায় :

১। যে ব্যক্তি নেককার ও বুজুর্গ লোকের কবরের পাশে আল্লাহর ইবাদত করার জন্য মসজিদ বানায় নিয়ত সহীহ হওয়া সত্বেও তার ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উক্তি।

২। মূর্তির ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ এবং কঠোরতা অবলম্বন।

৩। কবরকে মসজিদ না বানানোর বিষয়টি তিনি প্রথমে কিভাবে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর মৃত্যুর পাঁচদিন পূর্বে তিনি তা বারবার বলেছেন। তারপর কবর পূজা সম্পর্কিত কথাকে তিনি যথেষ্ট মনে করেননি। [যার ফলে মৃত্যুর পূর্বেও এ ব্যাপারে উম্মতকে সাবধান করে দিয়েছেন] অতএব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক এ ব্যাপারে অধিক গুরুত্ব প্রদানের মধ্যেই শিক্ষা ও উপদেশ নিহিত রয়েছে।

৪। নিজ কবরের অস্তিত্ব লাভের পূর্বেই তাঁর কবরের পাশে এসব কাজ অর্থাৎ কবর পূজাকে নিষেধ করেছেন।

৫। নবীদের কবর পূজা করা বা কবরকে ইবাদত খানায় পরিণত করা ইহুদি নাসারাদের রীতি-নীতি।

৬। এ জাতীয় কাজ যারা করে তাদের উপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অভিসম্পাত।

কবর এবং কবরবাসীর ব্যাপারে শরিয়তের সীমা লঙ্ঘন করা যদিও তা ইবাদতের পর্যায়ে উপনীত না হয়।

দ্বিতীয় কাজটি হচ্ছে শিরকে আকবার [বা বড় ধরনের শিরক]। যেমন, কবরবাসীর কাছে দোয়া করা। সাহায্য চাওয়া দুনিয়া ও আখেরাতের প্রয়োজন মিটানোর জন্য আবেদন করা। এ সব কাজ বড় ধরনের শিরক। মূর্তি পূজারীরা তাদের মূর্তির সাথে হুবহু এ ধরনের আচরণই করে থাকে। কোন ব্যক্তি যদি এ আক্বীদা পোষণ করে যে, উদ্দেশ্য হাসিলের ক্ষেত্রে কবরবাসীরা স্বতন্ত্র ক্ষমতার অধিকারী অথবা আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য তারা হচ্ছে মধ্যস্থতাকারী মাত্র, তাহলে পূর্বোক্ত আচরণ আর এ আক্বীদার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কেননা মুশরিকরাও একথাই বলে।

৭। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবরের ব্যাপারে আমাদেরকে সাবধান করে দেয়া।

৮। তাঁর কবরকে উন্মুক্ত না রাখার কারণ এ হাদিসে সুস্পষ্ট।

৯। কবরকে মসজিদ বানানোর মর্মার্থ।

১০। যারা কবরকে মসজিদে পরিণত করে এবং যাদের উপর দিয়ে কিয়ামত সংঘটিত হবে এ দু'ধরনের লোকের কথা একই সাথে উল্লেখ করেছেন। অতঃপর একজন মানুষ কোন পথ অবলম্বনে শিরকের দিকে ধাবিত হয় এবং এর পরিণতি কি সেটাও উল্লেখ করেছেন।

১১। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ইন্তেকালের পাঁচ দিন পূর্বে স্বীয় খুতবায় বিদআতী লোকদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট দু'টি দলের জবাব দিয়েছেন। কিছু সংখ্যক জ্ঞানী ব্যক্তিরা এ বিদআতীদেরকে ৭২ দলের বহির্ভূত বলে মনে করেন। এসব বিদআতীরা হচ্ছে "রাফেজী" ও জাহমিয়্যা"। এ রাফেজী দলের কারণেই শিরক এবং কবর পূজা শুরু হয়েছে। সর্বপ্রথম কবরের উপর তারাই মসজিদ নির্মাণ করেছে।

১২। মৃত্যু যন্ত্রণার মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে পরীক্ষা করা হয়েছে তা জানা যায়।

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى ﴿٣﴾(الزمر)

তারা (মূর্তিরা) আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে, এজন্যই আমরা তাদের ইবাদত করি। (ঝুমার: ৩)

وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللهِ ﴿١٨﴾(يونس)

তারা বলে, এরা (মূর্তিরা) আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশকারী। (ইউনুছ: ১৮)

যে ব্যক্তি এ কথা দাবি করে যে, "কবরবাসীর কাছে দোয়াকারীকে ততক্ষণ পর্যন্ত কাফির বলা যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে এ আক্বীদা পোষণ না করে যে, কবরবাসীরা কল্যাণ সাধন ও অনিষ্টতা দূর করার ব্যাপারে স্বতন্ত্র ক্ষমতার অধিকারী। আর যে ব্যক্তি

১৩। ‘খুল্লাত’ বা বন্ধুত্বের মর্যাদা ও সম্মান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেয়া হয়েছে।

১৪। খুল্লাতই হচ্ছে মুহাব্বত ও ভালোবাসার সর্বোচ্চ স্থান।

১৫। আবু বকর ছিদ্দিক রা. সর্ব শ্রেষ্ঠ সাহাবী হওয়ার ঘোষণা।

১৬। তাঁর [আবুবকর রা.] খিলাফতের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান।

বিশ্বাস করে যে আল্লাহই হচ্ছেন মূল কার্য সম্পাদনকারী, তবে কবরবাসী বুজুর্গ ব্যক্তি হচ্ছে আল্লাহ ও দোয়াকারী এবং সাহায্য প্রার্থনাকারীর মাঝখানে একটা মাধ্যম মাত্র, তাকে কাফের বলা যাবে, সে মূলতঃ গাইরুল্লাহকে ডাকার ব্যাপারে কুরআন, সুন্নাহ এবং এজমায়ে উম্মতের রায়কে প্রত্যাখ্যান করে। কেননা উপরোক্ত উভয় অবস্থায়ই সে মুশরিক, কাফির। চাই সে কবরবাসীকে স্বতন্ত্র ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে বিশ্বাস করুক অথবা মধ্যস্থতাকারী হিসেবেই বিশ্বাস করুক।

দ্বীন ইসলামে এর ব্যাপারে উপরোক্ত কথাগুলো জানা অত্যাবশ্যকীয়।

পাঠক, আপনার উচিত এ বিষদ বিবরণ থেকে শিক্ষা নেয়া, যার মাধ্যমে এ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে সংঘটিত অস্থিরতা ও ফিতনার পার্থক্য বুঝতে পারবেন।

যে ব্যক্তি সত্যকে চিনতে পেরে তা অনুসরণ করল, একমাত্র সেই ফিতনা থেকে মুক্তি পেলো।

২১তম অধ্যায়ঃ
নেককার ও বুজুর্গ ব্যক্তিদের কবরের ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘন করলে তা তাকে মূর্তি পূজা তথা গাইরুল্লাহর ইবাদতে পরিণত করে

১। ইমাম মালেক রহ. মুয়াত্তায় বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া করেছেন।

أللهمّ لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتدّ غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.

"হে আল্লাহ আমার কবরকে এমন মূর্তিতে পরিণত করো না যার ইবাদত করা হয়। সেই জাতির উপর আল্লাহর কঠিন গজব নাজিল হয়েছে যারা নবীদের কবরগুলোকে মসজিদে পরিণত করেছে।"

২। ইবনে জারীর সুফিয়ান হতে, তিনি মানসূর হতে এবং তিনি মুজাহিদ হতে أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, "লাত" এমন একজন নেককার লোক ছেলেন, যিনি হজ্জ যাত্রীদেরকে "ছাতু" খাওয়াতেন। তরপর যখন তিনি মৃত্যু বরণ করলেন, তখন লোকেরা তার কবরে ইতেকাফ করতে লাগলো।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে আবুল জাওযা একই কথা বর্ণনা করে বলেন, "লাত" হাজীদেরকে "ছাতু" খাওয়াতেন। ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে,

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج (رواه أهل السنن)

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবর যিয়ারত কারিনী (মহিলা) দেরকে এবং যারা কবরকে মসজিদে পরিণত করে আর (কবরে) বাতি জ্বালায় তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন। [আহলুস সুনান' এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন]

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়,

১। أوثان (মূর্তি ও প্রতিমা) এর তাফসীর।

২। "ইবাদত" এর তাফসীর।

৩। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কা করেছেন একমাত্র তা থেকেই আল্লাহর কাছে পানাহ চেয়েছেন।

৪। নবীদের কবরকে মসজিদ বানানোর বিষয়টিকে মূর্তি পূজার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন।

৫। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কঠিন গজব নাযিলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

৬। এটি এ অধ্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সর্ববৃহৎ মূর্তি "লাতের" ইবাদতের সূচনা কিভাবে হয়েছে তা জানা গেলো।

৭। "লাত" নামক মূর্তির স্থানটি মূলত: একজন নেককার লোকের কবর।

৮। "লাত" প্রকৃতপক্ষে কবরস্থ ব্যক্তির নাম। মূর্তির নামকরণের রহস্য ও উল্লেখ করা হয়েছে।

৯। কবর জিয়ারত কারিনী (মহিলা) দের প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অভিসম্পাত।

১০। যারা কবরে বাতি জ্বালায় তাদের প্রতি ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অভিসাপ।

২২ তম অধ্যায় :

তাওহীদের হেফাযত ও শিরকের সকল পথ বন্ধ করার ক্ষেত্রে নবী মুস্তাফা সাহাবী এর অবদান

১। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ . (التوبة: ١٢٨)

“নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল আগমন করেছেন।” (তাওবা: ২৮)

২। সাহাবী আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا عليّ،

فإن صلاتكم تبغلني حيث كنتم.

“তোমাদের ঘরগুলোকে তোমরা কবর বানিও না, আর আমার কবরকে ঈদে পরিণত করো না। আমার উপর তোমরা দরূদ পড়ো। কারণ তোমরা যেখানেই থাকোনা কেন, তোমাদের দরূদ আমার কাছে পৌঁছে যায়। (আবু দাউদ)

৩। আলী ইবনুল হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি একজন লোককে দেখতে পেলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবরের পাশে

ব্যাখ্যা

তাওহীদের হেফাজত ও শিরকের পথ রুদ্ধ করার ক্ষেত্রে

মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অবদান

যে ব্যক্তি এ অধ্যায়ে উপস্থাপিত কুরআন ও সুন্নাহর উক্তিগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে সে অবশ্যই এমন তথ্যের সন্ধান পাবে যা তাওহীদের বিশ্বাসকে শক্তিশারী করে এবং তার উৎকর্ষ সাধনে অনুপ্রাণিত করে। সাথে সাথে কুরআন সুন্নাহলব্ধ জ্ঞান যে সব বিষয়ে তাকে অমূল্য পাথেয় যোগাবে সেগুলো হচ্ছে, আল্লাহর নৈকট্য লাভ, ভয়-ভীতি

একটি ছিদ্র পথে প্রবেশ করে সেখানে কিছু দোয়া-খায়ের করে চলে যায়। তখন তিনি ঐ লোকটিকে এধরনের কাজ নিষেধ করে দিলেন। তাকে আরো বললেন, "আমি কি তোমার কাছে সে হাদীসটি বর্ণনা করব না, যা আমি আমার পিতার কাছ থেকে শুনেছি এবং তিনি শুনেছেন আমার দাদার কাছ থেকে, আর আমার দাদা শুনেছেন রাসূল সাহাবী এর কাছ থেকে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

لا تتخذوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم ليبلغني أين كنتم. (رواه في المختارة)

"তোমরা আমার কবরকে ঈদে [মেলায়] পরিণত করো না আর তোমাদের ঘরগুলোকে কবরে পরিণত করো না। তোমরা যেখানেই থাকোনা কেন তোমাদের সালাম আমার কাছে পৌঁছে যায়"

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। সূরা তাওবার لقد جاءكم رسول من أنفسكم আয়াতের তাফসীর।

২। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় উম্মতকে কবর পূজা তথা শিরকী গুনাহর সীমারেখা থেকে বহুদূরে রাখতে চেয়েছেন।

ও আশা-আকাংখার ভিত্তিতে একমাত্র আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন, তাঁরই করুণা ও দয়া লাভের ক্ষেত্রে শক্তি সঞ্চয় এবং তা অর্জনের জন্য চেষ্টা সাধনা করা, সৃষ্টির দাসত্ব থেকে মুক্তি অর্জন, যে কোন দিক থেকে সৃষ্টির সাথে সম্পর্কহীন হওয়া অথবা কোন সৃষ্টির ব্যাপারে সীমালংঘন না করা, জাহেরী ও বাতেনী আমলগুলো পরিপূর্ণরূপে সম্পন্ন করা, বিশেষ করে উবুদিয়্যাতের প্রাণ শক্তি তথা ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পূর্ণ খুলুসিয়াত অর্জন করা।

এর মোকাবেলায় [অর্থাৎ শিরকের যাবতীয় পথ বন্ধ করার জন্য] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন সব কথা ও কাজ নিষিদ্ধ করেছেন যার মধ্যে মাখলুকের ব্যাপারে শরিয়তের সীমালংঘন নিহিত রয়েছে।

মুশরিকদের সাথে সামঞ্জস্যমূলক কোন কাজ করতে তিনি নিষেধ করেছেন। কারণ, এ জাতীয় কাজ মুশরিক হওয়ার দিকে মানুষকে আহ্বান জানায়।

তিনি এমন সব কথা ও কাজকে নিষেধ করেছেন যার মধ্যে মানুষকে শিরকের

৩। আমাদের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মমত্ববোধ, দয়া, করুণা এবং আমদের ব্যাপারে তার তীব্র আগ্রহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

৪। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যিয়ারত সর্বোত্তম নেক কাজ হওয়া সত্বেও বিশেষ উদ্দেশ্যে তাঁর কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছেন।

৫। অধিক যিয়ারত নিষিদ্ধ করেছেন।

৬। ঘরে নফল ইবাদত করার জন্য উৎসাহিত করেছেন।

৭। "কবরস্থানে নামাজ পড়া যাবে না" এটাই সালাফে-সালেহীনের অভিমত।

৮। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবরস্থানে নামায কিংবা দরূদ না পড়ার কারণ হচ্ছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর পঠিত দরূদ ও সালাম দূরে অবস্থান করে পড়লেও তাঁর কাছে পৌঁছানো হয়। তাই নৈকট্য লাভের আশায় কবরস্থানে দরূদ পড়ার কোন প্রয়োজন নেই।

৯। 'আলমে বরযখে' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে তাঁর উম্মাতের আমল দরূদ ও সালামের মধ্যে পেশ করা হয়।

দিকে আকৃষ্ট করার আশঙ্কা রয়েছে। তিনি এ কাজ করেছেন তাওহীদের হেফাজত ও সংরক্ষণের স্বার্থে।

এমন সব কার্যকারণকেও তিনি নিষেধ করেছেন যা মানুষকে শিরকের দিকে ধাবিত করে। আর এ কাজটি তিনি করেছেন মোমিনদের প্রতি তাঁর মমত্ব ও করুণানুভূতির কারণে। যাতে করে মুমিনরা যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হয়েছে তা অর্জন করতে পারে তথা পূর্ণ কল্যাণ ও শান্তি লাভের জন্য যাতে তারা আল্লাহর [উদ্দেশ্যে] জাহেরী ও বাতেনী ইবাদত পরিপূর্ণভাবে আদায় করতে পারে।

এসব বিষয়ের যথেষ্ট দৃষ্টান্ত ও প্রমাণাদি রয়েছে।

২৩ তম অধ্যায়ঃ

মুসলিম উম্মাহর কিছু সংখ্যক লোক মূর্তি পুজা করবে

১। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ (النساء: ٥١)

“আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যাদেরকে কিতাবের কিছু অংশ দেয়া হয়েছে? তারা ‘জিবত’ এবং ‘তাগুত্‌কে বিশ্বাস করে। (নিসাঃ৫১)

২। আল্লাহ তাআলা আরো এরশাদ করেছেন,

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللهِّ مَنْ لَعَنَهُ اللهُّ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ (ألمائدة: ٦٠)

“বলো, [হে মুহাম্মদ] আমি কি সে সব লোকদের কথা জানিয়ে দেবো? যাদের পরিণতি আল্লাহর কাছে [ফাসেক লোকদের পরিণতি] এর চেয়ে খারাপ। তারা এমন লোক যাদেরকে আল্লাহ লানত করেছেন এবং যাদের উপর আল্লাহর গজব নিপতিত হয়েছে। যাদের মধ্য থেকে কিছু লোককে তিনি বানর ও শুকর বানিয়ে দিয়েছেন। তারা তাগুতের পূজা করেছে। (মায়েদাঃ ৬০)

৩। আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে এরশাদ করেছেন,

ব্যাখ্যা

মুসলিম উম্মহার কিছু সংখ্যক লোক মূর্তিপূজা করবে

এ অধ্যায়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে শিরকের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা এবং শিরককে ভয় করে চলা। উম্মতে মুসলিমা শিরকে পতিত হওয়ার বিষয়টি বাস্তব ও

﴿قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ﴾ألكهف:٢١﴿

“যারা তাঁদের ব্যাপারে বিজয়ী হলো তারা বলল, আমরা অবশ্যই তাদের উপর [অর্থাৎ কবরস্থানে] মসজিদ তৈরী করব” (কাহাফ: ২১)

৪। সাহাবী আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত আছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন,

لتتبعنّ سنن من كان قبلكم، حذوة القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه،

قالوا يا رسول الله : اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ (أخرجاه)

“আমি আশঙ্কা করছি “তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের রীতি-নীতি অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করবে [যা আদৌ করা উচিত নয়] এমনকি তারা যদি গুঁই সাপের গর্তেও ঢুকে যায়, তোমরাও তাতে ঢুকবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ, তারা কি ইহুদি ও খ্রিস্টান?’ জবাবে তিনি বললেন, তারা ছাড়া আর কে? (বুখারী ও মুসলিম)

৫। মুসলিম শরীফে সাহাবী ছাওবান রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন,

أن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها’ وأعطيت الكنزين: الأحمر الأبيض، وإني سألت ربي لأمّتي أن لا يهلكها بسنة بعامة، وأن لا يسلّط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، فيستبيح بيضتهم، وأن ربي قال : يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، ويسبي بعضهم بعضا.

অবধারিত। এর আরো একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐ ব্যক্তির জবাব দেয়া, যে এ কথা দাবি করে যে, যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে মুসলিম নাম ধারণ করল সে ইসলামের পরিপন্থী কাজ করেও ইসলামের উপর টিকে থাকতে পারে। ইসলাম পরিপন্থী উক্ত কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে, কবরবাসীদের কাছে সাহায্য চাওয়া, তাদের কাছে দোয়া করা

“আল্লাহ তাআলা গোটা যমীনকে একত্রিত করে আমার সামনে পেশ করলেন। তখন আমি জমিনের পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত দেখে নিলাম। পৃথিবীর ততটুকু স্থান আমাকে দেখানো হয়েছে আমার উম্মতের শাসন বা রাজত্ব যতটুকু স্থান পর্যন্ত বিস্তার লাভ করবে। লাল ও সাদা দুটি ধন ভান্ডার আমাকে দেয়া হলো আমি আমার রবের কাছে আমার উম্মতের জন্য এ আরজ করলাম, তিনি যেন আমার উম্মতকে গণ দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে ধ্বংস না করেন এবং তাদের নিজেদেরকে ব্যতীত অন্য কোন শত্রুকে তাদের উপর বিজয়ী বা ক্ষমতাসীন করে না দেন যার ফলে সে (শত্রু) তাদের সম্পদকে হালাল মনে করবে [লুটে নিবে]। আমার রব আমাকে বললেন, হে মুহাম্মদ আমি যখন কোন বিষয়ে ফয়সালা নিয়ে ফেলি, তখন তার কোন ব্যতিক্রম হয় না। আমি তোমাকে তোমার উম্মতের জন্য এ অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, আমি তাদের গণ দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে ধ্বংস করব না এবং তাদের নিজেদেরকে ছাড়া যদি সারা বিশ্ব ও তাদের বিরুদ্ধে একত্রিত হয় তবুও এমন কোন শত্রুকে তাদের উপর ক্ষমতাবান করব না যা তাদের সম্পদকে বৈধ মনে করে লুণ্ঠন করে নিয়ে যাবে যে পর্যন্ত না তারা একে অপরকে ধ্বংস করবে আর একে অপরকে বন্দী করবে।

এবং এটাকে ইবাদতের পরিবর্তে অসীলা নামে অবিহিত করা। তাদের এ দাবি সম্পূর্ণ বাতিল।

“ওয়াছান (وثن) অর্থাৎ মূর্তি এমন ব্যাপক অর্থবোধক নাম যা দ্বারা আল্লাহ ব্যতীত যাবতীয় উপাস্যকে বুঝানো হয়। এ ক্ষেত্রে গাছ, পাথর, বাড়ি-ঘর, এবং আম্বিয়া, আউলিয়া, নেককার ও বদকারের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। [অর্থাৎ গাইরুল্লাহ, নেককার, বদকার কিংবা গাছ-পাথর যাই হোক না কেন তাদের কাছে সাহায্য চাওয়া আর দোয়া করা সর্বাবস্থাতেই] এটা তাদের ইবাদত করার শামিল যা কেবলমাত্র একক

বারকানী তাঁর সহীহ হাদিস গ্রন্থে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে উক্ত বর্ণনায় নিম্নোক্ত কথাগুলো অতিরিক্ত এসেছে,

وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حيّ من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين، لانبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.

"আমি আমার উম্মতের জন্য পথভ্রষ্ট শাসকদের ব্যাপারে বেশি আশঙ্কা বোধ করছি। একবার যদি তাদের উপর তলোয়ার উঠে তবে সে তলোয়ার কেয়ামত পর্যন্ত আর নামবে না। আর ততক্ষণ পর্যন্ত কেয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না আমার একদল উম্মত মুশরিকদের সাথে মিলিত হবে এবং যতক্ষণ না আমার উম্মতের একটি শ্রেণী মূর্তি পূজা করবে। আমার উম্মতের মধ্যে ত্রিশজন মিথ্যাবাদী অর্থাৎ ভন্ড নবীর আবির্ভাব হবে। প্রত্যেকেই নিজেকে নবী বলে দাবি করবে। অথচ আমিই হচ্ছি সর্বশেষ নবী। আমার পর কোন নবীর আগমন ঘটবে না। কেয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মতের মধ্যে এমন একটি সাহায্য প্রাপ্ত দলের অস্তিত্ব থাকবে যাদেরকে কোন অপমানকারীর অপমান ক্ষতি করতে পারবে না। [অর্থাৎ সত্য পথ থেকে বিরত রাখতে পারবে না]

আল্লাহর প্রাপ্য। যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর কাছে দোয়া করল অথবা তার ইবাদত করল সে ব্যক্তি তাকে [গাইরুল্লাহকে] وثن অর্থাৎ উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করল। এবং সাথে সাথে গাইরুল্লাহর ইবাদতের কারণে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে গেলো। ইসলামের সাথে এমতাবস্থায় তার সম্পর্কের কোন মূল্যই হবে না। এমন বহু মুশরিক মুলহিদ, কাফির এবং মুনাফেকের সম্পর্কই তো ইসলামের সাথে ছিল। এখানে বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে দ্বীনের মূল শিক্ষা এবং তার মর্মার্থ। অর্থহীন নাম আর শব্দ এখানে বিবেচ্য বিষয় নয়।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। সূরা নিসার ৫১নং আয়াতের তাফসীর।

২। সূরা মায়েদার ৬০ নং আয়াতের তাফসীর।

৩। সূরা কাহাফের ২১ নং আয়াতের তাফসীর।

৪। এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। [আর তা হচ্ছে] এখানে 'জিবত] এবং 'তাগুতের] প্রতি ঈমানের অর্থ কি? এটা কি শুধু অন্তরের বিশ্বাসের নাম? নাকি জিবত ও তাগুতের প্রতি ঘৃণা, ক্ষোভ এবং বাতিল বলে জানা সত্ত্বেও এর পূজারীদের সাথে ঐকমত্য পোষণ করা বুঝায়?

৫। তাগুত পূজারীদের কথা হচ্ছে, কাফেররা তাদের কুফরি সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও তারা মোমিনদের চেয়ে অধিক সত্য পথের অধিকারী।

৬। আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে যে ধরনের লোকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সে ধরনের বহু সংখ্যক লোক এ উম্মতের মধ্যে অবশ্যই পাওয়া যাবে। [যারা ইহুদি খৃষ্টানদের হুবহু অনুসারী]।

৭। এ রকম সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুস্পষ্ট ঘোষণা। অর্থাৎ এ উম্মতে মুসলিমার মধ্যে বহু মূর্তি পূজারী লোক পাওয়া যাবে।

৮। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, "মুখতারের" মত মিথ্যা এবং ভন্ড নবীর আবির্ভাব। মুখতার নামক এ ভন্ডনবী আল্লাহর একত্ববাদ ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রিসালতকে স্বীকার করতো। সে নিজেকে উম্মতে মুহাম্মদীর অন্তর্ভূক্ত বলেও ঘোষণা করতো সে আরো ঘোষণা দিতো, রাসূল সত্য, কুরআন সত্য এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ নবী হিসেবে স্বীকৃত। এগুলোর স্বীকৃতি প্রদান সত্ত্বেও তার মধ্যে উপরোক্ত স্বীকৃতির সুস্পষ্ট বিপরীত ও পরিপন্থী কার্যকলাপ পরিলক্ষিত হয়েছে। এ ভন্ড মুর্খও সাহাবায়ে কেরামের শেষ যুগে আবির্ভূত হয়েছিল এবং বেশ কিছু লোক তার অনুসারীও হয়েছিল।

৯। সু-সংবাদত হচ্ছে এই যে, অতীতের মতো হক সম্পূর্ণরূপে কখনো বিলুপ্ত হবে না বরং একটি দল হকের উপর চিরদিনই প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

১০। এর সবচেয়ে বড় নিদর্শন হচ্ছে, তারা [হক পন্থীরা] সংখ্যায় কম হলেও কোন অপমানকারী ও বিরোধীতাকারী তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

১১। কেয়ামত পর্যন্ত উক্ত শর্ত কার্যকর থাকবে।

১২। এ অধ্যায়ে কতগুলো বড় নিদর্শনের উল্লেখ রয়েছে।

যথাঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক সংবাদ পরিবেশন যে, 'আল্লাহ তাআলা তাঁকে বিশ্বের পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্তের সবকিছুই একত্রিত করে দেখিয়েছেন। এ সংবাদ দ্বারা যে অর্থ বুঝিয়েছেন বাস্তবে ঠিক তাই সংঘটিত হয়েছে, যা উত্তর ও দক্ষিণের ব্যাপারে ঘটেনি। তাঁকে দু'টি ধন-ভান্ডার প্রদান করা হয়েছে এ সংবাদও তিনি দিয়েছেন।

তাঁর উম্মতের ব্যাপারে মাত্র দুটি দোয়া কবুল হওয়ার সংবাদ তিনি দিয়েছেন এবং তৃতীয় দোয়া কবুল না হওয়ার খবরও তিনি জানিয়েছেন।

তিনি এ খবরও জানিয়েছেন যে, এ উম্মতের উপরে একবার তলোয়ার উঠলে তা আর খাপে প্রবেশ করবে না। [অর্থাৎ সংঘাত শুরু হলে তা আর থামবে না]।

তিনি আরো জানিয়েছেন যে, উম্মতের লোকেরা একে অপরকে ধ্বংস করবে, একে অপরকে বন্দী করবে। উম্মতের জন্য তিনি ভ্রান্ত শাসকদের ব্যাপারে শতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন।

এ উম্মতের মধ্য থেকে মিথ্যা ও ভন্ড নবী আবির্ভাবের কথা তিনি জানিয়েছেন। সাহায্য প্রাপ্ত একটি হক পন্থীদল সব সময়ই বিদ্যমান থাকার সংবাদ জানিয়েছেন।

উল্লেখিত সব বিষয়ই পরিবেশিত খবর অনুযায়ী হুবহু সংঘটিত হয়েছে। অথচ এমনটি ভবিষ্যতে সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারটি যুক্তি ও বুদ্ধির আওতাধীন নয়।

১৩। একমাত্র পথভ্রষ্ট নেতাদের ব্যাপারেই তিনি শংকিত ছিলেন।

১৪। মূর্তি পূজার মর্মার্থের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শতর্কবাণী।

২৪ তম অধ্যায় :

যাদু

১। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآَخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ (ألبقرة: ١٠٢)

"তারা অবশ্যই অবগত আছে, যে ব্যক্তি তা [ঐাদু] ক্রয় করে নিয়েছে, পরকালে তার কোন সুফল পাওনা নেই।" (বাকারাঃ ১০২)

২। আল্লাহ তাআলা আরো এরশাদ করেছেন,

يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ (نساء : ٥١)

তারা 'জিবত' এবং 'তাগুত' কে বিশ্বাস করে। (নিসাঃ ৫১)

ওমর রা. বলেছেন, 'জিবত' হচ্ছে ঐাদু, আর 'তাগুত' হচ্ছে শয়তান।

জাবির রা. বলেছেন, 'তাগুত' হচ্ছে গণক। তাদের উপর শয়তান অবতীর্ণ হতো প্রত্যেক গোত্রের জন্যই একজন করে গণক নির্ধারিত ছিল।

৩। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

إجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر،وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.

"তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক জিনিস থেকে বেঁচে থাকো। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রাসুলাল্লাহ ঐ ধবংসাত্মক জিনিসগুলো কি? তিনি জবাবে বললেন,

১। আল্লাহর সাথে শিরক করা। ২। ঐাদকরা। ৩। অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা যা আল্লাহ তাআলা হারাম করে দিয়েছেন। ৪। সুদ খাওয়া। ৫। এতিমের সম্পদ আত্মসাৎ করা। ৬। যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা। ৭। সতী সাধ্বী মোমিন মহিলাকে অপবাদ দেয়া।

৪। যুনদুব রা. থেকে 'মারফু' হাদিসে বর্ণিত আছে,

حد الساحر ضربه بالسيف. (رواه الترمذي)

"ঐাদকরের শাস্তি হচ্ছে তলোয়ারের আঘাতে গর্দান উড়িয়ে দেয়া" [মৃত্যু দন্ড]। (তিরমিযী)

৫। সহীহ বুখারীতে বাজালা বিন আবাদাহ থেকে বর্ণিত আছে, ওমর রা. মুসলিম গভর্ণরদের কাছে পাঠানো নির্দেশনামায় লিখেছেন,

أن اقتلو كل ساحر وساحرة.

"তোমরা প্রত্যেক যাদুকর পুরুষ এবং যাদুকর নারীকে হত্যা করো।" বাজালা বলেন, এ নির্দেশের পর আমরা তিনজন যাদুকরকে হত্যা করেছি।

৬। হাফসা রা. থেকে বর্ণিত সহীহ হাদিসে আছে, তিনি তাঁর অধীনস্ত একজন বান্দী (ক্রীতদাসী) কে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, যে দাসী তাঁকে ঐাদকরেছিলো। অতঃপর উক্ত নির্দেশে তাকে হত্যা করা হয়েছে। একই রকম হাদিস জুনদাব থেকে সহীহভাবে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহমাদ রহ. বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তিনজন সাহাবী থেকে একথা সহীহ ভাবে বর্ণিত হয়েছে।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১। সূরা বাকারার ১০২ নং আয়াতের তাফসীর।

২। সূরা নিসার ৫১ নং আয়াতের তাফসীর।

৩। 'জিবত' এবং 'তাগুত' এর ব্যাখ্যা এবং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য।

৪। 'তাগুত' কখনো জিন আবার কখনো মানুষ হতে পারে।

৫। ধ্বংসাত্মক সাতটি এমন বিশেষ বিষয়ের জ্ঞান যে ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে।

৬। যাদুকরকে কাফের ঘোষণা দিতে হবে।

৭। তাওবার সুযোগ ছাড়াই যাদুকরকে হত্যা করতে হবে।

যদি ওমর রা. এর যুগে ঐাদবিদ্যার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে তাঁর পরবর্তী যুগের অবস্থা কি দাঁড়াবে? [অর্থাৎ তাঁর পরবর্তী যুগে ঐাদবিদ্যার প্রচলন অবশ্যই আছে।]

২৫ তম অধ্যায় :

যাদু এবং যাদুর শ্রেণীভূক্ত বিষয়

১। কুতুন বিন কুবাইসা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে এ কথা বলতে শুনেছেন,

إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت.

"নিশ্চয়ই 'ইয়াফা', 'তারক' এবং 'তিয়ারাহ' হচ্ছে 'জিবত' এর অন্ত র্ভুক্ত।

আউফ বলেছেন, 'ইয়াফা' হচ্ছে পাখি উড়িয়ে ভাগ্য গণনা করা। 'তারক' হচ্ছে মাটিতে রেখা টেনে ভাগ্য গণনা করা। হাসান বলেছেন, 'জিবত' হচ্ছে শয়তানের মন্ত্র। এ বর্ণনার সনদ সহীহ (আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনু হিব্বান)

২। ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. (رواه أبوداود)

"যে ব্যক্তি জ্যোতির্বিদ্যার কিছু অংশ শিখলো সে মূলতঃ যাদুবিদ্যারই কিছু অংশ শিখলো। এ [জ্যোতির্বিদ্যা] যত বাড়বে ঐাদবিদ্যাও তত বাড়বে।" (আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা

যাদুকে তাওহীদের অধ্যায়ে শামিল করার কারণ হচ্ছে, এমন অনেক যাদু আছে যেগুলো শিরক ব্যতীত কার্যকর করা সম্ভব নয়। আবার শয়তানী আত্মার অসীলা ব্যতীত যাদুকরের স্বার্থ অর্জিত হয় না। তাই কম হোক আর বেশিই হোক যাদুবিদ্যা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা ব্যতীত বান্দার তাওহীদ পরিপূর্ণ হবে না। একজনই 'শারে' অর্থাৎ শরিয়তের বিধানদাতা যাদুকে শিরকের সাথে সংযুক্ত করেছে।

যাদু দুটি কারণে শিরকের অন্তর্ভুক্তঃ

১। যাদু বিদ্যায় শয়তানকে ব্যবহার করা হয়। তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা হয়।

৩। হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে একটি হাদিসে বর্ণিত আছে

من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك: ومن تعلق شيئا وكل إليه.

"যে ব্যক্তি গিরা লাগায় অতঃপর তাতে ফুঁক দেয় সে মূলত: ঐাদকরে। আর যে ব্যক্তি ঐাদকরে সে মূলত: শিরক করে আর যে ব্যক্তি কোন জিনিস [তাবিজ-কবজ] লটকায় তাকে ঐ জিনিসের দিকেই সোপর্দ করা হয়। (নাসায়ী)

৪। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

ألا هل أنبئكم ما العضة؟ هى النميمة، القالة بين الناس. (رواه مسلم)

"আমি কি তোমাদেরকে ঐাদকি-এ সম্পর্কে সংবাদ দেব না? তা হচ্ছে চোগোলখুরী বা কুৎসা রটনা করা অর্থাৎ মানুষের মধ্যে কথা-লাগানো বা বদনাম ছড়ানো।" (মুসলিম)

কোন কোন সময় শয়তান যেসব কাজ পছন্দ করে সে সব কাজ সম্পাদন করে তার নৈকট্য লাভ করতে হয়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে শয়তান যেন যাদুকরের কাজ করে দেয় এবং তার উদ্দেশ্য হাসিলে সচেষ্ট হয়।

২। ঐাদবিদ্যায় এলমে গায়েবের দাবি করা হয়, যাদুকরের জ্ঞান ও যাদুবিদ্যা অর্জনের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার অংশীদারিত্বের দাবি করা হয়, এটা নিঃসন্দেহে শিরক এবং কুফরির অন্তর্ভুক্ত।

তাছাড়াও যাদুকে কার্যকর করতে গেলে অনেক হারাম ও ঘৃণ্য কার্যকলাপের আশ্রয় নিতে হয় যেমনঃ হত্যা করা, কাউকে বশ করা, জ্ঞানশূন্য করে ফেলা ইত্যাদি। এগুলো হচ্ছে নিকৃষ্ট এবং ঘৃণ্যতম কাজ। যাদুকরের জঘন্য ক্ষতিকর ও শান্তি শৃংখলা বিনষ্টকারী কার্যকলাপের কারণেই তার শাস্তি মৃত্যুদন্ড বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

যাদুর শ্রেণীভূক্ত আরেকটি বিষয় অনেক মানুষের মধ্যেই পাওয়া যায়, তা হচ্ছে চোগলখুরী বা কুৎসা রটনা করা। মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি, প্রিয়জনদের অন্তরে শত্রুতা সৃষ্টি।

৫। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, إن من البيان لسحرا।

নিশ্চয় কোন কোন কথার মধ্যে ঐাদআছে। (বুখারী ও মুসলিম)

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। 'ইয়াফা', 'তারক' এবং 'তিয়ারাহ' জিবতের অন্তর্ভূক্ত।
২। 'ইয়াফা', 'তারক', এবং 'তিয়ারাহ' এর তাফসীর।
৩। জ্যোতির্বিদ্যা ঐাদুর অন্তর্ভুক্ত।
৪। ফুঁক সহ গিরা লাগানো ঐাদুর অন্তর্ভুক্ত।
৫। কুৎসা রটনা করা ঐাদুর শামিল।
৬। কিছু কিছু বাগ্মীতাও ঐাদুর অন্তর্ভুক্ত ।

বিরাগ ও অবিশ্বাস সৃষ্টির মাধ্যমে আন্তরিক সম্পর্কের পরিবর্তন সাধন এবং মানুষের মধ্যে অমঙ্গল ও অশান্তি সৃষ্টির ক্ষেত্রে ঐাদুর সাথে চোগোলখুরীর সামঞ্জস্য রয়েছে।

তাই যাদুবিদ্যা অনেক প্রকারের হয়ে থাকে–যার একটা থেকে আরেকটা অধিকতর হীন, নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্য।

২৬তম অধ্যায় :
গনক

১। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এক স্ত্রী থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

من أتى عرّافا فسأله عن شيئ فصدّقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما.

"যে ব্যক্তি কোন গণকের কাছে আসল, তারপর তাকে [ভাগ্য সম্পর্কে] কিছু জিজ্ঞাসা করল, অতঃপর গণকের কথাকে সত্য বলে বিশ্বাস করল, তাহলে চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামাজ কবুল হবে না। (মুসলিম)

২। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقدكفر بما أنزل على محمد. (رواه ابو داود)

"যে ব্যক্তি গণকের কাছে আসলো, অতঃপর গণক যা বলল তা সত্য বলে বিশ্বাস করল, সে মূলত: মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর যা নাজিল করা হয়েছে তা অস্বীকার করল। (সহীহ বুখারী ও মুসলিমের শর্ত মোতাবেক হাদীসটি সহীহ। আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ইবনে মাজা ও হাকিম এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)।

আবু ইয়ালা ইবনে মাসউদ থেকে অনুরূপ মাউকুফ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা

যদি কেউ কোন পন্থায় গায়েবের এলেম বা অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কে অবগত আছে বলে দাবি করে তবে সে ব্যক্তিই গণকের মধ্যে শামিল। অদৃশ্য জ্ঞান বা এলমুল গায়েবের একচ্ছত্র অধিকারী হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ তাআলা। অতএব যে ব্যক্তি গণনা কিংবা ভবিষ্যদ্বানীর মাধ্যমে আল্লাহর জ্ঞানের মধ্যে অংশীদারীত্বের দাবি করে অথবা এর দাবীদারকে সত্য বলে বিশ্বাস করে সে মূলত: এমন বিষয়ে আল্লাহর সাথে [সৃষ্টিকে]

৩। ইমরান বিন হুসাইন থেকে মারফু’ হাদিসে বর্ণিত আছে,

ليس منا من تطير أو تطير له، أوتكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحرله، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. (رواه البزار بإسناد جيد)

“যে ব্যক্তি পাখি উড়িয়ে ভাগ্যের ভাল-মন্দ যাচাই করল, অথবা যার ভাগ্যের ভাল-মন্দ যাচাই করার জন্য পাখি উড়ানো হল, অথবা যে ব্যক্তি ভাগ্য গণনা করল, অথবা যার ভাগ্য গণনা করা হলো, অথবা যে ব্যক্তি ঐাদকরল অথবা যার জন্য ঐাদকরা হলো অথবা যে ব্যক্তি কোন গণকের কাছে আসলো অতঃপর সে [গণক] যা বলল তা বিশ্বাস করল সে ব্যক্তি মূলতঃ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর যা নাজিল করা হয়েছে তা [কুরআন] অস্বীকার করল। (বায্যার)

[ইমাম তাবারানীও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে ومن أتى থেকে হাদিসের শেষ পর্যন্ত ইমাম তাবারানী কর্তৃক বর্ণিত ইবনে আব্বাসের হাদিসে উল্লেখ নেই।

ইমাম বাগাবী রহ.) বলেন عراف [গণক] ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যে ব্যক্তি চুরি যাওয়া জিনিস এবং কোন জিনিস হারিয়ে যাওয়ার স্থান ইত্যাদি বিষয় অবগত আছে বলে দাবি করে। এক বর্ণনায় আছে যে, এ ধরনের লোককেই গণক বলা হয়। মূলতঃ গণক বলা হয় এমন ব্যক্তিকে যে ভবিষ্যতের গায়েবী বিষয় সম্পর্কে সংবাদ দেয় [অর্থাৎ যে ভবিষ্যদ্বানী করে]। আবার কারো মতে যে ব্যক্তি ভবিষ্যতের গোপন খবর বলে দেয়ার দাবি করে তাকেই গণক বলা হয়।

শরিক বানায় যা একমাত্র আল্লাহর বৈশিষ্ট্য হিসেবেই গণ্য। সাথে সাথে এটা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার শামিল।

শয়তানের সাথে সংশ্লিষ্ট অনেক গণনাই শিরক থেকে মুক্ত নয়। [অর্থাৎ শিরক মিশ্রিত] এবং এতে এমন সব পদ্ধতি বা উপায় অবলম্বন করা হয় যার মাধ্যমে এলমে গায়েব জানার ব্যাপারে সাহায্য চাওয়া হয়।

কারো মতে যে ব্যক্তি দিলের (গোপন) খবর দেয়ার দাবি করে, সেই গণক।

আবুল আব্বাস ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেছেন كاهن [গণক], منجم [জ্যোতির্বিদ], এবং رمال [বালির উপর রেখা টেনে ভাগ্য গণনাকারী] এবং এ জাতীয় পদ্ধতিতে যারাই গায়েব সম্পর্কে কিছু জানার দাবি করে তাদেরকেই আররাফ [عراف] বলে।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, এক কওমের কিছু লোক আরবী أباجاد লিখে নক্ষত্রের দিকে দৃষ্টি দেয় এবং তা দ্বারা ভাগ্যের ভাল-মন্দ যাচাই করে। পরকালে তাদের জন্য আল্লাহর কাছে কোন ভাল ফল আছে বলে আমি মনে করি না।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১। গণনাকারীকে সত্য বলে বিশ্বাস করা এবং কুরআনের প্রতি ঈমান রাখা, এ দুটি বিষয় একই ব্যক্তির অন্তরে এক সাথে অবস্থান করতে পারে না।

২। ভাগ্য গণনা করা কুফরি হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট ঘোষণা।

৩। যার জন্য গণনা করা হয়, তার উল্লেখ।

৪। পাখি উড়িয়ে ভাগ্য পরীক্ষাকারীর উল্লেখ।

৫। যার জন্য ঐাদকরা হয়, তার উল্লেখ।

৬। ভাগ্য গণনা করার ব্যাপারে যে ব্যক্তি "আবাজাদ" শিক্ষা করেছে তার উল্লেখ্য।

৭। 'কাহেন, [كاهن] এবং 'আররাফ' [عراف] এ মধ্যে পার্থক্য।

তাই বিষয়টি যেহেতু একমাত্র আল্লাহর সাথে খাস এবং তাঁর এলেমের মধ্যে অংশীদারিত্বের দাবি রাখে সেহেতু বিষয়টি শিরকের অন্তর্ভূক্ত।

এটা শিরক হওয়ার আরো একটি দিক হচ্ছে এই যে, এতে গাইরুল্লাহর নৈকট্য লাভের বিষয় সম্পৃক্ত রয়েছে।

এতে শারে' অর্থাৎ বিধানদাতা যাবতীয় কুসংস্কার এবং দ্বীন ও বুদ্ধিদীপ্ত জ্ঞানের জন্য ক্ষতিকর জিনিস থেকে মানুষকে বাঁচাতে চেয়েছেন।

২৭ তম অধ্যায়ঃ

নাশরাহ বা প্রতিরোধমূলক যাদু

১। সাহাবী জাবের রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নাশরাহ বা প্রতিরোধমূলক ঐাদসম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো। জবাবে তিনি বললেন,

هي من عمل الشيطان. (رواه أحمد و أبوداود)

"এটা হচ্ছে শয়তানের কাজ" (আহমাদ, আবু দাউদ)

আবু দাউদ বলেন, ইমাম আহমাদ রহ.)-কে নাশরাহ [প্রতিরোধমূলক ঐাদু] সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো। জবাবে তিনি বলেছেন, "ইবনে মাসউদ রা. এর [নাশরাহর] সব কিছুই অপছন্দ করতেন।"

সহীহ বুখারীতে কাতাদাহ রা. হ'তে বর্ণিত আছে, আমি ইবনুল মুসাইয়্যিবকে বললাম, "একজন মানুষের অসুখ হয়েছে অথবা তাকে তার স্ত্রীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে, এমতাবস্থায় তার এ সমস্যার সমধান করা কিংবা প্রতিরোধমূলক ঐাদ[নাশরাহ] এর মাধ্যমে চিকিৎসা করা যাবে কি? তিনি বললেন, 'এতে কোন দোষ নেই।' কারণ তারা এর [নাশরাহ] দ্বারা সংশোধন ও কল্যাণ সাধন করতে চায়। যা দ্বারা মানুষের কল্যাণ ও উপকার সাধিত হয় তা নিষিদ্ধ নয়।"

হাসান রা. থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন,

لا يحل السحر إلا الساحر "একমাত্র যাদুকর ছাড়া অন্য কেউ যাদুকে হালাল মনে করে না।"

ইবনুল কাইয়্যিম বলেন, النشرة حل السحر عن المسحور

ব্যাখ্যা

'নাশরাহ' হচ্ছে, যাদুকৃত ব্যক্তিকে ঐাদুর প্রভাব থেকে মুক্ত করা। এ বিষয়ে গ্রন্থকার বিস্তারিতভাবে ইবনুল কাইয়্যিমের কথা উল্লেখ করেছেন। এতে তিনি ঐাদুর ক্রিয়া দূর করার ক্ষেত্রে 'নাশরাহ' জায়েয ও নাজায়েযের বিষটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। এখানে এতটুকুই যথেষ্ট।

‘নাশারাহ’ হচ্ছে যাদুকৃত ব্যক্তি বা বস্তুর উপর থেকে ঐাদুর প্রভাব দূর করা।

নাশরাহ দু’ধরনের :

প্রথমটি হচ্ছে, যাদুকৃত ব্যক্তি বা বস্তুর উপর হতে ঐাদুর ক্রিয়া নষ্ট করার জন্য অনুরূপ ঐাদদ্বারা চিকিৎসা করা। আর এটাই হচ্ছে শয়তানের কাজ। হাসান বসরী রহ.) এর বক্তব্য দ্বারা এ কথাই বুঝানো হয়েছে। এক্ষেত্রে নাশের [ঐাদুর চিকিৎসক] ও মুনতাশার [যাদুকৃত রোগী] উভয়ই শয়তানের পছন্দনীয় কাজের মাধ্যমে শয়তানের নিকটবর্তী হয়। যার ফলে শয়তান যাদুকৃত রোগীর উপর থেকে তার প্রভাব মিটিয়ে দেয়।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে, ঝাড়-ফুঁক, বিভিন্ন ধরনের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ,ঔষধ-পত্র প্রয়োগ ও শরীয়ত সম্মত দোয়া ইত্যাদির মাধ্যমে চিকিৎসা করা এ ধরনের চিকিৎসা জায়েয।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১। নাশরাহ (প্রতিরোধমূলক যাদু) এর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ।

২। নিষিদ্ধ বস্তু ও অনুমতি প্রাপ্ত বস্তুর মধ্যে পার্থক্য করণ, যাতে সন্দেহ মুক্ত হওয়া যায়।

২৮ তম অধ্যায়ঃ
কুলক্ষণ সম্পর্কীয় বিবরণ

১। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿الأعراف:١٣١﴾

"মনে রেখো, আল্লাহর কাছেই রয়েছে তাদের কুলক্ষণসমূহের চাবিকাঠি। কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই তা বুঝে না। (আরাফ: ১৩১)

২। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন .

قالوا طائركم معكم (يس : ١٩)

"তারা বলল, তোমাদের দুর্ভাগ্য তোমাদের সাথেই রয়েছে।" (ইয়াসিন : ১৯)

৩। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

لا عدوى ولا طيرة، ولا هامة ولا صفر، (أخرجاه)

"দ্বীন ইসলামে সংক্রামক ব্যাধি, কুলক্ষণ বা দুর্ভাগ্য, কথার কুলক্ষণ বলতে কিছুই নেই।" (বুখারী ও মুসলিম)

[মুসলিমের হাদিসে 'নক্ষত্রের প্রভাবে বৃষ্টিপাত, রাক্ষস বা দৈত্য বলতে কিছুই নেই' এ কথাটুকু অতিরিক্ত আছে]

ব্যাখ্যা

طيرة [তিয়ারাহ] হচ্ছে পাখি উড়িয়ে নাম, শব্দ, স্থান ইত্যাদি দ্বারা শুভা-শুভ নির্ধারণ করা। "শারে" অর্থাৎ শরিয়তের বিধান দাতা পাখি উড়িয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করতে নিষেধ করেছেন। আর এ কাজ যারা করে তাদের নিন্দা করেছেন। তিনি [রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ফাল পছন্দ করতেন, আর কুলক্ষণের ধারণাকে ঘৃণা করতেন। 'ফাল' এবং 'তিয়ারাহ' এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, 'ফাল' [ভাল কথা] দ্বারা মানুষের ঈমান আক্বীদা ও জ্ঞান-বুদ্ধির কোন ক্ষতি হয় না। এতে গাইরুল্লাহর সাথে মানব হৃদয় সম্পৃক্ত হয় না। বরং এর দ্বারা কল্যাণময় কাজে প্রাণচাঞ্চল্য আসে এবং আনন্দ অনুভূত হয়। সাথে সাথে মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অন্তরে শক্তি সঞ্চারিত হয়। এর উদাহরণ

বুখারী ও মুসলিমে আনাস রা. থেকে আরো বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

لا عدوى ولاطيرة ويعجبني الفأل' قالوا: مالفأل؟ قال : الكلمة الطيبة.

“ইসলামে সংক্রামক ব্যাধি আর কুলক্ষণ বলতে কিছুই নেই। তবে ‘ফাল’ আমাকে অবাক করে [অর্থাৎ আমার কাছে ভাল লাগে।] সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, ‘ফাল’ কি জিনিস? জবাবে তিনি বললেন, ‘উত্তম কথা’। [যে কথা শিরকমুক্ত]

৫। উকবা বিন আমের রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কুলক্ষণ বা দূর্ভাগ্যের বিষয়টি রাসূল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে উল্লেখ করা হলো। জবাবে তিনি বললেন,

أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل:

এগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে ‘ফাল’। কুলক্ষণ কোন মুসলমানকে স্বীয় কর্তব্য পালনে বাধাগ্রস্ত করতে পারে না। তোমাদের কেউ যদি অপছন্দনীয় কোন কিছু প্রত্যক্ষ করে তখন সে যেন বলে,

---

হচ্ছে, কোন বান্দা ভ্রমণ, বিয়ে-শাদি, কিংবা কোন চুক্তি সম্পাদন করার জন্য মনস্থির করল অথবা কোন গুরুত্বপূর্ণ অবস্থায় উপনীত হলো, এমতাবস্থায় তার উদ্দেশ্য হাসিল অথবা কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে এমন কিছু দেখতে পেলো বা শুনতে পেলো, যা তার মনকে প্রফুল্ল করে তোলে অথবা আনন্দ দেয়। যেমনঃ কেউ তাকে লক্ষ্য করে বলল, ইয়া রাশেদ [হে বুদ্ধিমান] অথবা ইয়া সালেম[হে শান্তির প্রতীক]অথবা ইয়া গানেম[হে ভাগ্যবান] এ কথাকে বান্দা শুভলক্ষণ গণ্য করে এবং কাজের প্রতি তার আগ্রহকে আরো বৃদ্ধি করে। এর ফলে কাংখিত কাজটি সহজভাবে করতে প্রয়াস পায়। উপরোক্ত কথাগুলো ভাল এবং এর ফলাফলও ভাল। এতে দোষের কিছুই নেই।

আর طيرة [তিয়ারাহ] অর্থাৎ পাখি উড়িয়ে ভাগ্যের ভাল-মন্দ যাচাই করার

أللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك،

"হে আল্লাহ তুমি ছাড়া কেউ কল্যাণ দিতে পারে না। তুমি ছাড়া কেউ অকল্যাণ ও দূরাবস্থা দূর করতে পারে না। ক্ষমতা ও শক্তির আধার একমাত্র তুমিই।" (আবু দাউদ)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে 'মারফু' হাদিসে বর্ণিত আছে, পাখি উড়িয়ে ভাগ্য গণনা করা শেরেকী কাজ, পাখি উড়িয়ে লক্ষণ নির্ধারণ করা শেরেকী কাজ, একাজ আমাদের নয়। আল্লাহ তাআলা তাওয়াক্কুলের মাধ্যমে মুসলিমের দুশ্চিন্তাকে দূর করে দেন। (আবু দাউদ, তিরমিজী)

৭। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত আছে, 'কুলক্ষণ বা দুর্ভাগ্যের ধারণা যে ব্যক্তিকে তার স্বীয় প্রয়োজন, দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে দূরে রাখলো, সে মূলতঃ শিরক করল। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, এর কাফ্ফারা কি? উত্তরে তিনি বললেন, তোমরা এ দোয়া পড়বে,

---

বিষয়টি হচ্ছে এ রকম, বান্দা যখন দ্বীন কিংবা দুনিয়ার কোন কল্যাণকর কাজ করার জন্য মনস্থির করল, তখন সে [তিয়ারার মাধ্যমে] এমন কিছু লক্ষ্য করল বা শুনতে পেলো যা তার কাছে অপছন্দনীয়, এমতাবস্থায় তার অন্তরে এর দু'রকমের প্রভাব পড়তে পারে, যার একটি অপরটির চেয়ে জটিল।

এক : বান্দা [তিয়ারাহ] এর মাধ্যমে তার লক্ষণীয় কিংবা শ্রুত বিষয় দ্বারা তাড়িত হয়ে তাকে কুলক্ষণ মনে করে মনস্থিরকৃত কাজটি পরিত্যাগ করবে অথবা এর বিপরীত কোন কাজ করবে।

এমতাবস্থায় সে এটাকে কুলক্ষণ মনে করে ভয়ে-সংকোচে মনস্থিরকৃত কাজটি করতে অক্ষম হবে। এর দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, একটি অনাকাংখিত জিনিসের সাথে তার অন্তরকে গভীরভাবে সম্পৃক্ত করে ফেলেছে এবং এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কাজও করেছে। তার ইচ্ছা, সংকল্প ও কাজের উপর অনাকাংখিত বিষয়টি ক্ষতিকর প্রভাব ফেলেছে। নিঃসন্দেহে এভাবে [তিয়ারাহ] তার ঈমানের উপর বিরাট ক্ষতিকর প্রভাব ফেলেছে এবং তার তাওহীদ ও তাওয়াক্কুলকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। অতঃপর এ

أللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك (أحمد)

"হে আল্লাহ, তোমার মঙ্গল ব্যতীত কোন মঙ্গল নেই। তোমার অকল্যাণ ছাড়া কোন অকল্যাণ নেই। আর তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। (আহমদ)

৮। ফজল বিন আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে طيرة [তিয়ারাহ] অর্থাৎ কুলক্ষণ হচ্ছে এমন জিনিস যা তোমাকে কোন অন্যায় কাজের দিকে ধাবিত করে অথবা কোন ন্যায় কাজ থেকে তোমাকে বিরত রাখে।" (আহমাদ)

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১। أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللهِ [জেনে রেখো তাদের দুর্ভাগ্য আল্লাহর কাছে নিহিত] এবং طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ [তোমাদের দুর্ভাগ্য তোমাদের সাথেই রয়েছে] এ আয়াত দু'টির ব্যাপারে সতর্কীকরণ।

২। সংক্রামক রোগের অস্বীকৃতি।

৩। কুলক্ষণের অস্বীকৃতি।

প্রশ্ন করা তোমার জন্য অবান্তর যে, উল্লেখিত বিষয়টি দ্বারা বান্দার অন্তরে দূর্বলতা, মাখলুকের প্রতি তার ভীতি, আসবাব [উপায়-উপকরণ] এবং আসবাব নয় এমন জিনিসের সাথে সম্পর্ক স্থাপন আর আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক কর্তনের ক্ষেত্রে কোন ধরনের অবস্থা তার মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে? [অর্থাৎ বিনা প্রশ্নে বান্দার মধ্যে 'তিয়ারাহর" প্রভাবে সব ধরনের ইসলামি আক্বীদা বিরোধী অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে।]

এটা মূলত: তাওহীদ ও তাওয়াক্কুলের দূর্বলতা এবং শিরকে পতিত হওয়ার পথ ও পদ্ধতি। সাথে সাথে এটা বান্দার বুদ্ধি-বিবেক হননকারী একটি কুসংস্কার।

দুই : বান্দা তার অনাকাংখিত দৃশ্য বস্তু বা শ্রুত কথা দ্বারা তাড়িত হয়ে তার ডাকে সাড়া দেবে। কিন্তু এমন অবস্থা দুশ্চিন্ত, দূর্ভাবনা ও অস্থিরতা সৃষ্টির মাধ্যমে তার অন্তরে খারাপ প্রভাব ফেলবে। এ বিষয়টি প্রথমটির নিম্ন পর্যায়ের হলেও বান্দার জন্য খুবই খারাপ ও ক্ষতিকর। সাথে সাথে এ অবস্থা নিঃসন্দেহে তার ঈমানকে দূর্বল করবে এবং তাওয়াক্কুলকে হালকা করে দেবে। আর যদি কোন অনাকাংখিত কিছু ঘটে যায়, তাহলে এর দ্বারা তার কুলক্ষণ বিষয়ক চিন্তা আরো শক্তিশালী হয়ে উঠবে। এভাবে

৪। দুর্ভাগ্যের ব্যাপারে অস্বীকৃতি [অর্থাৎ দুর্ভাগ্য বলতে ইসলামে কোন কিছু নেই]

৫। কুলক্ষণ 'সফর' এর অস্বীকৃতি জ্ঞাপন [অর্থাৎ কুলক্ষণে 'সফর মাস' বলতে কিছুই নেই। জাহেলি যুগে সফর মাসকে কুলক্ষুণ মনে করা হতো, ইসলাম এ ধারণাকে বাতিল ঘোষণা করেছে।]

৬। 'ফাল' উপরোক্ত নিষিদ্ধ বা অপছন্দনীয় জিনিসের অন্তর্ভূক্ত নয়। বরং এটা মোস্তাহাব।

৭। 'ফাল' এর ব্যাখ্যা।

পর্যায়ক্রমে হয়ত সে প্রথম বিষয়টিতে [অর্থাৎ শিরকে] পৌঁছে যেতে পারে।

উপরোক্ত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের দ্বারা এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, 'শারে' অর্থাৎ শরিয়তের বিধানদাতা 'তিয়ারাহ' [পাখি উড়িয়ে ভাগ্যের ভাল-মন্দ পরীক্ষা করাকে] কে জন্য অপছন্দ ও ঘৃণা করেছেন, আর কেনইবা একে তাওহীদ এবং তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী বলেছেন।

যে ব্যক্তিই এগুলোর মধ্য থেকে খারাপ কিছু লক্ষ করবে, আর প্রকৃতির কারণসমূহ তার উপর প্রবল হয়ে উঠার আশঙ্কা করবে, তার উচিত হচ্ছে তার আশঙ্কা দূর করার জন্য নফসের সাথে জিহাদ করা এবং এর জন্য আল্লাহর সাহায্য কামনা করা। অসুবিধা দূর করার জন্য কোন অবস্থাতেই সেদিকে মনোনিবেশ করা যাবে না।

২৯ তম অধ্যায়ঃ

জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কীয় শরীয়তের বিধান

ইমাম বুখারী রহ.) তাঁর সহীহ গ্রন্থে বলেছেন, কাতাদাহ রা. বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা এসব নক্ষত্ররাজিকে তিনটি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, আকাশের সৌন্দর্যের জন্য, আঘাতের মাধ্যমে শয়তান বিতাড়নের জন্য এবং [দিক ভ্রান্ত পথিকদের] নিদর্শন হিসেবে পথের দিশা পাওয়ার জন্য। যে ব্যক্তি এ উদ্দেশ্য ছাড়া এর ভিন্ন ব্যাখ্যা দেবে সে ভুল করবে এবং তার ভাগ্য নষ্ট করবে। আর এমন জটিল কাজ তার ঘাড়ে নিবে যে সম্পর্কে তার কোন জ্ঞানই থাকবে না।"

কাতাদাহ রা. চাঁদের কক্ষ সংক্রান্ত বিদ্যার্জন অর্থাৎ জ্যোতির্বিদ্যা অপছন্দ করতেন। আর উ'য়াইনা এ বিদ্যার্জনের অনুমতি দেননি। উভয়ের কাছ থেকে হারব রহ.) একথা বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদ এবং ইসহাক রহ.) [চাদের] কক্ষপথ জানার অনুমতি দিয়েছেন।

আবু মুসা আশআরী রা. থেকে বর্ণিত আছে, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

---

ব্যাখ্যা

জ্যোতির্বিদ্যা দু'প্রকারঃ এক প্রকার জ্যোতির্বিদ্যাকে বলা হয় علم التاثير [ইলমুত্তাছীর]। আর তা হচ্ছে, আকাশের বিভিন্ন অবস্থা থেকে জাগতিক ঘটনাবলীর প্রমান বা ফয়সালা গ্রহণ করা। এটা সম্পূর্ণ বাতিল। সাথে সাথে যে 'ইলমে গায়েবের' একচ্ছত্র মালিক আল্লাহ, এ জ্ঞান দ্বারা তাঁরাই অংশীদারিত্বের দাবি করা হয় অথবা উক্ত জ্ঞানের দাবীদারকে সত্য বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়। এ জ্ঞানের মধ্যে মিথ্যা দাবি, গাইরুল্লাহর সাথে অন্তরের সম্পর্ক এবং মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির বিপর্যয় থাকার কারণে এটা [জ্যোতির্বিদ্যা] তাওহীদের পরিপন্থী। কেননা বাতিল পথ অবলম্বন করা এবং তা সমর্থন করা মানুষের বুদ্ধি-বিবেক ও ধর্মীয় বিপর্যয়ের শামিল। দ্বিতীয় প্রকার জ্যোতির্বিদ্যা হচ্ছে علم التسيير [ইলমুত্তাসয়ীর] আর 'ইলমুত্তাসয়ীর হচ্ছে চন্দ্র,

ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. (رواه أحمد وابن حبان في صحيحه)

তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না,

১। মাদকাসক্ত ব্যক্তি ২। আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী এবং ৩। যাদুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী। (আহমাদ, ইবনু হিব্বান)

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়:

১। নক্ষত্র সৃষ্টির রহস্য।

২। নক্ষত্র সৃষ্টির ভিন্ন উদ্দেশ্য বর্ণনাকারীর সমুচিত জবাব প্রদান।

৩। কক্ষ সংক্রান্ত বিদ্যার্জনের ব্যাপারে মতভেদের উল্লেখ।

৪। যাদবাতিল জানা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি যাদুর অন্তর্ভুক্ত সামান্য জিনিসেও বিশ্বাস করবে, তার প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারি।

সূর্য ও নক্ষত্রের সাহায্যে কেবলা, সময় এবং দিক নির্ণয়ের ব্যাপারে প্রমাণ গ্রহণ করা। এ ধরনের বিদ্যা কোন দোষের নয় বরং এর অধিকাংশই উপকারী।

এ ধরনের বিদ্যা যদি ইবাদতের সময় জানা অথবা দিক নির্ণয়ের উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তাহলে “শারে” অর্থাৎ শরিয়তের বিধানদাতা এতে উৎসাহ প্রদান করেছেন।

অতএব, ‘শারে’ এ বিদ্যার কোনটি নিষেধ করেছেন আর কোনটি হারাম ঘোষণা করেছেন, আবার কোনটিকে মুবাহ, মোস্তাহাব অথবা ওয়াজিব করে দিয়েছেন; এগুলোর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় অত্যাবশ্যক। উল্লেখিত প্রথম প্রকারের জ্যোতির্বিদ্যা তাওহীদের পরিপন্থী। দ্বিতীয় প্রকারের জ্যোতির্বিদ্যা তাওহীদের পরিপন্থী নয়।

৩০ তম অধ্যায় :

নক্ষত্রের ওসিলায় বৃষ্টি কামনা করা

১। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন,

وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. (الواقعة : ٨٢)

"তোমরা [নক্ষত্রের মধ্যে তোমাদের] রিজিক নিহত আছে মনে করে আল্লাহর নেয়ামতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছ।" (ওয়াকেয়া . ৮২)

২। আবু মালেক আশআ'রী রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والإستسقاء بالنجوم، والنياحة وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من حرب. (رواه مسلم)

'জাহেলি যুগের চারটি কুস্বভাব আমার উম্মতের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে, যা তারা পুরোপুরি পরিত্যাগ করতে পারবে না। এক : আভিজাত্যের অহংকার করা। দুই : বংশের বদনাম গাওয়া। তিন : নক্ষত্রের মাধ্যমে বৃষ্টির পানি কামনা করা এবং চার : মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা।

ব্যাখ্যা

নক্ষত্রের ওসীলায় বৃষ্টি কামনা করা

নেয়ামত লাভ করা এবং বিপদাপদ দূর করার ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর একচ্ছত্র ক্ষমতাকে স্বীকার করে নেয়া, সাথে সাথে কথা ও কাজে তাঁরই আনুগত্য করা যখন তাওহীদের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তখন 'অমুক অমুক নক্ষত্রের ওসীলায় বা বরকতে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে' এ ধরনের কথা বলা 'তাওহীদের' সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

তিনি আরো বলেন, 'মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ কারিণী তার মৃত্যুর পূর্বে যদি তাওবা না করে, তবে কেয়ামতের দিন তেল চিট-চিটে জামা আর মরিচা ধরা বর্ম পরিধান করে উঠবে।' (মুসলিম)

৩। ইমাম বুখারী ও মুসলিম যায়েদ বিন খালেদ রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, 'তিনি বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুদাইবিয়াতে আমাদেরকে নিয়ে ফজরের নামাজ পড়লেন। সে রাতে আকাশটা মেঘাচ্ছন্ন ছিল।' নামাজান্তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদের দিকে ফিরে বললেন,

هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا : الله ورسوله أعلم، قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب.

"তোমরা কি জানো তোমাদের প্রভু কি বলেছেন? লোকেরা বলল, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।' তিনি বললেন, 'আল্লাহ বলেছেন, আমার বান্দাদের মধ্যে কেউ আমার প্রতি ঈমানদার হিসেবে আবার কেউ কাফের হিসেবে সকাল অতিবাহিত করল। যে ব্যক্তি বলেছে, 'আল্লাহর ফজল ও রহমতে বৃষ্টি হয়েছে, সে আমার প্রতি ঈমান এনেছে আর নক্ষত্রকে অস্বীকার করেছে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বলেছে, 'অমুক অমুক নক্ষত্রের 'ওসীলায়' বৃষ্টিপাত হয়েছে, সে আমাকে অস্বীকার করেছে আর নক্ষত্রের প্রতি ঈমান এনেছে।"

কেননা এখানে বৃষ্টিকে নক্ষত্রের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। অথচ এখানে অপরিহার্য করণীয় ছিল, বৃষ্টি ও অন্যান্য নেয়ামতকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করা। কেননা তিনিই তাঁর বান্দাকে স্বীয় করুণা দ্বারা ধন্য করেন।

তারপর কথা হচ্ছে নক্ষত্র কোন দিক থেকে বৃষ্টি বর্ষণের কারণ হতে পারে না বরং এর প্রকৃত কারণ হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার অপরিসীম রহমত এবং বান্দার

ইমাম বুখারী ও মুসলিম আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে এ অর্থেই হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাতে এ কথা আছে যে, কেউ কেউ বলেছেন, 'অমুক অমুক নক্ষত্র সত্য প্রমাণিত হয়েছে।' তখন আল্লাহ তাআলা আয়াত নাজিল করেন,

فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ إلى قوله تعالى تُكَذِّبُونَ

"আমি নক্ষত্র রাজির [অস্তমিত হওয়ার] স্থানসমূহের কসম করে বলছি, ... তোমরা মিথ্যাচারিতায় মগ্ন রয়েছো।" (ওয়াকিয়া : ৭৫-৮২)

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১। সূরা ওয়াকেয়ার উল্লেখিত আয়াতের তাফসীর।

২। জাহেলি যুগের চারটি স্বভাবের উল্লেখ।

৩। উল্লেখিত স্বভাবগুলোর কোন কোনটির কুফরি হওয়া উল্লেখ।

৪। এমন কিছু কুফরি আছে যা মুসলিম মিল্লাত থেকে একে বারে নিঃশ্চিহ্ন হবে না।

৫। 'বান্দাদের মধ্যে কেউ আমার প্রতি বিশ্বাসী আবার কেউ অবিশ্বাসী হয়েছে' এ বাণীর উপলক্ষ হচ্ছে আল্লাহ তাআলার নেয়ামত [বৃষ্টি] নাজিল হওয়া।

৬। এ ব্যাপারে ঈমানের জন্য মেধা ও বিচক্ষণতা প্রয়োজন।

প্রয়োজনে বান্দারা তাদের অবস্থা ও কথার মাধ্যমে তাদের রবের কাছে বৃষ্টির জন্য দোয়া করলে তিনি তাদের উপর স্বীয় রহমত ও হিকমতের মাধ্যমে যথা সময় তাদের প্রয়োজন মোতাবেক বৃষ্টি বর্ষণ করবেন।

অতএব বান্দার তাওহীদ ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার নিজের উপর এবং সমগ্র সৃষ্টির উপর আল্লাহ তাআলার জাহেরী ও বাতেনী অসংখ্য

৭। এ ক্ষেত্রে কুফরি থেকে বাঁচার জন্য বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার প্রয়োজন।

৮। لقد صدق نوء كذا وكذا [অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাব সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে] এর মর্মার্থ বুঝতে হলে জ্ঞান-বুদ্ধি প্রয়োজন।

৯। তোমরা জানো কি 'তোমাদের রব কি বলেছেন?' এ কথা দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, কোন বিষয় শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষক ছাত্রকে প্রশ্ন করতে পারেন।

১০। মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপকারিণীর জন্য কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ।

নেয়ামতের স্বীকৃতি প্রদান করে, সাথে সাথে এসব নেয়ামতকে তাঁর সাথে সম্পৃক্ত করে এবং এর মাধ্যমে তাঁর ইবাদত, জিকির ও শুকরিয়ার জন্য তাঁরই সাহায্য কামনা করে।

এ বিষয়টি হচ্ছে তাওহীদকে নিশ্চিতভাবে মেনে নেয়ার মোক্ষম পন্থা। এর সাহায্যে ঈমানের পূর্ণতা ও অপূর্ণতা নির্ণয় করা যায়।

৩১ তম অধ্যায় :

১। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِّ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِّ. (البقرة: ١٦٥)

"মানুষের মধ্যে এমন মানুষও রয়েছে যারা আল্লাহ ব্যতীত অপরকে সদৃশ স্থির করে, আল্লাহকে ভালোবাসার ন্যায় তাদেরকে ভালোবাসে।"। (বাকারা : ১৬৫)

২। আল্লাহ তা আলা আরো এরশাদ করেছেন,

قُلْ إِنْ كَانَ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا

وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِّ وَرَسُولِهِ (التوبة: ٢٤)

"হে রাসূল, আপনি বলে দিন, 'যদি তোমাদের মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি, ভাই-বোন, তোমাদের স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ঐ ব্যবসা যার লোকসান হওয়াকে তোমরা অপছন্দ করো, তোমাদের পছন্দনীয় বাড়ি-ঘর, তোমাদের নিকট আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং তাঁরই পথে জিহাদ করার চেয়ে বেশি প্রিয় হয়, তাহলে তোমরা আল্লাহর চূড়ান্ত ফয়সালা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো।" (তাওবা : ২৪)

ব্যাখ্যা

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِّ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِّ

"মানুষের মধ্যে এমন মানুষও রয়েছে যারা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরিক করে, আর তোমাদেরকে আল্লাহর মতো ভালোবাসে।"

তাওহীদের মর্মবাণী ও প্রাণ সত্তা হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহর জন্যই ভালোবাসাকে একনিষ্ঠ করা [অর্থাৎ খুলুসিয়াতের সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আল্লাহকে ভালোবাসা] আর এটাই হচ্ছে তাঁর উলুহিয়্যাত এবং উবুদিয়্যাতের মূল ভিত্তি মূলতঃ

৩। সাহাবী আনাস রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. (أخرجاه)

"তোমাদের মধ্যে ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা এবং সমস্ত মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় হই।" (বুখারী ও মুসলিম)

৪। আনাস রা. থেকে আরো বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

ثلاث من كن فيه وجدبهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار.

"যার মধ্যে তিনটি জিনিস বিদ্যমান আছে সে ব্যক্তি এগুলো দ্বারা

এটাই হচ্ছে ইবাদতের হাকিকত বা মর্মকথা। স্বীয় রবের প্রতি বান্দার ভালোবাসা যতক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ না হবে, সকল বস্তুর উপর তাঁর [আল্লাহর] ভালোবাসা প্রবল, অধিক এবং শক্তিশালী না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার তাওহীদ পরিপূর্ণ হবে না। বান্দার যাবতীয় ভালোবাসার বিষয় আল্লাহর ভালোবাসার অধীন হতে হবে। এ ভালোবাসার মধ্যেই নিহিত আছে বান্দার শান্তি ও সফলতা।

বিভিন্ন প্রকার ভালোবাসার মধ্যে সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ ভালোবাসা হচ্ছে, আল্লাহর জন্য ভালোবাসা। অতএব বান্দা এমন কার্যাবলী পছন্দ করবে, যা আল্লাহ পছন্দ করেন, এমন ব্যক্তিকে ভালোবাসবে, যাকে আল্লাহ ভালোবাসেন, এমন কাজকে ঘৃণা করবে যা আল্লাহ ঘৃণা করেন, এমন ব্যক্তিদেরকে ঘৃণা করবে, যাদেরকে আল্লাহ ঘৃণা করেন। অনুরূপভাবে সে আল্লাহর বন্ধুদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, এবং তাঁর শত্রুদের শত্রু মনে করবে। এর দ্বারাই বান্দার ঈমান ও তাওহীদ পরিপূর্ণ হবে।

আল্লাহর সাথে কোন সৃষ্টিকে শরিক করা, আল্লাহকে ভালোবাসার মতই তাকে।

ঈমানের স্বাদ অনুভব করতে পেরেছে। এক : তার কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সর্বাধিক প্রিয় হওয়া। দুই : একমাত্র আল্লাহ তাআলার [সন্তুষ্টি লাভের] জন্য কোন ব্যক্তিকে ভালোবাসা। তিন : আল্লাহ তাআলা তাকে কুফরি থেকে উদ্ধার করার পর পুনরায় কুফরির দিকে প্রত্যাবর্তন করা তার কাছে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতই অপছন্দনীয় হওয়া।

অন্য একটি বর্ণনায় আছে لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى........

অর্থাৎ কেউ ঈমানের স্বাদ পাবে না যতক্ষণ না .... (হাদিসের শেষ পর্যন্ত।]

৬। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালোবাসে, আল্লাহর উদ্দেশ্যেই ঘৃণা করে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করে, আল্লাহর জন্যই শত্রুতা পোষণ করে; সে ব্যক্তি এ বৈশিষ্ট্যের দ্বারা নিশ্চয়ই আল্লাহর বন্ধুত্ব লাভ করবে। আর এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া ব্যতীত নামাজ রোজার পরিমাণ যত বেশিই হোক না কেন, কোন বান্দাই ঈমানের স্বাদ অনুভব করতে পারবে না।

ভালোবাসা, আল্লাহর আনুগত্যের ঊর্ধ্বে তাদের আনুগত্যকে প্রাধান্য দেয়া, জিকির ও দোয়ার মাধ্যমে সৃষ্টির প্রতি ধ্যান-মগ্ন হওয়া শিরকে আকবারের অন্তর্ভূত। এ শিরক আল্লাহ তাআলা [তাওবা ব্যতীত] মাফ করবেন না। এ ধরনের শিরকে লিপ্ত ব্যক্তির অন্তর মহা-পরাক্রমশালী ও গুণধর আল্লাহর জিম্মা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং ক্ষমতাহীন দুর্বল গাইরুল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক স্থাপিত হয়, এ দুর্বল ও অর্থহীন বিষয়টির সাথেই মুশরিকদের সম্পর্ক। কেয়ামতের দিন এ সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। [অথচ তাদের ধারণা মতে জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য] এ সম্পর্ক তাদের জন্য সেদিন খুবই প্রয়োজন হবে। কিন্তু শিরক সম্পর্কিত দুনিয়ার ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব সেদিন ঘৃণা ও শত্রুতায় পর্যবসিত হবে।

মুহাব্বত ও ভালোবাসা তিন প্রকার :

এক : আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা। এ ভালোবাসা হচ্ছে ঈমান ও তাওহীদের মূল ভিত্তি।

দুই : আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালোবাসা। এ ভালোবাসা হচ্ছে আল্লাহ তাআলার নবী-রাসূল এবং তাদের অনুসারীদেরকে ভালোবাসা। এমনিভাবে আল্লাহ তাআলা যে

সাধারণত: মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে পার্থিব স্বার্থ। এ জাতীয় ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের দ্বারা কোন উপকার সাধিত হয় না। (ইবনে জারির)

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন وتقطعت بهم الأسباب

অর্থাৎ তাদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এ সম্পর্ক হচ্ছে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার সম্পর্ক।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১ সূরা বাকারার ১৬ নং আয়াতের তাফসীর।

২। সূরা তাওবার ২৪ নং আয়াতের তাফসীর।

৩। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি ভালোবাসাকে জীবন, পরিবার ও ধন-সম্পদের উপর অগ্রাধিকার দেয়া ওয়াজিব।

৪। কোন কোন বিষয় এমন আছে যা ঈমানের পরিপন্থী হলেও এর দ্বারা ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাওয়া বুঝায় না। [এমতাবস্থায় তাকে অপূর্ণাঙ্গ মোমিন বলা যেতে পারে]।

৫। ঈমানের একটা স্বাদ আছে। মানুষ কখনো এ স্বাদ অনুভব করতেও পারে, আবার কখনো অনুভব নাও করতে পারে।

সব কার্যকলাপ, কাল [যুগ-জমানা] ও স্থানকে ভালোবাসেন বা পছন্দ করেন, সেগুলোকে ভালোবাসা। এ ভালোবাসা আল্লাহর [প্রতি] ভালোবাসার অধীন এবং পরিপূরক।

তিন : আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ভালোবাসা, যেমন গাছ, পাথর, মানুষ, ফিরিস্তি প্রভৃতির প্রতি মুশরিকদের ভালোবাসা। এ ভালোবাসাই হচ্ছে শিরকের মূল ভিত্তি।

চার : আরো এক প্রকার ভালোবাসা আছে যা স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক। যেমন খাদ্য, পানীয়, বিয়ে-শাদি, পোশাক-পরিচ্ছদ, বন্ধু-বান্ধব ইত্যাদির প্রতি বান্দার সংগতিপূর্ণ এবং স্বাভাবিক ভালোবাসা। এ ভালোবাসা শরীয়ত সম্মত। এটা যদি আল্লাহর

৬। অন্তরের এমন চারটি আমল আছে যা ছাড়া আল্লাহর বন্ধুত্ব ও নৈকট্য লাভ করা যায় না, ঈমানের স্বাদ ও অনুভব করা যায় না।

৭। একজন প্রখ্যাত সাহাবী দুনিয়ার এ বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে, পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব সাধারণত গড়ে উঠে পার্থিব বিষয়ের ভিত্তিতে।

৮। وتقطعت بهم الأسباب এর তাফসীর।

৯। মুশরিকদের মধ্যেও এমন লোক রয়েছে যারা আল্লাহকে খুব ভালোবাসে [কিন্তু শিরকের কারণে এ ভালোবাসা অর্থহীন।]

১০। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করে এবং ঐ শরিককে আল্লাহকে ভালোবাসার মতই ভালোবাসে সে শিরকে আকবার অর্থাৎ বড় ধরনের শিরক করল।

এবং তাঁর আনুগত্যের জন্য সহায়ক হয়, তাহলে ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি আল্লাহর আনুগত্যের পথে এ ভালোবাসা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় এবং আল্লাহর অপছন্দনীয় কোন কাজের ওসীলা [উপায়] হয়ে যায়, তাহলে তা শরীয়ত নিষিদ্ধ বা অবৈধ ভালোবাসা হিসেবে গণ্য হবে। অন্যথায় তা মোবাহ বা বৈধ বলে বিবেচিত হবে।

৩২ তম অধ্যায় :

আল্লাহর ভয়

১। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿آل عمران: ١٧٥﴾

"এরা হলো শয়তান, যারা তোমাদেরকে তার বন্ধুদের (কাফের বেঈমান) দ্বারা ভয় দেখায়। তোমরা যদি প্রকৃত মোমেন হয়ে থাকো। তাহলে তাদেরকে [শয়তানের সহচরদেরকে] ভয় করো না বরং আমাকে ভয় করো।" (আল ইমরান . ১৭৫)

২। আল্লাহ তাআলা আরো এরশাদ করেছেন,

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِّ مَنْ آمَنَ بِاللهِّ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللهَّ . (التوبة: ١٨)

"আল্লাহর মসজিদগুলোকে একমাত্র তারাই আবাদ করতে পারে যারা আল্লাহ এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে, নামাজ কায়েম করে, জাকাত

ব্যাখ্যা

গ্রন্থকার এ অধ্যায়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অনুকরণ করার জন্য সন্নিবেশিত করেছেন। আর তা হচ্ছে, ভয়ের সম্পর্ক একমাত্র আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পৃক্ত থাকা অত্যাবশ্যক। মাখলুকের সাথে এর সম্পর্ক থাকা নিষিদ্ধ। আর আল্লাহর সাথে ভয়-ভীতির সম্পর্ক ব্যতীত তাওহীদ পরিপূর্ণ হয় না।

এখানে বিষয়টির বিশদ বিবরণ ও ব্যাখ্যা প্রয়োজন, যাতে বিষয়টি পাঠকদের কাছে আরো সুস্পষ্ট হয় এবং এ ব্যাপারে যাবতীয় সংশয়ের নিরসন হয়।

এটা জেনে রাখা অত্যাবশ্যক যে, বিভিন্ন কারণ ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদির পরিপ্রেক্ষিতে ভয়-ভীতি কখনো ইবাদতে পরিণত হয়, আবার কখনো তা স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক বলে গণ্য হয়।

আদায় করে এবং একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না।" (তাওবা : ১৮)

৩। আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে এরশাদ করেছেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ

(العنكبوت: ١٠)

"মানুষের মধ্যে এমন কিছু মানুষ আছে যারা বলে, আমরা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি। এরপর যখন আল্লাহর পথে তারা দুঃখ কষ্ট পায় তখন মানুষের চাপানো দুঃখ কষ্টের পরীক্ষাকে তারা আল্লাহর আজাবের সমতুল্য মনে করে।" (আনকাবূত : ১০)

৪। আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে 'মারফু' হাদিসে বর্ণিত আছে, ঈমানের দুর্বলতা হচ্ছে আল্লাহ তাআলাকে অসন্তুষ্ট করে মানুষকে সন্তুষ্ট করা, আল্লাহর রিজিক ভোগ করে মানুষের গুণগান করা, তোমাকে আল্লাহ যা দান করেননি তার ব্যাপারে মানুষের বদনাম করা। কোন লোভীর লোভ আল্লাহর রিজিক টেনে আনতে পারে না। আবার কোন ঘৃণা কারীর ঘৃণা আল্লাহর রিজিক বন্ধ করতে পারে না।

যাকে ভয় করা হয়, ভয়-ভীতি যদি তার ইবাদত বন্দেগি ও দাসত্ব করার জন্য হয়, তারই নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে হয়, এবং তারই আনুগত্য করা আর নাফরমানি থেকে বেঁচে থাকার কারণ হয়, তাহলে এ ভয়ের সম্পর্ক আল্লাহর সাথে হওয়াই ঈমানের সবচেয়ে বড় দাবি। এ সম্পর্ক গাইরুল্লাহর সাথে হওয়া শিরকে আকবার, যা আল্লাহ তাআলা [তাওবা ব্যতীত] মাফ করবেন না। কারণ এমতাবস্থায় বান্দা আল্লাহর সাথে গাইরুল্লাহর এমন একটি ইবাদতের সাথে শরিক করল, যা অন্তরের সবচেয়ে বড় দায়িত্বপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ দায়িত্ব অবহেলার কারণে কোন কোন সময় আল্লাহর ভয়ের চেয়ে গাইরুল্লাহর ভয় [বান্দার মধ্যে] প্রবল হয়ে উঠে।

যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহকেই ভয় করবে, সে ব্যক্তিই খালেস তাওহীদবাদী। আর যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহকে ভয় করল, সে ভয়-ভীতির ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে অন্যকে শরিক করল, যেমনিভাবে মুহব্বতের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্যকে শরিক করল। কোন কবর বাসীকে এই ভেবে ভয় করা যে, ভয় না করলে হয়তো তার কোন ক্ষতি করে ফেলবে, অথবা তার উপর কবর বাসী রাগান্বিত হয়ে তার কাছ থেকে

৫। আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

من التمس رضا الله بسخط الناس، رضي الله عنه، وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله، سخط الله عليه، وأسخط الله عليه، وأسخط عليه الناس.

(رواه ابن حبان في صحيحه)

"যে ব্যক্তি মানুষকে নারাজ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি চায়, তার উপর আল্লাহর সন্তুষ্ট থাকেন, আর মানুষকেও তার প্রতি সন্তুষ্ট করে দেন।
পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহকে নারাজ করে মানুষের সন্তুষ্টি চায়, তার উপর আল্লাহও অসন্তুষ্ট হন এবং মানুষকেও তার প্রতি অসন্তুষ্ট করে দেন। (ইবনে হিব্বান)

এ অধ্যায় থেকে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলো জানা যায় :

১। সূরা আল-ইমরানের ১৭৫ নং আয়াতের তাফসীর।
২। সূরা তাওবার ১৮ নং আয়াতের তাফসীর।
৩। সূরা আনকাবুতের ১০ নং আয়াতের তাফসীর।
৪। ঈমান শক্তিশালী হওয়া আবার দুর্বল হওয়া সংক্রান্ত কথা।

কোন নেয়ামত ছিনিয়ে নিবে, এ ধরনের ভয় শিরক। কবর পূজারিদের মধ্যে মূলতঃ এ বিশ্বাসই বিদ্যমান রয়েছে।

ভয় যদি স্বভাবজাত এবং প্রাকৃতিক হয়, যেমন শত্রু, হিংস্র প্রাণী, সাপ ইত্যাদিকে ভয় করা, কারণ এগুলো দ্বারা বাহ্যিক অনিষ্টতা ও ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে, তাহলে তা [প্রাকৃতিক ও স্বভাবজাত ভয়] ইবাদতের মধ্যে গণ্য নয়। এ ধরনের ভয় প্রায় সব মোমিন লোকদের মধ্যেই রয়েছে। এ ভয় ঈমানের পরিপন্থী নয়। এ ভয়ের পিছনে যদি কোন সংগত কার্যকারণ নিহিত থাকে, তাহলে এ ভয়ে কোন দোষ নেই। আর যদি এ ভয় অবাস্তব ও কাল্পনিক হয় যেমন অহেতুক ভিত্তিতে কোন ভয়, অথবা যে ভয়ের পিছনে কোন দুর্বল কারণ নিহিত রয়েছে, তাহলে এ জাতীয় ভয় খুবই দূষণীয়। যার মধ্যে এ জাতীয় ভয়ের অস্তিত্ব আছে সে কাপুরুষ বলে গণ্য। নবী করিম সাহাবী এ ধরনের ভীতি ও কাপুরুষতা থেকে আল্লাহর কাছে পানা চেয়েছেন।

৩৩ তম অধ্যায় .

তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর উপর ভরসা

১। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

وَعَلَى اللهِّ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿المائدة: ٢٣﴾

"তোমরা যদি মোমিন হয়ে থাকো, তাহলে একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা করো।" (মায়েদা : ২৩)

২। আল্লাহ তাআলা আরো এরশাদ করেছেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُّ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. (الانفال: ٢)

"একমাত্র তারাই মোমিন যাদের সামনে আল্লাহর কথা স্মরণ করা হলে তাদের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হয়।" (আনফাল . ২)

ব্যাখ্যা

আল্লাহর বাণী وَعَلَى اللهِّ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

আল্লাহর উপর ভরসা করা তাওহীদ ও ঈমানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দাবি। আল্লাহ তাআলার উপর বান্দার তাওয়াক্কুল বা ভরসার ভিত্তিতেই ঈমান বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী হয় এবং তাওহীদ পরিপূর্ণ হয়। বান্দা তার দীন ও দুনিয়ার ব্যাপারে যা করতে চায় কিংবা পরিত্যাগ করতে চায় তার প্রতিটি কাজে আল্লাহর উপর ভরসা করতে এবং তাঁর কাছে সাহায্য কামনা করতে বাধ্য। [কারণ বান্দা আল্লাহর কাছে সর্বাবস্থাতেই দুর্বল ও মুখাপেক্ষী।]

আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করার মর্মার্থ হচ্ছে, বান্দা অবশ্যই জেনে রাখবে যে, আল্লাহ তাআলাই হচ্ছেন সমস্ত বিষয়ের একচ্ছত্র মালিক, আল্লাহ যা চান তাই হয়। যা

৩। আল্লাহ তাআলা অন্য এক আয়াতে এরশাদ করেছেন,

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِّ فَهُوَ حَسْبُهُ. (الطلاق: ٣)

" যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্য আল্লাহ তাআলাই যথেষ্ট।" (সূরা তালাক . ৩)

৪। ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

حسبنا الله ونعم الوكيل এ কথা ইবরাহীম আ. তখন বলেছিলেন, যখন তাঁকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। আর মুহাম্মদ সাহাবী একথা বলেছিলেন তখন, যখন তাঁকে বলা হলো,

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا .

" লোকেরা আপনাদের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী বাহিনী জড়ো করেছে। অতএব তাদেরকে ভয় করুন। তখন তাঁদের ঈমান আরো বৃদ্ধি গেলো"। (আল-ইমরান: ১৭৩)।

চান না তা হয় না। একমাত্র তিনিই কল্যাণ দান করেন, আবার কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করেন। তিনিই দানকারী আবার দানের পথ রোধকারী। একমাত্র আল্লহই হচ্ছেন ক্ষমতা ও শক্তির আধার।

এ জ্ঞান অর্জনের পর বান্দা তাঁর অন্তর দিয়ে তার দীন ও দুনিয়ার উপকার ও কল্যাণ সাধন এবং কোন অনিষ্টতা দূর করার ব্যাপারে তার স্বীয় রবের উপর পূর্ণ আস্থা রাখবে। এ বিশ্বাসের পাশাপাশি বান্দা কল্যাণকর কাজের উপায় উপকরণগুলো কাজে লাগাতে চেষ্টা করবে।

যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দার মধ্যে এ সম্পর্কিত জ্ঞান, আত্মনির্ভরশীলতা এবং আস্থা বিদ্যমান থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে সত্যিকার অর্থে আল্লহর উপর ভরসাকারী হিসেবে বিবেচিত হবে। তার জন্য সুসংবাদ হচ্ছে এই যে, আল্লহ তাআলাই তার জন্য যথেষ্ট এবং তার জন্য রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে উত্তম পুরস্কারের ওয়াদা। ভরসার [বা

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় .

১। আল্লাহর উপর ভরসা ফরজ।

২। আল্লাহর উপর ভরসা করা ঈমানের শর্ত।

৩। সূরা আনফালের ২নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

৪। আয়াতটির তাফসীর, শেষাংশেই রয়েছে।

৫। সূরা তালাকের ৩ নং আয়াতের তাফসীর।

৬। حسبنا لله نعم و الوكيل কথাটি ইবরাহীম আ. ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালম বিপদের সময় বলার কারণে এর গুরুত্ব ও মর্যাদা।

তাওয়াক্কুলের] সম্পর্ক যখনই গাইরুল্লহর সাথে হবে তখনই সে মুশরিক হিসেবে গণ্য হবে। যে ব্যক্তি গাইরুল্লহর উপর ভরসা করল, গাইরুল্লহর সাথে তা সম্পৃক্ত করল, সে ব্যক্তি নিজেকে তার কাছে [গাইরুল্লহর কাছে] সোপর্দ করল, ফলে তার কামনা ও বাসনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো।

৩৪ তম অধ্যায় .

১। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. ﴿الاعراف: ٩٩﴾

"তারা কি আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত [নির্ভয়] হয়ে গেছে? বস্তুত: আল্লহর পাকড়াও থেকে বাঁচার ব্যাপারে একমাত্র

ব্যাখ্যা

আল্লাহ তাআলার বাণী : أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللهِ

"তারা কি আল্লহর পাকড়াও এর ব্যাপারে নিরাপদ হয়ে গিয়েছে।"

এ অধ্যায়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে, একটি মহা সূত্রকে উপলব্ধি করা। আর তা হচ্ছে, 'আল্লহকে ভয় করা বান্দার অপরিহার্য কর্তব্য।' আশা- আকাঙ্ক্ষা এবং ভয়-ভীতি; এ উভয় গুণের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর দয়া ও করুণা প্রত্যাশা করবে। বান্দা যদি স্বীয় গুনাহর দিকে লক্ষ করে এবং সাথে সাথে আল্লহর ন্যায় বিচার ও কঠিন শাস্তির প্রতি খেয়াল করে তাহলে সে তার রবকে ভয় করবেই। আবার বান্দা যদি আল্লহর সাধারণ ও বিশেষ করুণা, দয়া, ব্যাপক ক্ষমা ও মার্জনার দিকে তাকায় তাহলে তাঁর কাছে পাওয়ার জন্য আশান্বিত ও লালায়িত হবেই। আল্লাহ তাআলা যদি তাকে আনুগত্যের শক্তি দেন, তাহলে সে তার আনুগত্যের মাধ্যমে পরিপূর্ণ অনুগ্রহ ও করুণা লাভের আশঙ্কা করবে। আবার স্বীয় ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে উক্ত নেয়ামত চলে যাওয়ার আশঙ্কাও করবে। যদি কোন গুনাহর দ্বারা সে পরীক্ষিত হয় [অর্থাৎ শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে কোন গুনাহর কাজ করেই ফেলে] তাহলে আল্লহর কাছে তাওবা কবুল হওয়া এবং গুনাহ মাফ হওয়ার আশা ও আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। আবার তাওবা করতে অবহেলা করার কারণে এবং স্বীয় গুনাহর কারণে তাকে শাস্তি দেয়া হবে, এ ভয়ও করে। এমনিভাবে নেয়ামতও স্বাচ্ছন্দ্যের সময় আল্লহর কাছে নেয়ামতের স্থায়িত্ব ও আধিক্যের আশা করে। সাথে সাথে এর শুকরিয়া জ্ঞাপনের জন্য তাঁর তাওফীক কামনা করে। আবার স্বীয় অবহেলা ও না-শুকরী করার কারণে আল্লহর নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কাও করে। দুঃখ-দুর্দশার সময় বান্দা আল্লহর কাছে এর অবসান কামনা করে এবং দূরাবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রহর গুণতে থাকে। বিপদে ধৈর্য ধারণ করার সময় [মোমিন বান্দা] আল্ল-হর কাছে এ কামনাই করে, তিনি যেন তাকে বিপদের মধ্যে অটল ও অবিচল রাখেন। আবার বিপদে ধৈর্য ধারণে অক্ষম হলে কাঙ্ক্ষিত পুরস্কার

হতভাগ্য ক্ষতিগ্রস্ত ছাড়া অন্য কেউ ভয়-হীন হতে পারে না।” (আরাফ: ৯৯)।

২। আল্লাহ তাআলা আরো এরশাদ করেছেন,

وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. (ألحجر:٥٦)

“একমাত্র পথভ্রষ্ট লোকেরা ছাড়া স্বীয় রবের রহমত থেকে আর কে নিরাশ হতে পারে? (সূরা হিজর : ৫৬)

থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং অনাকাঙিক্ষত দুঃখে পতিত হওয়ার আশঙ্কাও করে, তাই তাওহীদবাদী মোমিন বান্দা সর্বাবস্থায় ভয় এবং আশা এ দুটি জিনিসের মধ্যেই বেঁচে থাকে। মুলতঃ এটাই তার করণীয়, এটাই তার জন্য কল্যাণকর। এর মাধ্যমেই তার শান্তি আসবে।

দু’টি খারাপ স্বভাব বান্দার জন্য ভয়ের কারণ। একটি হচ্ছে, আল্লহর ভয় বান্দাহকে এমনভাবে পেয়ে বসা, যার কারণে সে তাঁর রহমত ও দয়া থেকে নিরাশ ও হতাশ হয়ে পড়ে।

আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, আল্লাহর প্রতি বান্দা এত বেশি মাত্রায় আশাবাদী হয়ে পড়া, যার ফলে তাঁর শাস্তি ও পাকড়াও থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করে।

যখন বান্দা উপরোক্ত অবস্থায় উপনীত হয় তখন আশা ও ভয়ের দাবি অনুযায়ী বান্দার দায়িত্ব ও কর্তব্যের অনুভূতি বিলুপ্ত হয়ে যায়। অথচ এ দুটি বিষয়ই তাওহীদের সব চেয়ে বড় ভিত্তি এবং ঈমানের জন্য অপরিহার্য বিষয়।

আল্লহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া এবং তাঁর দয়া, ক্ষমা ও করুণা থেকে বঞ্চিত হওয়ার দুটি কারণ আছে। প্রথমটি হচ্ছে, বান্দা অত্যধিক গুনাহর দ্বারা নিজের উপর জুলুম করা, বেপরোয়াভাবে অন্যায় ও পাপাচারিতায় লিপ্ত থাকা এবং সাথে সাথে আল্লহর রহমতের পরিপন্থী কারণগুলোর উপর অনঢ় থাকা। ফলে তাঁর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যাওয়া। এমতাবস্থা চলতে থাকার কারণে পাপাচারিতাই তার স্বভাব ও চরিত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়। আর এটাই হচ্ছে বান্দার কাছ থেকে শয়তান যা চায় তার চূড়ান্তরূপ। বান্দা যখন এরকম অবস্থায় পৌঁছে যায় তখন ‘তাওবা নসূহা’ ব্যতীত অর্থাৎ পাপাচারিতা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা ব্যতীত তার জন্য কোন রকমের কল্যাণ ও মঙ্গল আশা করা যায় না।

আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, বান্দার মধ্যে আল্লহর প্রতি মাত্রাতিরিক্ত ভয়। বান্দা তার অত্যধিক অন্যায়, অপরাধ ও পাপাচারিতার কারণে তার মধ্যে আল্লহর ভয় এত বেশি হয়ে যায় যে, তাঁর অপরিসীম রহমত ও মাগফিরাতের ব্যাপকতা ও বিস্তৃতি সম্পর্কে

৩। ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালমকে কবিরা গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জবাবে বলেছেন, ‘কবিরা গুনাহ হচ্ছে .

الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله.

“আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা, আল্লহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া এবং আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করা।”

৪। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন,

বান্দা উদাসীন ও অজ্ঞ হয়ে যায়। এর ফলে বান্দার মধ্যে এমন হতাশা ও নিরাশার উদ্ভব ঘটে যে, সে মনে করে তাওবা করলে এবং আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করলে তিনি তাকে ক্ষমা করবেন না, কোন দয়াও করবেন না। এমতাবস্থায় পাপের পথ থেকে ফিরে আসার ইচ্ছা খুব দুর্বল ও ক্ষীণ হয়ে পড়ে। এর ফলে আল্লাহর রহমত থেকে সে বঞ্চিত হয়ে। এ অবস্থা তার জন্য নিঃসন্দেহে ক্ষতিকর। এটা সৃষ্টি হয়েছে আল্লাহ সম্পর্কে এবং তার নিজের অধিকার সম্পর্কে জ্ঞানের স্বল্পতা, মনের দুর্বলতা, অপারগতা এবং অবহেলার কারণে।

বান্দা যদি এসব বিষয় [অর্থাৎ আল্লাহর ক্ষমা ও অপরিসীম রহমতের কথা জানতো, আর অলসতা ও অবহেলায় পড়ে না থাকতো, তাহলে অবশ্যই তার সামান্য প্রচেষ্টা তাকে রবের অপরিসীম রহমত, করুণা ও দয়ার কাছে পৌঁছে দিতে পারতো।

আল্লাহর পাকড়াও বা শাস্তি থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করার দুটি মারাত্মক কারণ রয়েছে।

একটি হচ্ছে , বান্দা দীন থেকে বিমুখ থাকা। স্বীয় রবের পরিচয় এবং তাঁর হকের ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন থাকা এবং বিষয়টিকে অবজ্ঞা করা। অব্যাহত ভাবে স্বীয় রব থেকে বিমুখ থাকা, অবহেলা করা, ও হারাম কাজে লিপ্ত থাকার মাধ্যমে নিজের অত্যবশ্যকীয় আমল তথা ফরজ ইবাদতসমূহ আদায় না করা। যার ফলে আল্লহর উপর বান্দার ঈমান নির্ভর করে আল্লহর ভয় এবং দুনিয়া ও আখেরাতে তাঁর শাস্তির ভয়ের উপর।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে . বান্দা মূর্খ আবেদ হওয়া। স্বীয় আমল দ্বারা প্রতারিত হয়ে নিজের আমলে নিজেই মুগ্ধ হওয়া। তার অব্যাহত মূর্খতার কারণে আমলের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়া। যার ফলে তার কাছ থেকে আল্লাহর ভয় দূর হয়ে যায় এবং সে মনে করতে থাকে যে, আল্লাহর কাছে তার উচ্চ মর্যাদা রয়েছে। এভাবে স্বীয় শক্তিহীন ও দুর্বল হৃদয়ের উপর নির্ভরশীল হয়ে আল্লাহর শাস্তি থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করে পাপ পঙ্কিলতা দ্বারা বান্দা কলুষিত হয়। এর ফলে নেক কাজের পথে তাওফীক

أكبر الكبائر : الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. (رواه عبد الرزاق)

"সবচেয়ে বড় গুনাহ হচ্ছে : আল্লাহর শাস্তি হতে নিজেকে নিরাপদ মনে করা, আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হওয়া এবং আল্লাহর করুণা থেকে নিজেকে বঞ্চিত মনে করা।"

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় .

১। সূরা আ'রাফের ৯৯নং আয়াতের তাফসীর।

২। সূরা হিজরের ৫৬ নং আয়াতের তাফসীর।

৩। আল্লহর পাকড়াও থেকে ভয়হীন ব্যক্তির জন্য কঠোর শাস্তির ভয় প্রদর্শন।

না হয়ে বরং প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। এভাবেই বান্দা তার নিজের উপর জুলুম ও অত্যাচার করে।

আলোচিত অধ্যায়ের বিশদ ব্যাখ্যার মাধ্যমে এটাই জানা যায় যে, উপরোক্ত কাজগুলো তাওহীদের পরিপন্থী।

৩৫তম অধ্যায় .

তাকদীরের [ফয়সালার] উপর ধৈর্য ধারণ করা ঈমানের অঙ্গ

১। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. (التغابن:١١)

" যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ঈমান আনে, তার অন্তরকে তিনি হেদায়াত দান করেন।" (তাগাবুনঃ ১১)

২। আলকামা রা. বলেছেন, ঐ ব্যক্তিই মোমিন, যে ব্যক্তি বিপদ আসলে মনে করে তা আল্লহর পক্ষ থেকে এসেছে। এর ফলে সে বিপদগ্রস্ত হয়েও সন্তুষ্ট থাকে এবং বিপদকে খুব সহজেই স্বীকার করে নেয়।

৩। সহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালম এরশাদ করেছেন,

"মানুষের মধ্যে এমন দু'টি [খারাপ] স্বভাব রয়েছে যার দ্বারা তাদের কুফরি প্রকাশ পায়। একটি হচ্ছে, বংশ উলেখ করে খোটা দেয়া, আর একটি হচ্ছে মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা।"

৪। ইমাম বুখারী ও মুসলিম ইবনে মাসউদ রা. হতে মারফু হাদিসে বর্ণনা করেন,

---

ব্যাখ্যা

ভাগ্যের [তাকদীরের] উপর ধৈর্য ধারণ ঈমানের অঙ্গ।

আল্লাহর আনুগত্য করা এবং তাঁর নাফরমানি থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে ধৈর্য ধারণের বিষয়টি সবার কাছে সুস্পষ্ট। উপরোক্ত দু'টি বিষয়ই ঈমানের অঙ্গ। এমনকি এ দুটি বিষয়ই ঈমানের ভিত্তি। ঈমানের সব কিছুই হচ্ছে আল্লহ যা পছন্দ করেন, যাতে

إذاأراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة فى الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبــه حتى يوافى به يوم القيامة.

"আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর কোন বান্দার মঙ্গল করতে চান, তখন তাড়াতাড়িকরে দুনিয়াতেই তার [অপরাধের] শাস্তি দিয়ে থাকেন। পক্ষান্তরে তিনি যখন তাঁর কোন বান্দার অমঙ্গল করতে চান, তখন দুনিয়াতে তার পাপের শাস্তি দেয়া থেকে বিরত থাকনে, যেন কেয়ামতের দিন তাকে পুরো শাস্তি দিতে পারেন।

৫। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালম এরশাদ করেছেন,

إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي

"পরীক্ষা যত কঠিন হয়, পুরস্কার তত বড় হয়।" আল্লাহ তা'আলা যখন কোন জাতিকে ভালোবাসেন, তখন সে জাতিকে তিনি পরীক্ষা করেন। এতে যে ব্যক্তি সন্তুষ্টি থাকে, তার উপর আল্লাহ ও সন্তুষ্ট থাকেন। আর যে ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হয়, তার প্রতি আল্লাহও অসন্তুষ্ট থাকেন। (তিরমিযী)

তিনি সন্তুষ্ট থাকেন এবং যাতে তাঁর নৈকট্য অর্জন করা যায়, তার উপর ধৈর্য ধারণ করা। সাথে সাথে যাবতীয় হারাম কাজ থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করা।

দীন তিনটি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

এক . আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সংবাদ বা তাঁর বাণীর স্বীকৃতি প্রদান করা।

দুই . আল্লহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ পালন করা।

তিন . আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকা।

অতএব, আল্লাহ তাআলার ফয়সালাকৃত তাকদীরের কোন দুঃখজনক অবস্থায় ধৈর্য ধারণ করা। এ বিষয়টি ভালভাবে অনুধাবন করা এবং তদনুযায়ী আমল করা খুবই জুরুরি বিধায় বিষয়টি এখানে খাসভাবে উলেখ করা হয়েছে।

বান্দা যখন এ কথা জানতে পারবে যে, আল্লাহর হুকুমেই মুসীবত আসে,

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় .

১। সূরা তাগাবুন এর ১১ নং আয়াতের তাফসীর।

২। বিপদে ধৈর্য ধারণ ও আল্লহর ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকা ঈমানের অঙ্গ।

৩। কারো বংশের প্রতি অপবাদ দেয়া বা দুর্নাম করা কুফরির শামিল।

৪। যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করে, গাল- চাপড়ায়, জামার আস্তিন ছিঁড়ে ফেলে এবং জাহেলি যুগের কোন রীতি নীতির প্রতি আহ্বান জানায়, তার প্রতি কঠোর শাস্তির ভয় প্রদর্শন।

৫। বান্দার মঙ্গলের প্রতি আল্লাহর ইচ্ছার নিদর্শন।

৬। বান্দার প্রতি আল্লহর অমঙ্গলেচ্ছার নিদর্শন।

৭। বান্দার প্রতি আল্লহর ভালোবাসার নিদর্শন।

৮। আল্লাহর প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়া হারাম।

৯। বিপদে আল্লহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকার সওয়াব।

তাকদীরের মধ্যে আল্লাহ তাআলা হিকমত নিহিত রেখেছেন এবং তাকদীরে নির্ধারিত মুসীবতের মধ্যেই বান্দার জন্য আল্লহর নেয়ামত নিহিত আছে, তখন সে আল্লাহ তাআলার ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট হবে। তাঁর নির্দেশকে মেনে নিবে এবং দুঃখ কষ্টে ধৈর্য ধারণ করবে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লহর তাআলার নৈকট্য লাভ করা সওয়াব লাভের আকাঙ্ক্ষা করা, আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করা এবং উত্তম চরিত্র গঠনের সুযোগ গ্রহণ করা। এর ফলে বান্দাহর অন্তর প্রশান্তি লাভ করবে এবং তার ঈমান ও তাওহীদ শক্তিশালী হবে।

৩৬তম অধ্যায় .

রিয়া (প্রদর্শনেচ্ছা) প্রসঙ্গে শরিয়তের বিধান

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ. (الكهف:١١٠)

" [হে মুহাম্মদ], আপনি বলে দিন, আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমার নিকট এ মর্মে ওহি পাঠানো হয় যে, তোমাদের ইলাহই একক ইলাহ।" (কাহাফ: ১১০)

২। আবু হুরায়রা রা. থেকে 'মারফু' হাদিসে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাআলা বলেন,

أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه.

(رواه مسلم)

ব্যাখ্যা

মানুষের কোন আমল দ্বারা লাভের আশা করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

এ কথা অবশ্যই জেনে রাখা দরকার যে, এখলাসের সাথে আল্লহর জন্য কাজ করাই হচ্ছে দ্বীনের ভিত্তি, তাওহীদ এবং ইবাদতের প্রাণশক্তি। এর উপমা হচ্ছে একজন বান্দা তার সম্পূর্ণ কাজই আল্লাহর উদ্দেশ্যে করবে, তাঁরই সওয়াব ও করুণা ভিক্ষা করবে। অতঃপর ঈমানের ছয়টি মূল-নীতি এবং ইসলামি শরিয়তের পাঁচটি বিধান বাস্ত বায়িত করবে। ইহসানের হাকিকত তথা আল্লাহর অধিকার ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করবে। এর উদ্দেশ্য হবে, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালের কল্যাণ অর্জন করা। লোক দেখানো, সুনাম অর্জন, নেতৃত্ব দান, দুনিয়ার স্বার্থ উদ্ধার ইত্যাদি বিষয়গুলোর কোন একটি আল্লাহর ইবাদতের দ্বারা আশা করা যাবে না। উপরোক্ত অবস্থায় পৌছলেই বান্দার ঈমান ও তাওহীদ পূর্ণতা লাভ করবে।

"আমি অংশীদারদের শিরক (অর্থাৎ অংশীদারিত্ব) থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। যে ব্যক্তি কোন কাজ করে ঐ কাজে আমার সাথে অন্য কাউকে শরিক করে, আমি [ঐ] ব্যক্তিকে এবং শিরককে [অংশীদারকে ও অংশীদারিত্বকে] প্রত্যাখ্যান কির।" (মুসলিম)

৩। আবু সাঈদ রা. থেকে অন্য এক 'মারফু' হাদিসে বর্ণিত আছে,

ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى، قال : الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته، لما يرى من نظر رجل. (رواه أحمد)

"আমি কি তোমাদের এমন বিষয়ে সংবাদ দেব না? যে বিষয়টি আমার কাছে 'মসিহ দাজ্জালের' চেয়েও ভয়ংকর?" সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হাঁ। তিনি বললেন, 'তা হচ্ছে 'শিরকে খফী' বা গুপ্ত শিরক। । [আর এর উদাহরণ হচ্ছে] একজন মানুষ দাঁড়িয়ে শুধু এ জন্যই তার নামাজকে খুব সুন্দরভাবে আদায় করে যে, কোন মানুষ তার নামাজ দেখছে [বলে সে মনে করছে]। (আহমাদ)

ঈমানের পূর্ণতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে, লোক দেখানো কার্যকলাপ, মানুষের প্রশংসা এবং সম্মান অর্জনের জন্য কোন আমল করা। অথবা কেবলমাত্র পার্থিব কোন স্বার্থের জন্য কাজ করা যা বান্দার খুলুসিয়াত এবং তাওহীদকে কলুষিত করে।

রিয়ার ব্যাপারে কিছু ব্যাখ্যা- বিশেষণমূলক কথা .

বান্দা যদি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কাজ করে এবং এ ফাসেদ উদ্দেশ্য নিয়েই তার কাজ চলতে থাকে, তাহলে তার আমল বাতিল বলে গণ্য হবে। কেননা এ ধরনের আমল শিরকে আসগার বা ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত। সাথে সাথে এ আশঙ্কাও রয়েছে যে, এ ছোট শিরককে অবলম্বন করে বান্দা শিরকে আকবার বা বড় শিরকে উপনীত হয়ে যাবে।

বান্দা আল্লাহর উদ্দেশ্যেই কাজ করে তবে এর সাথে লোক দেখানোর ইচ্ছাও আছে, এমতাবস্থায় বান্দা যদি তার আমলের দ্বারা রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছাকে পরিত্যাগ করতে না পারে, তাহলেও কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী তার আমল বাতিল বলে গণ্য হবে।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় .

১। সূরা কাহাফের ১১০ নং আয়াতের তাফসীর।

২। নেক আমল প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে মারাত্মক ত্রুটি হচ্ছে উক্ত নেক কাজ করতে গিয়ে আল্লাহ ছাড়ও অন্যকে খুশি করার নিয়ত।

৩। এর [অর্থাৎ শিরক মিশ্রিত নেক আমল প্রত্যাখ্যাত হওয়ার] অনিবার্য কারণ হচ্ছে, আল্লাহর কারো মুখাপেক্ষী না হওয়া। [এ জন্য গাইরুলহ মিশ্রিত কোন আমল তাঁর প্রয়োজন নেই।]

৪। আরো একটি কারণ হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার সাথে যাদেরকে শরিক করা হয়, তাদের সকলের চেয়ে আল্লাহ বহুগুণে উত্তম।

৫। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালম এর অন্তরে রিয়ার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের উপর ভয় ও আশঙ্কা।

৬। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালম রিয়ার ব্যাখ্যা এভাবে দিয়েছেন যে, একজন মানুষ মূলত নামাজ আদায় করবে আল্লহরই জন্যে। তবে নামাজকে সুন্দরভাবে আদায় করবে শুধু এজন্য যে, সে মনে করে কোন মানুষ তার নামাজ দেখছে।

বান্দা যদি একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই কোন কাজ করা আরম্ভ করে, কিন্তু কর্মরত অবস্থায় রিয়ার বিষয়টি এসে যোগ হয়, এমতাবস্থায় বান্দা রিয়া পরিত্যাগ করে খুলুসিয়াতের সাথে আল্লহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করতে পারলে, তার কোন ক্ষতি হবে না, অর্থাৎ আমল বাতিল বলে গণ্য হবে না। কিন্তু যদি রিয়া বিষয়টি বান্দার মধ্যে স্থায়িত্ব লাভ করে এবং অন্তরে প্রশান্তি লাভ করে, তাহলে তার আমল ত্রুটিপূর্ণ হবে। সাথে সাথে বান্দার ঈমান ও ইখলাসের মধ্যে সে পরিমাণ দুর্বলতা আসবে যে পরিমাণ রিয়া তার অন্তরে বিরাজমান থাকবে।

৩৭তম অধ্যায় .

নিছক পার্থিব স্বার্থে কোন কাজ করা শিরক

১। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿١٥﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾ ﴿هود: ١٥-١٦﴾

"যারা শুধু দুনিয়ার জীবন এবং এর চাকচিক্য কামনা করে, আমি তাদের সব কাজের প্রতিদান দুনিয়াতেই দিয়ে থাকি।" (হুদ : ১৫-১৬)

২। আবু হুরায়রা রা. থেকে সহীহ হাদিসে বর্ণিত আছে রাসূল সাহাবী এরশাদ করেছেন,

تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عيد الخميلة، إن أعطى رضي، وإن لم يعط سخط، وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه فى سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة فدماه، إن كان فى الحراسة كان فى الحراسة، وإن كان فى الساقة كان فى الساقة، إن استأذن لم نؤذن له وإن شفيع لم يشفع .

"দীনার ও দিরহাম অর্থাৎ টাকা-পয়সার পূজারিরা ধ্বংস হোক। রেশম পূজারি [পোশাক- বিলাসী] ধ্বংস হোক। তাকে দিতে পারলেই খুশি হয়, না দিতে পারলে রাগান্বিত হয়। সে ধ্বংস হোক, তার আরো খারাপ হোক, কাঁটা-ফুটলে সে তা খুলতে সক্ষম না হয় [অর্থাৎ সে বিপদ থেকে উদ্ধার না পাক।] সে বান্দা সৌভাগ্যের অধিকারী যে আল্লাহর রাস্তায় তার ঘোড়ার লাগাম ধরে রেখেছে, মাথার চুলগুলোকে এলো-মেলো করেছে আর পদ যুগলকে করেছে ধূলিমলিন। তাকে পাহারার দায়িত্ব দিলে সে পাহারাতেই লেগে থাকে। সেনাদলের শেষ ভাগে তাকে নিয়োজিত করলে সে শেষ ভাগেই লেগে থাকে। সে অনুমতি চাইলে তাকে অনুমতি দেয়া হয় না। তার ব্যাপারে সুপারিশ করলে তার সুপারিশ গৃহীত হয় না।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়:

১। আখেরাতের আমল দ্বারা মানুষের দুনিয়া হাসিলের ইচ্ছা।

২। সূরা হুদের ১৫ ও ১৬ নং আয়াতের তাফসীর।

৩। একজন মুসিলমকে দিনার- দেরহাম ও পোশাকের বিলাসী হিসেবে আখ্যায়িত করা।

৪। উপরোক্ত বক্তব্যের ব্যাখ্যা হচ্ছে, বান্দাহকে দিতে পারলেই খুশি হয়, না দিতে পারলে অসন্তুষ্ট হয়। এ ধরনের লোক দুনিয়াদার।

৫। দুনিয়াদারকে আল্লহর নবী এ বদদোয়া করেছেন, "সে ধ্বংস হোক, সে অপমানিত হোক বা অপদস্ত হোক।"

৬। দুনিয়াদারকে এ বলেও বদদোয়া করেছেন, "তার গায়ে কাঁটা ফুটুক এবং তা সে খুলতে না পারুক।"

৭। হাদিসে বর্ণিত গুণাবলিতে গুণান্বিত মুজাহিদের প্রশংসা করা হয়েছে। সে সৌভাগ্যের অধিকারী বলে জানান হয়েছে।

৩৮ তম অধ্যায় .

যে ব্যক্তি আল্লাহর হালালকৃত জিনিস হারাম এবং হারামকৃত জিনিসকে হালাল করার ব্যাপারে [অন্ধভাবে], আলেম, বুজুর্গ ও নেতাদের আনুগত্য করল, সে মূলত তাদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করল

১। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন,

يوشك أن تنـزل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون : قال أبوبكر وعمر.

"তোমাদের উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষিত হওয়ার সময় প্রায় ঘনিয়ে এসেছে। কারণ, আমি বলছি, "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালম বলেছেন।" অথচ তোমরা বলছ, "আবুবকর এবং ওমর রা. বলেছেন।"

ব্যাখ্যা

যে ব্যক্তি আল্লহর হালালকৃত জিনিস হারাম এবং হারামকৃত জিনিসকে হালাল করার ব্যাপারে আলেম বুজুর্গ ও নেতাদের আনুগত্য করল, সে মূলত: তাদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করে নিলা

আল্লাহ তা'আলার বাণী . أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ

"আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যারা আপনার উপর যা নাজিল করা হয়েছে, তা তারা বিশ্বাস করে বলে দাবি করে?"

গ্রন্থকার এখানে যা উলেখ করেছেন তার উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট। একমাত্র রব এবং ইলাহই হচ্ছেন 'কাদারী', [তাকদীর] 'শরয়ী' [শরীয়ত] এবং 'জাযায়ী] [শাস্তি] সংক্রান্ত বিষয়ে হুকুম দানের মালিক। একমাত্র তাঁরই ইবাদত করতে হবে। তিনি একক ও লা-শরিক। নিরঙ্কুশ আনুগত্য তাঁরই প্রাপ্য। তাই তাঁর নাফরমানি করা যাবে না। এর ফলে সমস্ত আনুগত্যই তাঁর আনুগত্যের অধীনে নিয়ন্ত্রিত হবে।

২। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রা. বলেছেন, “ঐ সব লোকদের ব্যাপারে আমার কাছে খুবই অবাক লাগে, যারা হাদিসের সনদ ও ‘সিহহাত’ [বিশুদ্ধতা] অর্থাৎ হাদিসের পরস্পরা ও সহীহ হওয়ার বিষয়টি জানার পরও সুফইয়ান সওরীর মতামতকে গ্রহণ করে। অথচ আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿النور:٦٣﴾

“যারা তাঁর নির্দেশের বিরোধিতা করে, তাদের এ ভয় করা উচিত যে, তাদের উপর কোন কঠিন পরীক্ষা কিংবা কোন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি এসে পড়ে।” (নূর . ৮৩)

তুমি কি জানো ফিতনা কি? ফিতনা হচ্ছে শিরক। সম্ভবত তাঁর কোন কথা অন্তরে বক্রতার সৃষ্টি করলে এর ফলে সে ধ্বংস হয়ে যাবে।

৩। আদী বিন হাতেম রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূল

বান্দা যদি উপরোল্লিখিত আনুগত্যের দৃষ্টিভঙ্গিতে আলেম, বুজুর্গ এবং নেতাগণকে গ্রহণ করে এবং তাদের আনুগত্যকে আসল মনে করে, আর আল্লহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যকে তাদের আনুগত্যের অধীন মনে করে, তাহলে সে আল্লাহর পরিবর্তে তাদেরকেই [আলেম, বুজুর্গ ও নেতাগণকে] রব হিসেবে মেনে নিলা, তাদের ইবাদত করল, তাদেরকে ফায়সালাদানকারী হিসেবে গ্রহণ করল এবং তাদের ফয়সালাকে আল্লহ ও তাঁর রাসূলের ফয়সালার উপরে অগ্রাধিকার দিল। আর এটাই হচ্ছে নির্ঘাত কুফরি। কেননা হুকুমদানের একচ্ছত্র অধিকারী হচ্ছেন একমাত্র আল্লহ তাআলা। [এমনিভাবে তিনিই ইবাদতের পূর্ণ হকদার]

তাই প্রতিটি মানুষের কর্তব্য হচ্ছে গাইরুল্লহকে হুকুম কর্তা হিসেবে গ্রহণ না করা। বিতর্কিত বিষয়ের ফয়সালার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুম তথা কুরআন ও সুন্নাহকে মেনে নেয়া। এর দ্বারাই বান্দার দীন ও তাওহীদ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পূর্ণতা অর্জন করবে।

যে ব্যক্তি আল্লহ ও তাঁর রাসূলের বিধান ব্যতীত অন্য কোন [মানব রচিত] বিধান

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালমকে আয়াত পড়তে শুনেছেন,

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ (التوبة: ٣١)

"তারা [ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান জাতির লোকেরা] আল্লাহর পরিবর্তে তাদের ধর্মীয় নেতা ও পুরোহিতদেরকে রব হিসেবে বরণ করে নিয়েছিল।" (তাওবা . ৩১) তখন আমি নবিজিকে বললাম, 'আমরাতো তাদের ইবাদত করি না।' তিন বললেন, 'আচ্ছা আল্লাহর হালাল ঘোষিত জিনিসকে তারা হারাম বললে, তোমরা কি তা হারাম হিসেবে গ্রহণ করো না? আবার আল্লাহর হারাম ঘোষিত জিনিসকে তারা হালাল বললেন, তোমরা কি তা হালাল হিসেবে গ্রহণ করো না? তখন আমি বললাম, হ্যা, তিনি তখন বললেন, 'এটাই তাদের ইবাদত (করার মধ্যে গণ্য।)' (আহমাদ ও তিরমিযী)

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় .

১। সূরা নূরের ৬৩ নং আয়াতের তাফসীর।

২। সূরা তাওবার ৩১ নং আয়াতের তাফসীর।

মতে বিচার ফয়সালা গ্রহণ করল, সেই তাগুতকে মেনে নিলা। এরপরও যদি সে দাবি করে যে, সে একজন মু'মিন, তাহলে সে চরম মিথ্যাবাদী।

দ্বীনের মৌলিক এবং আনুষঙ্গিক বিষয়ে আল্লহ ও তাঁর রাসূলের ফয়সালা মেনে নেয়া ব্যতীত বান্দার ঈমান পরিপূর্ণ হবে না। গ্রন্থকারের আলোচিত অপর একটি অধ্যায়ের মর্মানুযায়ী প্রতিটি হক বা অধিকারের ক্ষেত্রে এ হুকুম [অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ফয়সালা মেনে নেয়া] প্রযোজ্য।

অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ তাঁর রাসূল ব্যতীত অন্য কারো ফয়সালা মেনে নিলা, সে মূলত, গাইরুল্লহকে রব হিসেবে এবং তাগুতকে ফায়সালাকারী হিসেবে মেনে নিলা।

৩। আদী বিন হাতেম ইবাদতের যে অর্থ অস্বীকার করেছেন, সে ব্যাপারে সতর্কীকরণ।

৪। ইবনে আব্বাস রা. কর্তৃক আবু বকর এবং ওমর রা. এর দৃষ্টান্ত আর ইমাম আহমাদ রা. কর্তৃক সুফইয়ান সওরীর দৃষ্টান্ত পেশ করা।

৫। অবস্থার পরিবর্তন মানুষকে এমন [গোমরাহীর] পর্যায়ে উপনীত করে, যার ফলে পণ্ডিত ও পীর বুজুর্গের পূজা করাটাই তাদের কাছে সর্বোত্তম ইবাদতে পরিণত হয়। আর এরই নাম দেয়া হয় "বেলায়াত।" 'আহবার' তথা পণ্ডিত ব্যক্তিদের ইবাদত হচ্ছে, তাদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা। অতঃপর অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হয়ে এমন পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি গাইরুল্লহর ইবাদত করল, সে সালেহ বা পুণ্যবান হিসেবে গণ্য হচ্ছে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় অর্থে যে ইবাদত করল অর্থাৎ আল্লাহর জন্য ইবাদত করল, সেই জাহেল বা মূর্খ হিসেবে গণ্য হচ্ছে।

৩৯ তম অধ্যায় .

১। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا.

﴿ألنساء: ٦٠﴾

"আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যারা আপনার উপর যে কিতাব নাজিল হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাজিল হয়েছে তার প্রতি ঈমান এনেছে বলে দাবি করে? তারা বিচার ফয়সালার জন্য তাগুত [খোদাদ্রোহী শক্তি] এর কাছে যায়, অথচ তা অস্বীকার করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে আর শয়তান তাদেরকে চরম গোমরাহিতে নিমজ্জিত করতে চায়।" (নিসা . ৬০)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ . ﴿البقرة: ١١﴾

"তাদেরকে যখন বলা হয়, তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না, তখন তারা বলে, আমরাইতে শান্তিকামী।" (বাকারা . ১১)

৩। আল্লাহ তাআলা অন্যত্র এরশাদ করেছেন,

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا (الأعراف: ٥٦)

"পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তোমর বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।" (আ'রাফ . ৫৬)

৪। আল্লাহ তাআলা আরো এরশাদ করেছেন,

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿المائدة: ٥٠﴾

"তারা কি বর্বর যুগের আইন চায়?" (মায়েদা . ৫০)

৫। আব্দুলহ বিন ওমর থেকে বর্ণিত আছে, 'রাসূল সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসালম এরশাদ করেছেন,

لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به .

"তোমাদের কেউ ঈমানাদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না তার প্রবৃত্তি আমার আনীত আদর্শের অধীন হয়।" (ইমাম নববী হাদিসটিকে সহি বলেছেন)

৬। ইমাম শা'বী রহ.) বলেছেন, একজন মুনাফেক এবং একজন ইহুদির মধ্যে (একটি ব্যাপারে) ঝগড়া ছিল। ইহুদি বলল, 'আমরা এর

বিচার- ফয়সালার জন্য মুহাম্মদ সাহাবী এর কাছে যাব, কেননা মুহাম্মদ সাহাবী ঘুস গ্রহণ করেন না, এটা তার জানা ছিল। আর মুনাফেক বলল, ‘ফয়সালার জন্য আমরা ইহুদি বিচারকের কাছে যাব, কেননা ইয়াহুদীরা ঘুস খায়, এ কথা তার জানা ছিল। পরিশেষে তারা উভয়েই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, তারা এর বিচার ও ফয়সালার জন্য জোহাইনা গোত্রের এক গণকের কাছে যাবে। তখন এ আয়াত নাজিল হয় .

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا ...الأية

আরেকটি বর্ণনা মতে জানা যায়, ঝগড়া- বিবাদে লিপ্ত দু’জন লোকের ব্যাপারে এ আয়াত নাজিল হয়েছে। তাদের একজন বলেছিল, মীমাংসার জন্য আমরা নবী সাহাবী এর কাছে যাব, অপরজন বলেছিল, কা’ব বিন আশরাফের কাছে যাব।’ পরিশেষে তারা উভয়ে বিষয়টি মীমাংসার জন্য ওমর রা. এর কাছে সোপর্দ করল। তারপর তাদের একজন ঘটনাটি তাঁর কাছে উলেখ করল। সে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালম এর বিচার ফয়সালার ব্যাপারে সন্তুষ্ট হতে পারলো না, তাকে লক্ষ্য করে ওমর রা. বললেন, ঘটনাটি কি সত্যিই এরকম? সে বলল, হ্যা, তখন তিনি তরবারির আঘাতে তাকে হত্যা করে ফেললেন।”

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় .

১। সূরা নিসার ৬০ নং আয়াতের তাফসীর এবং তাগুতের মর্মার্থ বুঝার ক্ষেত্রে সহযোগিতা।

২। সূরা বাকারার ১১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

৩। সূরা আরাফের ৫৬ নং আয়াতের তাফসীর।

৪। সূরা মায়েদারأَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ এর তাফসীর।

৫। এ অধ্যায়ের প্রথম আয়াত

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا... الأية

নাজিল হওয়ার সম্পর্কে শা’বী রহ. এর বক্তব্য।

৬। সত্যিকারের ঈমান এবং মিথ্যা ঈমানের ব্যাখ্যা।

৭। মুনাফেকের সাথে ওমর রা. এর ব্যবহার সংক্রান্ত ঘটনা।

৮। প্রবৃত্তি যতক্ষণ পর্যন্ত রাসূল স. এর আনীত আদর্শের অনুগত হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত কারো ঈমান পূর্ণাঙ্গ না হওয়ার বিষয়।

৪০ তম অধ্যায় .
আল্লাহর ‘আসমা ও সিফাত’ [নাম ও গুণাবলি] অস্বীকারকারীর পরিণাম

১। আল্লহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ (الرعد: ٣٠)

“এবং তারা রহমান [আল্লাহর গুণবাচক নাম] কে অস্বীকার করে।” (রা’দ: ৩০)

২। সহীহ বুখারীতে বর্ণিত একটি হাদিসে আলী রা. বলেন,

حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله.

“লোকদেরকে এমন কথা বলো, যা দ্বারা তারা [আল্লহ ও রাসূল সম্পর্কে সঠিক কথা জানতে পারে। তোমরা কি চাও যে, আল্লহ এবং তাঁর রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হোক?”

৩। ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে, আল্লহর গুণাবলি সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালম থেকে একটি হাদিস শুনে এক ব্যক্তি আল্লহর গুণকে অস্বীকার করার জন্য একদম ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল তখন

ব্যাখ্যা

ঈমানের মূল ভিত্তি এবং তা যে নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত তা হচ্ছে, আল্লহর প্রতি ঈমান আনা। বান্দার জ্ঞান ও ঈমান যখনই উপরোক্ত নীতির ভিত্তিতে শক্তিশালী হয় আর আল্লহর ইবাদতে আত্মনিয়োগ করে, তখন তার তাওহীদ ও শক্তিশালী হয়। তারপর বান্দা যখন জানতে পারে যে, আল্লহ তাআলা সিফাতে কামাল, বা পরিপূর্ণ গুণাবলির ক্ষেত্রে এক ও অনন্য, তিনি শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ব এবং সৌন্দর্যের দিক দিয়েও একক, তাঁর কামালিয়াত অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গতার ক্ষেত্রে কোন দৃষ্টান্ত ও নজির নেই, তখন এ কথা জেনে নেয়া এবং নিশ্চিত হওয়া বান্দার জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে, তিনিই হচ্ছেন ইলাহে হক (সত্য ইলাহ) এবং তাঁর উলুহিয়্যাত ব্যতীত যাবতীয় উলুহিয়্যাত বাতিল। অতএব যে ব্যক্তি আল্লহর কোন ইসম ও সিফাত অর্থাৎ নাম ও গুণ অস্বীকার

তিনি বললেন, এরা এ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কি করে করল? তারা মুহকামের [বা সুস্পষ্ট] আয়াত ও হাদিসের ক্ষেত্রে নমনীয়তা দেখালো, আর মুতাশাবাহ [অস্পষ্ট আয়াত ও হাদিসের ক্ষেত্রে] ধ্বংসাত্মক পথ অবলম্বন করল?”

কুরাইশরা যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালম এর কাছে [আল্ল-হর গুণবাচক নাম] ‘রাহমানের] উল্যেখ করতে শুনতে পেলো, তখন তারা ‘রাহমান’ গুণটিকে অস্বীকার করল এ প্রসঙ্গেই وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ আয়াতটি নাজিল হয়েছে।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় .

১ আল্লহর কোন নাম ও গুণ অস্বীকার করার অর্থ হচ্ছে ঈমান না থাকা।

২। সূরা রাদের وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ এর তাফসীর।

৩। যে কথা শ্রোতার বোধগম্য নয়, তা পরিহার করা।

৪। অস্বীকারকারীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেসব কথা আল্লহ ও তাঁর রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার দিকে নিয়ে যায়, এর কারণ কি? তার উল্লেখ।

৫। ইবনে আব্বাস (রা.) এর বক্তব্য হচ্ছে, আল্লহর নাম ও গুণাবলির কোন একটি অস্বীকারকারীর ধ্বংস অনিবার্য।

করল, সে এমন কাজই করল যা তাওহীদের সম্পূর্ণ বিপরীত এবং পরিপন্থী। আর এ কাজটি হচ্ছে কুফরির অন্তর্ভুক্ত।

৪১ তম অধ্যায় .
আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকার করার পরিণাম

১। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন

يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ﴿النحل:٨٣﴾

"তারা আল্লহর নেয়ামত চিনে, অতঃপর তা অস্বীকার করে।" (নাহল : ৮৩)

এর মর্মার্থ বুঝাতে মুজাহিদ বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, কোন মানুষের এ কথা বলা 'এ সম্পদ আমার, যা আমার পূর্ব পুরুষ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি।' আ'উন ইবনে আবদিল্লহ বলেন, 'এর অর্থ হচ্ছে, কোন ব্যক্তির এ কথা বলা, 'অমুক ব্যক্তি না হলে এমনটি হতো না।' ইবনে কুতাইবা এর ব্যাখ্যায় বলেন, 'মুশরিকরা বলে, "এটা হয়েছে আমাদের ইলাহদের সুপারিশের বদৌলতে।"

আবু আব্বাস যায়েদ ইবনে খালেদের হাদিসে- যাতে একথা আছে, 'আল্লহ তা'আলা বলেন,

أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر

ব্যাখ্যা

আল্লহর নেয়ামত জেনে শুনে অস্বীকার করার পরিণাম:

ঘোষণা এবং স্বীকৃতির মাধ্যমে যাবতীয় নেয়ামতকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করাই মাখলুকের কর্তব্য। এর মাধ্যমেই [বান্দার] তাওহীদ পূর্ণতা লাভ করে্ যে ব্যক্তি অন্তর এবং জবানের দ্বারা আল্লাহর নেয়ামতকে অস্বীকার করল, সেই কাফের। তার মধ্যে দ্বীনের কিছুই অবশিষ্ট নেই। যে ব্যক্তি অন্তরে এ কথা স্বীকার করে যে, সব নেয়ামতই আল্লহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত, কিন্তু মৌখিকভাবে কখনো সে উক্ত নেয়ামতকে আল্লহর সাথে সম্পৃক্ত করে, আবার কখনো নেয়ামতকে নিজের সাথে, নিজ কর্মের সাথে, কোন সময় অন্যের চেষ্টা সাধনার সাথে সম্পৃক্ত করে যেমনটি বহু মানুষের মুখে- মুখে প্রচলিত আছে। এমতাবস্থায় বান্দার অনিবার্য করণীয় হচ্ছে এ রকম [শির-কী] কাজ করার জন্য তাওবা করা আর নেয়ামতের মালিক ব্যতীত অন্য কারো সাথে সম্পৃক্ত না করা এবং তাওহীদের উপর দৃঢ় থাকার জন্য চেষ্টা সাধনা করা। ঘোষণা ও স্বীকৃতির মাধ্যমে

“আমার কোন বান্দার ভোরে নিদ্রা ভঙ্গ হয় মোমিন অবস্থায়, আবার কারো ভোর হয় কাফির অবস্থায়”– উল্লেখ করে বলেন, এ ধরনের অনেক বক্তব্য কুরআন ও সুন্নায় উলেখ করা হয়েছে। যে ব্যক্তি নেয়ামত দানের বিষয়টি গাইরুল্লহর সাথে সম্পৃক্ত করে এবং আল্লহর সাথে কাউকে শরিক করে, আল্লহ তার নিন্দা করেন।

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় কোন কোন সালাফে- সালেহীন বলেন, বিষয়টি মুশরিকদের এ কথার মতই, ‘অঘটন থেকে বাঁচার কারণ হচ্ছে অনুকুল বাতাস, আর মাঝির বিচক্ষণতা’ এ ধরনের আরো অনেক কথা রয়েছে যা সাধারণ মানুষেরমুখে বহুল প্রচলিত।

এ অধ্যায় থেকে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলো জানা যায় :

১। নেয়ামত সংক্রান্ত জ্ঞান এবং তা অস্বীকার করার ব্যাখ্যা।

২। জেনে- শুনে আল্লহর নেয়ামত অস্বীকারের বিষয়টি মানুষের মুখে বহুল প্রচলিত।

৩। মানুষের মুখে বহুল প্রচলিত এসব কথা আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকার করারই শামিল।

৪। অন্তরে দুটি বিপরীতধর্মী বিষয়ের সমাবেশ।

যাবতীয় নেয়ামতকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করা ব্যতীত বান্দার ঈমান ঠিক হবে না। কেননা আল্লহর শুকরিয়া জ্ঞাপন, যা হচ্ছে ঈমানের মূল বিষয়, তা তিনটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত ।

এক . বান্দা তার নিজের উপর এবং অন্যের উপর আল্লাহর যেসব নেয়ামত আছে, অন্তর দিয়ে সেগুলোর স্বীকৃতি দেবে।

দুই . নেয়ামতের আলোচনা করবে এবং এর জন্য আল্লাহর প্রশংসা করবে।

তিন . নিয়ামত দানকারীর আনুগত্য করবে এবং তাঁরই ইবাদতের জন্য তাঁর সাহায্য কামনা করবে।

৪২তম অধ্যায় .
আল্লহ তাআলার সাথে কাউকে শরীক না করা

১। আল্লহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿البقرة:٢٢﴾

"অতএব জেনে শুনে তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করো না।"

২। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস রা. বলেন أنداد [আন্দাদ] হচ্ছে এমন শিরক যা অন্ধকার রাত্রে নির্মল কাল পাথরের উপর পিপীলিকার পদচারণার চেয়েও সূক্ষ্ম। এর উদাহরণ হচ্ছে, তোমার এ কথা বলা, 'আল্লাহর কসম এবং হে অমুক, তোমার জীবনের কসম, আমার জীবনের কসম।' 'যদি ছোট্ট কুকুরটি না থাকতো, তাহলে অবশ্যই আমাদের ঘরে চোর প্রবেশ করতো।' 'হাঁসটি যদি ঘরে না থাকতো, তাহলে অবশ্যই চোর আসতো।' কোন ব্যক্তি তার সাথিকে এ কথা বলা,

---

ব্যাখ্যা

জেনে- শুনে আল্লহর সাথে কাউকে শরিক না করা

পূর্বোক্ত অধ্যায়ে উল্লেখিত আয়াত– وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَادًا দ্বারা শিরকে আকবার [অর্থাৎ বড় শিরক] বুঝানো হয়েছে। শিরকে আকবারের উদাহরণ হচ্ছে , ইবাদত, মুহব্বত, ভয়, এবং আশা ইত্যাদি ক্ষেত্রে আল্লহর সাথে কাউকে শরিক করা।

আর এ অধ্যায়টির মাধ্যমে শিরকে আসগার অর্থাৎ ছোট শিরককে বুঝানো হয়েছে। যেমন, কথা ও শব্দ প্রয়োগের মধ্যে শিরক করা। এর উদাহরণ হচ্ছে . গাইরুলহর নামে কসম করা, আল্লহ এবং তাঁর সৃষ্টির ক্ষেত্রে শব্দ প্রয়োগের মধ্যে।

‘আল্লহ তাআলা এবং তুমি যা ইচ্ছা করেছ।’ কোন ব্যক্তির এ কথা বলা, ‘আল্লহ এবং অমুক ব্যক্তি যদি না থাকে, তাহলে অমুক ব্যক্তিকে এ কাজে রেখো না।’ এগুলো সবই শিরক। (ইবনে আবি হাতেম)

৩। ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালম এরশাদ করেছেন,

من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. (رواه الترمذى وحسنه وصححه الحاكم)

“ যে ব্যক্তি গাইরুলহর নামে শপথ করল, সে কুফরি অথবা শিরক করল।” (তিরমিযী)

৪। ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন,

لأن أحلف بالله كاذبا أحب إليّ من أحلف بغيره صادقا

“ আল্লহর নামে মিথ্যা কসম করা আমার কাছে গাইরুলহর নামে সত্য কসম করার চেয়ে বেশি পছন্দনীয়। হুযাইফা রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালম এরশাদ করেছেন,

---

উভয়কে সমতুল্য মনে করা। যেমন . ‘আল্লহ এবং অমুক যদি না হতো,’ ‘আল্লাহ এবং তোমার নামে কসম’ এ ধরনের কথা বলা। কোন বিষয়ের সম্পর্ক এবং সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারকে গাইরুলহর সাথে সম্পৃক্ত করা। যেমন . ‘পাহারাদার না থাকলে অবশ্যই আমাদের ঘরে চোর আসতো’ ‘অমুক ঔষধটি না হলে আমি মারাই যেতাম,’ ‘অমুক কারবারে যদি অমুকের বিচক্ষণতা না হতো তাহলে কিছুই লাভ করা যেতো না।’ এগুলো সবই তাওহীদের পরিপন্থী।

এ ক্ষেত্রে করণীয় হচ্ছে, কোন কিছু সংঘটিত হওয়া এবং এর ‘আসবাব’ অর্থাৎ কার্যকারণসমূহের উপকারিতার বিষয়টি আল্লহ তাআলা এবং তাঁরই ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত করা। এর সাথে সাথে কার্যকারণের মর্যাদা ও কল্যাণের কথা উল্লেখ করা। অতএব কথা বলার নীতি হবে এ রকম, لو لا الله ثم كذا। অর্থাৎ ‘আল্লাহ [তাআলার মেহেরবানি’ অতঃপর এমন [ঘটনা] না হলে এমন হতো।’ এর উদ্দেশ্য হচ্ছে যাবতীয় কার্যকারণ আল্লহর তাকদীর ও ফয়সালার সাথে সম্পৃক্ত’ এ কথা জানা।

অতএব বান্দার তাওহীদ ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার অন্তর, কথা ও কাজে আল্লহর সাথে কাউকে শরিক করা থেকে বিরত না থাকে।

لا تقولوا: ماشاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ماشاء الله ثم شاء فلان (رواه أبوداد)

'আল্লহ এবং অমুক ব্যক্তি যা চেয়েছেন' এ কথা তোমরা বলো না। বরং এ কথা বলো, 'আল্লহ যা চেয়েছেন অতঃপর অমুক ব্যক্তি যা চেয়েছে' (আবু দাউদ)

ইবরাহীম নখয়ী থেকে এ কথা বর্ণিত আছে যে, أعوذبالله وبك অর্থাৎ 'আমি আল্লহ এবং আপনার কাছে আশ্রয় চাই' এ কথা বলা তিনি অপছন্দ করতেন। আর أعوذ بالله ثم بك অর্থাৎ 'আমি আল্লহর কাছে আশ্রয় চাই অতঃপর আপনার কাছে আশ্রয় চাই।' এ কথা বলা তিনি জায়েম মনে করতেন। তিনি আরো বলেন, لولا الله ثم فلان 'যদি আল্লহ অতঃপর অমুক না হয়' একথা বলে, কিন্তু لولا الله وفلان অর্থাৎ 'যদি আল্লহ এবং অমুক না হয়' এ কথা বলো না।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় .

১। আল্লহর সাথে শরিক করা সংক্রান্ত সূরা বাকারার উল্লেখিত আয়াতের তাফসীর।

২। শিরকে আকবার অর্থাৎ বড় শিরকের ব্যাপারে নাজিলকৃত আয়াতকে সাহাবায়ে কেরাম ছোট শিরকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য বলে তাফসীর করেছেন।

৩। গাইরুল্লহর নামে কসম করা শিরক।

৪। গাইরুলহর নামে সত্য কসম করা, আল্লাহর নামে মিথ্যা কসম করার চেয়েও জঘন্য গুনাহ।

৫। বাক্যস্থিত و এবং ثم এর মধ্যে পার্থক্য।

৪৩তম অধ্যায় .
আল্লাহর নামে কসম করে সন্তুষ্ট না থাকার পরিণাম

১। ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত আছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালম এরশাদ করেছেন,

لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله. (رواه ابن ماجه بسند حسن)

" তোমরা তোমাদের বাপ- দাদার নামে কসম করো না, যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে কসম করে, তার উচিত কসমকে বাস্তবায়িত করা। আর যে ব্যক্তির উদ্দেশ্যে আল্লহর নামে কসম করা হলো, তার উচিত উক্ত কসমে সন্তুষ্ট থাকা। আল্লহর কসমে যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট হলো না, আল্লাহর পক্ষ থেকে তার কল্যাণের কোন আশা নেই।" (ইবনে মাজা)

ব্যাখ্যা

আল্লাহর নামে কসম করে যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট নয় তার পরিণাম

এ অধ্যায়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে এ কথা উপলব্ধি করা যে, যদি তোমার [বিবদমান] প্রতিপক্ষের প্রতি 'হলফ' করার নির্দেশ হয় এবং তার সত্যতা সম্পর্কে জানা থাকে অথবা 'হলফ'টা বাহ্যতঃ কল্যাণকর ও ন্যায়- ভিত্তিক হয়, তাহলে তার হলফের ব্যাপারে তোমার সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত থাকা উচিত ।

মুসলমানদের উপর তাদের রবের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করার যে দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে, তার অপরিহার্য করণীয় হিসেবে আল্লাহর নামে কসমের ব্যাপারে তোমার সন্তুষ্ট থাকা উচিত। এমনিভাবে তুমি যদি তার জন্য আল্লাহর নামে কসম করো, তারপর সে যদি বিষয়টি পরিত্যাগ করার হলফ কিংবা প্রতিপক্ষের উপর শাস্তির অভিশাপ ও বদ দোয়া ব্যতীত রাজি না হয়, তাহলে এটা [আচরণ] হবে وعيد

এ অধ্যায় থেকে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলো জানা যায় .

১। বাপ-দাদার নামে কসম করার উপর নিষেধাজ্ঞা।

২। যার জন্য আল্লহর নামে কসম করা হলো, তার প্রতি [কসমের বিষয়ে] সন্তুষ্ট থাকার নির্দেশ।

৩। আল্লহর নামে কসম করার পর, যে উহাতে সন্তুষ্ট থাকে না, তার প্রতি ভয় প্রদর্শন ও হুঁশিয়ারি উচ্চারণ।

[ওয়াহিদ অর্থাৎ শাস্তির হুশিয়ারী] এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ, এ ধরনের আচরণ বেয়াদবি এবং আল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শন পরিত্যাগ করার শামিল।

আর যে ব্যক্তি প্রতিপক্ষের কোন অশ্লীলতা এবং মিথ্যা সম্পর্কে অবগত আছে, সে তার [প্রতিপক্ষের] যতটুকু মিথ্যা নিশ্চিত ভাবে জানে ততটুকুর ব্যাপারে হলফ করবে। এমতাবস্থায় প্রতিপক্ষের মিথ্যা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকার কারণে তার [মিথ্যা সম্পর্কিত] হলফ وعيد [ওয়াইদ] এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে না। কেননা তার [মিথ্যুক] প্রতিপক্ষের অন্তরে আল্লাহর প্রতি কোন সম্মান নেই। যার ফলে তার হলফের ব্যাপারে মানুষ নিশ্চিত হতে পারে। অতএব প্রতিপক্ষের মিথ্যা সম্পর্কে নিশ্চিত জেনে হলফ করলে তা ওয়াঈদ (وعيد) অর্থাৎ শাস্তি দেয়ার হুঁশিয়ারির অন্তর্ভুক্ত হবে না। কারণ তার অবস্থা নিশ্চিতভাবে ত্রুটিমুক্ত।

৪৪ তম অধ্যায় .
‘আল্লাহ এবং আপনি যা চেয়েছেন’ বলা

১- কু তাই লা হতে বর্ণিত আছে, একজন ইহুদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াশিলম এর কাছে এসে বলল, ‘আপনারাও আল্লহর সাথে শিরক করে থাকেন।’ কারণ আপনারা বলে থাকেন, ماشاءالله وشئت আল্লহ এবং আপনি যা চেয়েছেন। আপনারা আরো বলে থাকেন والكعبة অর্থাৎ কাবার কসম। এরপর রাসূল শল্লল্লহু আলাইহি ওয়াসালম বললেন, মুসলমানদের মধ্যে যারা কসম বা হলফ করতে চায়, তারা যেন বলে ورب الكعبة ‘কাবার রবের কসম আর যেন ماشاء الله ثم شئت আল্লহ যা চেয়েছেন অতঃপর আপনি যা চেয়েছেন’ একথা বলে। (নাসায়ী)

২- ইবনে আব্বাস রা. হতে আরো একটি হাদিসে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লল্লহু আলাইহি ওয়াসালম এর উদ্দেশ্যে বলল, ماشاء الله وشئت [আপনি এবং আল্লহ যা ইচ্ছা করেছেন] তখন রাসূল সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লম বললেন, أجعلتنى لله ندا “তুমি কি আল্লাহর সাথে আমাকে শরিক করে ফেলেছ?” আসলে আল্লহ যা ইচ্ছা করেছেন, তা একক ভাবেই করেছেন।

৩। আয়েশা রা. এর মায়ের দিক দিয়ে ভাই, তোফায়েল থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি স্বপ্নে দেখতে পেলাম, আমি কয়েকজন ইয়াহুদীর কাছে এসেছি। আমি তাদেরকে বললাম,

---

ব্যাখ্যা

এ অধ্যায়টি ইতিপূর্বে আলোচিত অধ্যায় فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ أَنْدَادًا এর আওতাধীন।

তোমরা অবশ্যই একটা ভাল জাতি, যদি তোমরা ওযাইরকে আল্লহর পুত্র না বলতে। তারা বলল, 'তোমরাও অবশ্যই একটি ভাল জাতি যদি তোমরা ماشاء الله وشاء محمد [আল্লহ যা ইচ্ছা করেছেন এবং মুহাম্মদ যা ইচ্ছা করেছেন] এ কথা না বলতে! অতঃপর নাসারাদের কিছু লোকের কাছে আমি গেলাম এবং বললাম, 'ঈসা আ. আল্লহর পুত্র' এ কথা না বললে তোমরা একটি উত্তম জাতি হতে। তারা বলল, 'তোমরাও ভাল জাতি হতে, যদি তোমরা এ কথা না বলতে, 'আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন এবং মুহাম্মদ যা ইচ্ছা করেছেন।' সকালে এ (স্বপ্নের) খবর যাকে পেলাম তাকে দিলাম। তারপর রাসূল সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লম এর কাছে এলাম এবং তাকে আমার স্বপ্নের কথা বললাম। তিনি বললেন, 'এ স্বপ্নের কথা কি আর কাউকে বলেছ?" বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি আল্লহর প্রশংসা করলেন এবং গুণ বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন, "তোফায়েল একটা স্বপ্ন দেখেছে, যার খবর তোমাদের মধ্যে যাকে বলার বলেছে। তোমরা এমন কথাই বলেছ, যা বলতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। আর আমিও তোমাদেরকে এভাবে বলতে নিষেধ করছি। অতএব তোমরা ماشاء الله وشاء محمد অর্থাৎ 'আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন এবং মুহাম্মদ স. যা ইচ্ছা করেছেন' একথা বলো না বরং তোমরা বলো, ماشاء الله وحده অর্থাৎ 'একক আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন।"

এ অধ্যায় থেকে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলো জানা যায় .

১। ছোট শিরক সম্পর্কে ইহুদিরাও অবগত আছে।

২। কুপ্রবৃত্তি সম্পর্কে মানুষের উপলব্ধি থাকা।

৩। রাসূল সাল্লল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লম এর উক্তি أجعلتنى لله ندا 'তুমি কি আমাকে আল্লহর শরিক বানিয়েছো?' [অর্থাৎ ماشاء الله وشئت এ কথা বললেই যদি শিরক হয়] তাহলে সে ব্যক্তি অবস্থা কি দাঁড়ায়, যে ব্যক্তি বলে, يا أكرم الخلق ما لي من ألوذبه سواك হে সৃষ্টির সেরা, আপনি ছাড়া আমার আশ্রয়দাতা কেউ নেই এবং [এ কবিতাংশের] পরবর্তী দুটি লাইন। [অর্থাৎ উপরোক্ত কথা বললে অবশ্যই বড় ধরনের শির কী গুনাহ হবে।]

৪। নবী সাল্ললহু আলাইহি ওয়াসাল্লম এর বাণী يمنعنى كذا وكذا দ্বারা বুঝা যায় যে, এটা শিরকে আকবার [বড় শিরক] এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

৫। নেক স্বপ্ন ওহির শ্রেণিভুক্ত।
৬। স্বপ্ন শরিয়তের কোন কোন বিধান জারির কারণ হতে পারে।

৪৫তম অধ্যায় .

যে ব্যক্তি জমানাকে গালি দেয় সে আল্লাহকে কষ্ট দেয়

১। আল্লহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ (الجاثية: ٢٤)

"অবিশ্বাসীরা বলে, 'শুধু দুনিয়ার জীবনই আমাদের জীবন। আমরা এখানেই মরি ও বাঁচি। জমানা ব্যতীত অন্য কিছুই আমাদেরকে ধ্বংস করতে পারে না।" (জাসিয়া : ২৪)

২। সহীহ হাদিসে আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসালম বলেছেন, আল্লহ তাআলা এরশাদ করেন,

يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر، وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار.

ব্যাখ্যা

যে ব্যক্তি জমানাকে গালি দেয় সে মূলত . আল্লহকেই গালি দেয়

জাহেলি যুগের লোকদের মধ্যে জমানাকে গালি দেয়ার বহুল প্রচলন ছিল। কতিপয় ফাসেক, পাগল আর আহাম্মক লোক এ বিষয়ে জাহেলদের অনুসরণ করে চলছে। এসব লোক যখনই দেখতে পেয়েছে যে, যুগ-জমানার গতি তাদের কাঙ্ক্ষিত স্বার্থের বিপরীতে প্রবাহিত হচ্ছে, তখনই কাল ও সময়কে তারা গালি দিতে শুরু করেছে। এমনকি তারা জমানাকে অভিশাপও দিয়েছে। দীন সম্পর্কে জ্ঞানের স্বল্পতা, অহমিকা, আর চরম মুর্খতা থেকেই এ বদভ্যাসের জন্ম হয়। জমানার কাছে কোন কার্য ক্ষমতাই নেই। জমানা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। জমানায় যা সংঘটিত হচ্ছে তার পিছনে পরাক্রমশালী, বিজ্ঞানময় ও কৌশলি আল্লাহর তাআলার দক্ষ পরিচালনা কাজ করছে।

“আদম সন্তান আমাকে কষ্ট দেয়। কারণ, সে জমানা বা কালকে গালি দেয়। অথচ আমিই হচ্ছি জমানা। আমি [জমানার] রাত দিনকে পরিবর্তন করি।” অন্য বর্ণনায় আছে,

لا تسبوا الدهر، فإن الله هو الدهر.

“তোমরা জমানাকে গালি দিওনা। কারণ, আল্লহই হচ্ছেন যমানা।”

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় .

১। কাল বা জমানাকে গালি দেয়া নিষেধ।

২। জমানাকে গালি দেয়া আল্লহকে কষ্ট দেয়ারই নামান্তর।

৩। فإن الله هو الدهر ‘আল্লহই হচ্ছেন জমানা’ রাসূল সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এর বাণীর মধ্যে গভীর চিন্তার বিষয় নিহিত আছে।

৪। বান্দার অন্তরে আল্লহকে গালি দেয়ার ইচ্ছা না থাকলেও অসাবধনতা বশত: মনের অগোচরে তাঁকে গালি দিয়ে ফেলতে পারে।

তাই জমানাকে গালি দিলে এবং এর দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করলে সে গালি ও দোষ-ত্রুটি প্রকৃতপক্ষে এর মহানিয়ন্ত্রক ও পরিচালকের উপর বর্তায়।

দ্বীনের ক্ষেত্রে জ্ঞানের স্বল্পতার অর্থই হচ্ছে জ্ঞান ও বুদ্ধির স্বল্পতা। এতে দুঃখ দুর্দশাই শুধু বৃদ্ধি পায়, আর অঘটন বড় আকার ধারণ করে, প্রয়োজনীয় ধৈর্যের দ্বারা বন্ধ হয়ে যায়। এ অবস্থা তাওহীদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

মোমিন ব্যক্তি জানে যে, যাবতীয় পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে আল্লহ তা’আলার লিখন ফয়সালা [বিধি-লিপি] ও হিকমতের ইশারায়। তাই আল্লাহও তাঁর রাসূল যতক্ষণ পর্যন্ত কোন জিনিসের দোষারোপ না করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে দোষী করা যায় না। এক্ষেত্রে মোমিন ব্যক্তি আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকে; তাঁর নির্দেশকে মাথা পেতে নেয়। এভাবেই তার তাওহীদ পরিপূর্ণ হয় এবং হৃদয়ে এক অনাবিল প্রশান্তি অনুভব করে।

৪৬তম অধ্যায় .
কাজীউল কুজাত [মহা বিচারক] প্রভৃতি নামকরণ প্রসঙ্গ

১। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত সহীহ হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

إن أخنع اسم عند الله، رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله.

“আল্লহ তাআলার কাছে ঐ ব্যক্তির নাম সবচেয়ে নিকৃষ্ট, যার নামকরণ করা হয় ‘রাজাধিরাজ’ বা ‘প্রভুর প্রভু’। আল্লহ ব্যতীত কোন প্রভু নেই”। (বুখারী)

সুফিয়ান সওরী বলেছেন, ‘রাজাধিরাজ’ কথাটি ‘শাহানশাহ’ এর মতই একটি নাম। আরো একটি বর্ণনা মতে রাসূল সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লম এরশাদ করেন-

أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه.

ব্যাখ্যা

‘কাজীউল কুজাত’ এবং এ জাতীয় নাম করণ প্রসঙ্গে এবং আল্লহর নামের প্রতি সম্মান প্রদর্শণার্থে নামের পরিবর্তন প্রসঙ্গে।

এ দু’টি শিরোনামই পূর্ববর্তী অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

[পূর্ববর্তী অধ্যায়ের] মূল কথা হচ্ছে, নিয়ত, কথা ও কাজের মধ্যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করা বান্দার অপরিহার্য কর্তব্য। তাই কেউ যেন এমন নাম করণ না করে যার মধ্যে আল্লহর নাম ও সিফাতের ক্ষেত্রে অংশীদারিত্বের কথা নিহিত আছে। যেমন ‘কাজীউল কুজাত’ [মহা বিচারক], অথবা ‘মালিকুল মুলুক’, ‘হাকিমুল হুককাম’ [মহা শাসক] অথবা আবুল হাকাম [মহা জ্ঞানী] প্রভৃতি। এ সবকিছুই হচ্ছে তাওহীদ এবং আল্লহর আসমা ও সিফাত [নাম ও গুণাবলি] এর হেফাজতের জন্য, আর শিরকের

অর্থাৎ “ কেয়ামতের দিন আল্লহর কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট এবং খারাপ ব্যক্তি হচ্ছে [যার নামকরণ করা হচ্ছে রাজাধিরাজ]’। উল্লেখিত হাদিসে أخنع শব্দের অর্থ হচ্ছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় .

১। ‘রাজাধিরাজ’ নামকরণের প্রতি নিষেধাজ্ঞা।

২। ‘রাজাধিরাজ’ এর অর্থ সুফিয়ান সওরী কর্তৃক বর্ণিত ‘শাহানশাহ’ এর অর্থের অনুরূপ।

৩। বর্ণিত ব্যাপারে এবং এ জাতীয় বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা। এক্ষেত্রে অন্তরে কি নিয়ত আছে তা বিবেচ্য নয়।

৪। বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা সবই আল্লহর উদ্দেশ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

যাবতীয় পথ ও মাধ্যম বন্ধ করার জন্য। এমনকি সেই সব আশংকাজনক শব্দাবলির প্রয়োগ বন্ধ করার জন্য, যা ধীরে- ধীরে মানুষকে আল্লহর খাসিয়ত ও হকের ব্যাপারে অংশীদারিত্বের দিকে নিয়ে যায়।

৪৭তম অধ্যায়
আল্লাহর সম্মানার্হে [শিরকী] নামের পরিবর্তন

১। আবু শুরাইহ হতে বর্ণিত আছে এক সময় তার কুনিয়াত ছিল আবুল হাকাম [জ্ঞানের পিতা] রাসূল সাল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লম তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

إن الله هو الحكم، وإليه الحكم.

"আল্লাহ তাআলাই হচ্ছে জ্ঞান সত্তা এবং তিনিই জ্ঞানের আধার" তখন আবু শুরাইহ বললেন, 'আমার কওমের লোকেরা যখন কোন বিষয়ে মতবিরোধ করে, তখন ফয়সালার জন্য আমার কাছে চলে আসে। তারপর আমি তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেই। এতে উভয় পক্ষই সন্তুষ্ট হয়ে যায়।' রাসূল সাল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লম একথা শুনে বললেন, এটা কতইনা ভাল! তোমার কি সন্তানাদি আছে? আমি বললাম, 'শুরাইহ' 'মুসলিম' এবং 'আবদুল্লাহ' নামের তিনটি ছেলে আছে।' তিনি বললেন, 'তাদের মধ্যে সবার বড় কে?' আমি বললাম,'শুরাইহ'। তিনি বললেন, "অতএব তুমি আবু শুরাইহ" [শুরাইহের পিতা] (আবু দাউদ)।

এ অধ্যায় থেকে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলো জানা যায় .

১। আল্লহর আসমা ও সিফাত অর্থাৎ নাম ও গুণাবলির সম্মান করা; যদিও এর অর্থ বান্দার উদ্দেশ্য না হয়।

২। আল্লহর নাম ও সিফাতের সম্মানার্হে নাম পরিবর্তন করা।

৩। কুনিয়াতের জন্য বড় সন্তানের নাম পছন্দ করা।

৪৮ তম অধ্যায় .

আল্লাহর জিকির, কুরআন এবং রাসূল সম্পর্কিত কোন বিষয় নিয়ে খেল- তামাশা করা প্রসঙ্গ

১। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ (التوبة :٦٥)

"আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তবে তারা অবশ্যই বলবে, আমরা খেল- তামাশা করছিলাম।" (ফুসসিলাত . ৫০)

২। ইবনে ওমর, মুহাম্মদ বিন কা'ব, যায়েদ বিন আসলাম এবং কাতাদাহ রা. থেকে বর্ণিত আছে, [তাদের একের কথা অপরের কথার মধ্যে সামঞ্জস্য আছে] তাবুক যুদ্ধে একজন লোক বলল, এ কারীদের [কুরআন পাঠকারীর] মত এত অধিক পেটুক, কথায় এত অধিক মিথ্যুক এবং যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর সাক্ষাতে এত অধিক ভীরু আর কোন লোক দেখিনি। অর্থাৎ লোকটি তার কথা দ্বারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লম এবং তাঁর কারী সাহাবায়ে কেরামের দিকে ইঙ্গিত করেছিলো। আওফ বিন মালেক লোকটিকে বললেন, 'তুমি মিথ্যা কথা বলেছ। কারণ, তুমি মুনাফেক।'

ব্যাখ্যা

আল্লহর জিকির, কুরআন ও রাসূল সম্পর্কিত বিষয়ে যে ব্যক্তি হাসি-তামাশা করে তার পরিণাম হচ্ছে এই যে, তার এ কাজটি সম্পূর্ণরূপে ঈমানের পরিপন্থী। এ কাজ মানুষকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয়। কারণ, দ্বীনের মূল বিষয় হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার তাঁর যাবতীয় ঐশী গ্রন্থাবলি এবং রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনয়ন করা[তাই এ মূল বিষয় নিয়ে তামাশা করার নামই কুফরি]

আমি অবশ্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ খবর জানাবো। আওফ তখন এ খবর জানানোর জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে চলে গেলেন। গিয়ে দেখলেন কুরআন তাঁর চেয়েও অগ্রগামী [অর্থাৎ আওফ পৌঁছার পূর্বেই ওহির মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যাপারটি জেনে ফেলেছেন] এ ফাঁকে মুনাফেক লোকটি তার উটে চড়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে চলে আসল। তারপর সে বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল, চলার পথে আমরা অন্যান্য পথচারীদের মত পরস্পরের হাসি, রং- তামাশা করছিলাম' যাতে করে আমাদের পথ চলার কষ্ট লাঘব হয়। ইবনে ওমর রা. বলেন, এর উটের গদির রশির সাথে লেগে আমি যেন তার দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম। পাথর তার পায়ের উপর পড়ছিল, আর সে বলছিল, 'আমরা হাসি ঠাট্টা করছিলাম।' তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴿التوبة:٦٥﴾

"তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াত [কুরআন] এবং তাঁর রাসূলের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছিলে?

এসব বিষয়গুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। আর এগুলো নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করা এবং হাসি তামাশা করা কুফরি করার চেয়েও জঘন্য। এ কথাগুলো জানা থাকা আমাদের জন্য অতীব প্রয়োজন। এ রকম করা নিঃসন্দেহে কুফরি কাজ। তদুপরি এতে রয়েছে মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন করা এবং অবজ্ঞা প্রদর্শন করার মানসিকতা।
কাফের দু ধরনের .

এক . معرضون (মু'রিদূন) যারা আল্লাহ ও রাসূলকে অস্বীকার করে।

দুই . معارضون [মুআ'রিদুন] যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।

আল্লাহ, তাঁর দীন এবং তাঁর রাসূলের দোষ ও দুর্নাম গায়। এরা জঘন্য রকমের কুফরি করে, চরম অশান্তির সৃষ্টি করে। যারা আল্লাহ, রাসূল এবং কুরআন নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ এবং রং তামাশা করে তারাও এর শ্রেণিভুক্ত।

তিনি তার দিকে [মুনাফেকের দিকে] দৃষ্টিও দেননি। এর অতিরিক্ত কোন কথাও বলেননি।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে একথা অনুধাবন করা যে, আল্লাহ, কুরআন ও রাসূলের সাথে যারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করে তারা কাফের।

২। এ ঘটনা সংশ্লিষ্ট আয়াতের তাফসীর ঐ ব্যক্তির জন্য যে, এ ধরনের কাজ করে অর্থাৎ আল্লহ, কুরআন ও রাসূলের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে।

৩। চোগলখুরী এবং আল্লহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে নসিহতের মধ্যে পার্থক্য।

৪। এমন ওজরও রয়েছে যা গ্রহণ করা উচিত নয়।

৪৯তম অধ্যায় .

১। আল্লহ তাআলার বাণী .

وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي (فصلت:٥٠)

"দুঃখ- দুর্দশার পর যদি আমি মানুষকে আমার রহমতের আস্বাদ গ্রহণ করাই, তাহলে সে অবশ্যই বলে, এ নেয়ামত আমারই জন্য হয়েছে।" (ফুসসিলাত . ৫০) বিখ্যাত মুফাসসির মুজাহিদ বলেন, 'ইহা আমরই জন্য' এর অর্থ হচ্ছে, 'আমার নেক আমলের বদৌলতেই এ নেয়ামত দান করা হয়েছে, আমিই এর হকদার।' ইবনে আব্বাস রা. বলেন, সে এ কথা বলতে চায়, 'নেয়ামত আমার আমলের কারণেই' এসেছে অর্থাৎ এর প্রকৃত হকদার আমিই।

আল্লহ তাআলা আরো বলেছেন,

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي (القصص :٧٨)

ব্যাখ্যা

আল্লাহ তাআলার বাণী

وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ

এখানে আলোচিত অধ্যায়টির উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে ব্যক্তি দাবি করে, যেসব নেয়ামত ও রিজিক সে প্রাপ্ত হয়েছে, তার সবই হচ্ছে স্বীয় পরিশ্রম, দক্ষতা এবং বিচক্ষণতার ফসল। অথবা যে ব্যক্তি মনে করে, আল্লহর উপর তার প্রাপ্য হক হিসেবেই সে [এসব] প্রাপ্ত নেয়ামতের হকদার, তাকে এ কথা জানিয়ে দেয়া যে, এরকম ধারণা তাওহীদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কেননা ঐ ব্যক্তিই সত্যিকারের মোমিন যে আল্লহ তাআলার যাবতীয় জাহেরী ও বাতেনী নেয়ামতের স্বীকৃতি দেয়, এর জন্য আল্লাহর প্রশংসা করে এবং নেয়ামতগুলোকে আল্লাহর তাআলার দয়া ও করুণা মনে করে। সাথে সাথে এসব

" সে বলে, 'নিশ্চয়ই এ নেয়ামত আমার ইলম ও জ্ঞানের জন্য আমাকে দেয়া হয়েছে।" (কাসাস ঃ৭৮)

কাতাদাহ রা. বলেন, 'উপার্জনের রকমারি পন্থা সম্পর্কিত জ্ঞান থাকার কারণে আমি এ নেয়ামত প্রাপ্ত হয়েছি।' অন্যান্য মুফাসসিরগণ বলেন 'আল্লাহ তাআলার ইলম মোতাবেক আমি এর [নেয়ামতের] হকদার। আমার মর্যাদার বদৌলতেই এ নেয়ামত প্রাপ্ত হয়েছি।'
মুজাহিদের এ কথার অর্থই উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা বুঝানো হয়েছে।

২। আবু হুরাইয়রা রা. হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূল সাল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লমকে এ কথা বলতে শুনেছেন,

ثلاثة من بنى إسرائيل : أبرص وأقرع و أعمى فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص ... إلى آخر الحديث.

"বর্ণিত ইসরাইল বংশে তিনজন লোক ছিল . যাদের একজন ছিল কুষ্টরোগী, আরেকজন টাক পড়া, অপরজন ছিল অন্ধ। এমতাবস্থায় আল্লহ তাআলা তাদেরকে পরীক্ষা করতে চাইলেন। তখন তাদের কাছে তিনি ফেরেস্তা পাঠালেন। কুষ্টরোগীর কাছে ফেরেস্তা এসে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস কি? সে বলল, 'সুন্দর চেহারা এবং সুন্দর ত্বক [শরীরের চামড়া]। আর যে রোগের কারণে মানুষ আমাকে ঘৃণা করে তা থেকে মুক্তি আমার কাম্য। তখন ফেরেস্তা তার শরীরে হাত বুলিয়ে দিল। এতে তার রোগ দূর হয়ে গেলো তাকে সুন্দর রং আর

নেয়ামত দ্বারা তাঁর আনুগত্য করার জন্য তাঁরই কাছে সাহায্য কামনা করে। আল্লাহর উপর তার কোন অধিকার আছে বলে সে মনে করে না। বরং তার উপরই আল্লহর সকল অধিকার রয়েছে। সকল বিবেচনায় সে কেবল আল্লহরই বান্দা। এ বিশ্বাসের মাধ্যমেই বান্দার ঈমান ও তাওহীদ শক্তিশালী হয়। এর বিপরীত ধারণা ও বিশ্বাসের মাধ্যমে আল্লহর নেয়ামতের কুফরিই প্রমাণিত হয়। আরো প্রমাণিত হয় বান্দার আত্ম-অহংকার ও আত্ম প্রশংসা যা মানুষের জন্য খুবই দোষের বিষয়।

সুন্দর ত্বক দেয়া হলো। তারপর ফেরেস্তা তাকে জিজ্ঞেস করল, "তোমার প্রিয় সম্পদ কি? সে বলল, "উট অথবা গরু"। [ইসহাক অর্থাৎ হাদিস বর্ণনাকারী উট কিংবা গরু এ দুয়ের মধ্যে সন্দেহ করছেন] তখন তাকে দশটি গর্ভবতী উট দেয়া হলো। ফিরিস্তা তার জন্য দোয়া করে বলল, "আল্লহ এ সম্পদে তোমাকে বরকত দান করুন।"

তারপর ফেরেস্তা টাক পড়া লোকটির কাছে গিয়ে বলল, "তোমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় জিনিস কি?" লোকটি বলল, "আমার প্রিয় জিনিস হচ্ছে সুন্দর চুল। আর লোকজন আমাকে যার জন্য ঘৃণা করে তা থেকে মুক্ত হতে চাই।" ফেরেস্তা তখন তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। এতে তার মাথার টাক দূর হয়ে গেলো। তাকে সুন্দর চুল দেয়া হলো। অতঃপর ফেরেস্তা তাকে জিজ্ঞেস করল, "কোন সম্পদ তোমার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয়? সে বলল, "উট অথবা গরু।" তখন তাকে গর্ভবতী গাভি দেয়া হলো। ফেরেস্তা তার জন্য দোয়া করে বলল, "আল্লহ এ সম্পদে তোমাকে বরকত দান করুন। "

তারপর ফেরেস্তা অন্ধ লোকটির কাছে এসে বলল, "তোমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় বস্তু কি?" লোকটি বলল, "আল্লহ যেন আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেন। যার ফলে আমি লোকজনকে দেখতে পাব, এটাই আমার প্রিয় জিনিস।" ফেরেস্তা তখন তার চোখে হাত বুলিয়ে দিল। এতে লোকটির দৃষ্টিশক্তি আল্লহ তাআলা ফিরিয়ে দিলেন। ফেরেস্তা তাকে বলল, "কি সম্পদ তোমার কাছে প্রিয়? সে বলল, "ছাগল আমার বেশি প্রিয়।" তখন তাকে একটি গর্ভবতী ছাগল দেয়া হলো। তারপর ছাগল বংশ বৃদ্ধি করতে লাগলো। এমনিভাবে উট ও গরু বংশ বৃদ্ধি করতে লাগলো। অবশেষে অবস্থা এই দাঁড়াল যে, একজনের উট দ্বারা মাঠ ভরে গেলো, আরেকজনের গরু দ্বারা মাঠ পূর্ণ হয়ে গেলো এবং আরেকজনের ছাগল দ্বারা মাঠ ভর্তি হয়ে গেলো।

এমতাবস্থায় একদিন ফেরেস্তা তার স্বীয় বিশেষ আকৃতিতে কুষ্ঠ রোগীর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, "আমি একজন মিসকিন।" আমার সফরের সম্বল শেষ হয়ে গেছে [আমি খুবই বিপদগ্রস্ত] আমার গন্তব্যে পৌছার জন্য প্রথমে আল্লহর তারপর আপনার সাহায্য দরকার। যে আল্লহ আপনাকে এত সুন্দর রং এবং সুন্দর ত্বক দান করেছেন, তাঁর নামে আমি আপনার কাছে একটা উট সাহায্য চাই, যাতে আমি নিজ গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে পারি। তখন

লোকটি বলল, ‘দেখুন, আমার অনেক দায়-দায়িত্ব আছে, হকদার আছে।’ ফেরেস্তা বলল, ‘আমার মনে হয়, আমি আপনাকে চিনি।’ আপনি কি কুষ্ঠ রোগী ছিলেন না? আপনি খুব গরিব ছিলেন? লোকজন আপনাকে খুব ঘৃণা করতো। তারপর আল্লাহ আপনাকে এ সম্পদ দান করেছেন। তখন লোকটি বলল, ‘এ সম্পদ আমার পূর্ব পুরুষ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। ফেরেস্তা তখন বলল, “তুমি যদি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকো তাহলে আল্লহ যেন তোমাকে পূর্বের অবস্থা ফিরিয়ে দেন।”

তারপর ফেরেস্তা মাথায় টাক- পড়া লোকটির কাছে গেল এবং ইতিপূর্বে কুষ্ঠ রোগীর সাথে যে ধরনের কথা বলেছিল, তার [টাক পড়া লোকটির] সাথেও সে ধরনের কথা বলল। প্রতি উত্তরে কুষ্ঠ রোগী যে ধরনের জবাব দিয়েছিল, এ লোকটিও সেই একই ধরনের জবাব দিল। তখন ফেরেস্তাও আগের মতই বলল, ‘যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও তাহলে আল্লহ তাআলা যেন তোমাকে তোমার পূর্বের অবস্থা ফিরিয়ে দেন।’ অতঃপর ফেরেস্তা স্বীয় আকৃতিতে অন্ধ লোকটির কাছে গিয়ে বলল, ‘আমি এক গরিব মুসাফির। আমার পথের সম্বল নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। প্রথম আল্লহর তারপর আপনার সাহায্য কামনা করছি। যিনি আপনার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন, তাঁর নামে একটি ‘ছাগল’ আপনার কাছে সাহায্য চাই, যাতে আমার সফরে নিজ গন্তব্যস্থানে পৌছতে পারি।’ তখন লোকটি বলল, ‘আমি অন্ধ ছিলাম। আল্লহ তাআলা আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। আপনার যা খুশি নিয়ে যান, আর যা খুশি রেখে যান। আল্লহর কসম, আল্লহর নামে আপনি আজ যা নিয়ে যাবেন, তার বিন্দুমাত্র আমি বাধা দেব না।’ তখন ফেরেস্তা বলল, ‘আপনার মাল আপনি রাখুন। আপনাদেরকে শুধুমাত্র পরীক্ষা করা হলো। আপনার আচরণে আল্লহ সন্তুষ্ট হয়েছেন, আপনার সঙ্গী দ্বয়ের আচরণে অসন্তুষ্ট হয়েছেন।” (বুখারী ও মুসলিম)

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় .

১। সূরা ফুসসিলাতের ৫০ নং আয়াতের তাফসীর।

২। لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي এর অর্থ।

৩। إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي এর অর্থ।

৪। আশ্চর্য ধরনের কিসসা এবং তাতে নিহিত উপদেশাবলী।

৫০তম অধ্যায় .

১। আল্লহ তাআলার বাণী .

فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا (الأعراف: ١٩٠)

“অতঃপর আল্লাহ যখন উভয়কে একটি সুস্থ ও নিখুঁত সন্তান দান করলেন, তখন তারা তাঁর দানের ব্যাপারে অন্যকে তাঁর শরিক গণ্য করতে শুরু করল।” (আ’রাফ . ১৯০)

ইবনে হজম রহ.) বলেন, উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, এমন প্রত্যেক নামই হারাম, যা দ্বারা গাইরুল্লাহর ইবাদত করার অর্থ বুঝায়। যেমন, আবদু ওমর, আবদুল কা’বা এবং এ জাতীয় অন্যান্য নাম। তবে আবদুল মোত্তালিব এর ব্যতিক্রম। ইবনে আব্বাস রা. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, ‘আদম আ. যখন বিবি হাওয়ার সাথে মিলিত হলেন, তখন হাওয়া গর্ভবতী হলেন। এমতাবস্থায় শয়তান আদম ও হাওয়ার কাছে এসে বলল, ‘আমি তোমাদের সেই বন্ধু ও সাথি, যে নাকি তোমাদের জান্নাত থেকে বের

ব্যাখ্যা

আলোচ্য অধ্যায়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে, এটা উপলব্ধি করা যে, যাদেরকে আল্লহ তাআলা সন্তানাদি দান করেছেন এবং এর সাথে সাথে সন্তানদেরকে শারীরিক ভাবে নিখুঁত রেখে [বিকলাঙ্গ না বানিয়ে] নেয়ামতের পূর্ণতা দান করেছেন, এর সবই হচ্ছে তাদের উপর আল্লহর এক বিরাট করুণা।

আল্লহর বান্দারা তাদের দ্বীনের ব্যাপারে সৎ ও নেককার হলেই তাদের তাওহীদ ও ঈমানের পূর্ণতা অর্জিত হবে। তাদের করণীয় হচ্ছে, আল্লহর অপরিসীম নেয়ামতের জন্য তাঁর শুকরিয়া আদায় করা এবং সন্তানদেরকে গাইরুল্লহর বান্দা না বানানো অথবা নেয়ামতকে গাইরুল্লহর সাথে সম্পৃক্ত না করা। কেননা এসব হচ্ছে আল্লহর নেয়ামতের কুফরি এবং তাওহীদের পরিপন্থী।

করেছে। তোমরা অবশ্যই আমার আনুগত্য করো, নতুবা গর্ভস্থ সন্তানের মাথায় উটের শিং গজিয়ে দিবো, তখন সন্তান তোমার পেট কেটে বের করতে হবে। আমি অবশ্যই একাজ করে ছাড়ব।"

শয়তান এভাবে তাদেরকে ভয় দেখাচ্ছিল। শয়তান বলল, তোমরা তোমাদের সন্তানের নাম 'আব্দুল হারিছ' রেখো। তখন তাঁরা শয়তানের আনুগত্য করতে অস্বীকার করলেন। অতঃপর তাদের একটি মৃত সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো। আবারও বিবি হাওয়া গর্ভবতী হলেন। শয়তানও পুনরায় তাঁদের কাছে এসে পূর্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিলো। এর ফলে তাঁদের অন্ত রে সন্তানের প্রতি ভালোবাসা তীব্র হয়ে দেখা দিলো। তখন তাঁরা সন্তানের নাম 'আবদুল হারিস' রাখলেন। এভাবেই তাঁরা আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতের মধ্যে তাঁর সাথে শরিক করে ফেললেন। এটাই হচ্ছে جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا এ আয়াতের তাৎপর্য (ইবনে আবি হাতিম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)

কাতাদাহ থেকে সহীহ সনদে অপর একটি হাদিসে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, তাঁরা আল্লহর সাথে শরিক করেছিলেন আনুগত্যের ক্ষেত্রে ইবাদতের ক্ষেত্রে নয়।'

মুজাহিদ থেকে সহীহ সনদে لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, সন্তানটি মানুষ না হওয়ার আশঙ্কা তাঁরা [পিতা-মাতা] করেছিলেন। '

[হাসান, সাঈদ প্রমুখের কাছ থেকে এর অর্থ উল্লেখ করা হয়েছে।]

এ অধ্যায় থেকে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলো জানা যায় :

১। যেসব নামের মধ্যে গাইরুলহর ইবাদতের অর্থ নিহিত রয়েছে সে নাম রাখা হারাম।

২। সূরা আ'রাফের ১৯০ নং আয়াতের তাফসীর।

৩। আলোচিত অধ্যায়ে বর্ণিত শিরক হচ্ছে শুধুমাত্র নাম রাখার জন্য। এর দ্বারা হাকিকত [অর্থাৎ শিরক করা] উদ্দেশ্য ছিল না।

৪। আল্লহর পক্ষ থেকে একটি নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ কন্যা সন্তান লাভ করা একজন মানুষের জন্য নেয়ামতের বিষয়।

৫। আল্লহর আনুগত্যের মধ্যে শিরক এবং ইবাদতের মধ্যে শিরকের ব্যাপারে সালাফে-সালেহীন পার্থক্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

৫১তম অধ্যায় .

আল্লহ তাআলার আসমায়ে হুসনা [বা সুন্দরতম নামসমূহ]

১। আল্লহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ (الأعراف: ١٨٠)

"আল্লহর সুন্দর সুন্দর অনেক নাম রয়েছে। তোমরা এসব নামে তাঁকে

ব্যাখ্যা

আল্লহ তাআলার বাণী .

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ

"আল্লহর অনেক সুন্দর নাম রয়েছে। এ সব নামে তোরা তাঁকে ডাকো। আর যারা তাঁর নামের মধ্যে বিকৃতি ঘটায় তাদেরকে পরিত্যাগ করো।"

তাওহীদের মূল কথা হচ্ছে, আল্লহ তাআলা নিজ সত্তার জন্য যা ঘোষণা করেছেন তাই তাঁর জন্য সাব্যস্ত করা। অথবা তাঁর রাসূল তাঁর [আল্লাহর] জন্য যেসব সুন্দর সুন্দর নামের ঘোষণা দিয়েছেন সেগুলো স্বীকার করে নেয়া। সাথে সাথে এ সব সুন্দর নামের মধ্যে যে সুমহান অর্থ ও পরিচয় নিহিত আছে তা অনুধাবন করা এবং এ সব নামের দ্বারা আল্লহর ইবাদত করা ও তাঁর কাছে দোয়া করা।

বান্দার দীন ও দুনিয়ার প্রতিটি আশা-আকাঙ্ক্ষার কথাই তাঁর রবের কাছে বলবে। এক্ষেত্রে তাঁর করণীয় হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার 'আসমায়ে হুসনা' থেকে যে নামটি তার প্রয়োজন মোতাবেক আল্লহর জন্য সবচেয়ে সমীচীন ও সামঞ্জস্যশীল, সে নামকে ওসীলা বানিযে তাঁকে ডাকা। যে ব্যক্তি রিজিক লাভের জন্য আল্লহকে ডাকতে চায়, তার উচিত রাযযাক নামে তাঁর কাছে প্রার্থনা করা। আর যদি বান্দা তার রবের রহমত ও মাগফিরাত লাভ করতে চায়, তাহলে তার উচিত 'রহীম', 'রহমান', 'বারর', 'আফউ', 'গাফুর', 'তাওয়াব', এসব নামে তাঁর কাছে প্রার্থনা করা।

এক্ষেত্রে সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার নাম ও গুণাবলি [আসমা ও সিফাত] এর মাধ্যমে তাঁকে ইবাদতের উদ্দেশ্যে ডাকা। তাঁকে ডাকার নিয়ম হচ্ছে,

ডাকো। আর যারা তাঁর নামগুলোকে বিকৃত করে তাদেরকে পরিহার করে চলো।” (আ’রাফ . ১৮০)

২। ইবনে আবি হাতিম ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ [তারা তাঁর নামগুলো বিকৃত করে] এর অর্থ হচ্ছে তারা শিরক করে।

৩। ইবনে আব্বাস রা. থেকে আরো বর্ণিত আছে, মুশরিকরা ‘ইলাহ’ থেকে ‘লাত’ আর ‘আজীজ’ থেকে ‘উযযা’ নামকরণ করছে।

৪। আ’মাস থেকে বর্ণিত আছে, মুশরিকরা আল্লহর

“আসমায়ে হুসনা” [সুন্দর ও পবিত্র নাম] এর অর্থগুলোকে মানসপটে নিয়ে আসা এবং হৃদয়ঙ্গম করা, যাতে পবিত্র নামগুলোর প্রভাবে প্রয়োজন মোতাবেক বান্দার অন্তর প্রভাবিত হয় এবং মারেফাতের মহিমায় হৃদয় ভরে যায়। যেমন ‘আজমত’ ‘কিবরিয়া’ ‘মাজদ’ ‘মাজদ’ ‘জালালাত’ এবং ‘হায়বত’ নামগুলো দ্বারা আল্লাহর প্রতি সম্মান ও মহত্ত্বের আবেগ ও উচ্ছ্বাসে বান্দার হৃদয় ভরে যায়। এমনিভাবে ‘জামাল’ ‘বিরর’, ‘ইহসান’, এবং ‘জুদ’ [অর্থাৎ সৌন্দর্য, দয়া, মায়া, করুণা ও বদান্যতা ইত্যাদি] গুণাবলির দ্বারা আল্লহর ভালোবাসা, প্রেম, প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার উদ্দীপনায় বান্দার অন্তর পরিতৃপ্ত হয়। আবার ‘ইজ্জত’, ‘হেকমত’, ‘ইলম’ ও ‘কুদরত’ ইত্যাদি গুণাবলির দ্বারা আল্লহর প্রতি আনুগত্য, কাকুতি- মিনতি ও বিনয়ের প্রেরণায় বান্দার অন্তরাত্মা উজ্জীবিত হয়। আল্লহর ইলম, খিবরাহ, ইহাত্বা, ‘মুরাকাবাহ’ এবং ‘মুশাহাদাহ’ অর্থাৎ জ্ঞান, প্রজ্ঞা, নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা, পর্যবেক্ষণ এবং প্রত্যক্ষ করার ক্ষমতা ইত্যাদি গুণাবলির দ্বারা বান্দার গতি- বিধি, চলা-ফেরা, কুচিন্তা ও খারাপ ইচ্ছা ইত্যাদি ক্ষেত্রে আল্লাহ তাকে পর্যবেক্ষণ করছেন, এ ধারণা তাকে সাবধানি বান্দায় পরিণত করে। এমনিভাবে ‘গিনা’ [সমৃদ্ধি], ‘লুতফ’ [মমত্ব] ইত্যাদি গুণাবলির দ্বারা বান্দা তার জীবনের সকল সময় ও সর্বাবস্থায় এবং প্রয়োজনের মুহূর্তে আল্লহর কাছে ধর্না দিতে পারে, তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে এ আশায় তার হৃদয় আশান্বিত হয় এবং অনাবিল শান্তিতে হৃদয় ভরে যায়।

বান্দা আল্লাহ তাআলার আসমা ও সিফাত [নাম ও গুণাবলি] এবং এর দ্বারা তাঁর ইবাদতের জ্ঞান লাভের কারণে স্বীয় অন্তরে আল্লহর যে ‘মা'রেফাত’, [পরিচয়] অর্জিত হয়, তার চেয়ে মহান, তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, এবং পরিপূর্ণ কোন জিনিস দুনিয়াতে সে অর্জন করতে পারে না। মহান আল্লহর পক্ষ থেকে তাঁরই ইবাদতের জন্য বান্দার উপর এটাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ উপহার। এটাই তাওহীদের প্রাণ ও জীবনী শক্তি। এ উপহারের দ্বারা

নামসমূহের মধ্যে এমন কিছু [শিরকী বিষয়] ঢুকিয়েছে যার অস্তিত্ব আদৌ তাতে নেই।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় .

১। আল্লাহর নামসমূহ যথাযথ স্বীকৃতি

২। আল্লহর নামসমূহ সুন্দরতম হওয়া।

৩। সুন্দর ও পবিত্র নামে আল্লহকে ডাকার নির্দেশ।

৪। যেসব মূর্খ ও বেইমান লোকেরা আল্লহর পবিত্র নামের বিরুদ্ধাচরণ করে তাদেরকে পরিহার করে চলা।

৫। আল্লাহর নামে বিকৃতি ঘটানোর ব্যাখ্যা।

যার জন্য উন্মুক্ত হয়েছে তার জন্য এমন খালেস তাওহীদ ও ঈমানের দ্বারও উন্মুক্ত হয়েছে, যা পরিপূর্ণ তাওহীদবাদী মহান ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অন্য কারো পক্ষে হাসিল করা সম্ভব নয়। আল্লহর আসমা ও সিফাতের স্বীকৃতিদান ও প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে এ মহান লক্ষ্য অর্জনের মূলমন্ত্র। পক্ষান্তরে আল্লহর আসমা ও সিফাতগুলোকে অস্বীকার করা, এ মহান উদ্দেশ্যের চরম পরিপন্থী।

আল্লাহর নাম ও গুণাবলি বিকৃতি করার বিভিন্ন ধরন .

এক . নাম ও গুণাবলি [আসমা ও সিফাত] এর অর্থগুলোকে অস্বীকার করা যেমন . 'জাহমিয়্যাহ' সম্প্রদায় এবং তাদের অনুসারীরা [আসমা ও সিফাতের অর্থগুলোকে অস্বীকার] করে থাকে।

দুই : আল্লাহর গুণাবলিকে মাখলুকের গুণাবলির সাথে তুলনা করা। যেমন . 'মুশাবিবহা', 'রাফেযা' ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা [আল্লাহর গুণাবলিকে মাখলুকের গুণাবলির সাথে তুলনা] করে থাকে।

তিন . আল্লাহর গুণবাচক নামে কোন মাখলুকের নামকরণ। যেমন . মুশরিকরা 'ইলাহ' নামের অনুকরণে 'লাত' নামক মূর্তির নামকরণ করেছে। এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলার 'আযীয' নামের অনুকরণে 'উয্যা' এবং 'মানান' নামের অনুকরণে 'মানাত' নামক মূর্তির নামকরণ করেছে। তারা আল্লাহর 'আসমায়ে হুসনা' থেকে উপরোক্ত নামগুলো গ্রহণ করেছে। অতঃপর সেগুলোকে আল্লাহর সাথে তুলনা করে ইবাদতের এমন অধিকার মূর্তিকে প্রদান করেছে, যা একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট।

আল্লাহ তা'আলার 'আসমা' অর্থাৎ নামের ক্ষেত্রে বিকৃতির মর্মার্থ হচ্ছে তাঁর নামগুলোকে স্বীয় উদ্দেশ্য থেকে সরিয়ে শব্দ, অর্থ, ঘোষণা, ব্যাখ্যা কিংবা পরিবর্তনের মাধ্যমে ভিন্ন অর্থে প্রবাহিত করা। উপরোক্ত প্রতিটি কাজই 'তাওহীদ এবং ঈমানের পরিপন্থী।

৫২তম অধ্যায় .
“আসসালামু আলাল্লহ” [আল্লাহর] উপর শান্তি বর্ষিত হোক] বলা যাবে না

১। সহীহ বুখারীতে ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লম এর সাথে নামাজে মগ্ন ছিলাম। তখন আমরা বললাম,

السلام على الله من عباده، السلام على فلان و فلان.

“আল্লাহর উপর তাঁর বান্দাদের পক্ষ থেকে শান্তি হোক, অমুক অমুকের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।” তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লম বললেন,

لا تقولوا: السلام على الله، فإن الله هو السلام

“আল্লাহর উপর শান্তি হোক, এমন কথা তোমরা বলো না। কেননা আল্লাহ নিজেই ‘সালাম’ [শান্তি]”

অ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় .

১। ‘সালাম’ এর ব্যাখ্যা।

২। ‘সালাম’ হচ্ছে সম্মানজনক সম্ভাষণ।

৩। এ [‘সালাম’] সম্ভাষণ আল্লাহর ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়।

৪। আল্লাহর ব্যাপারে ‘সালাম’ প্রযোজ্য না হওয়ার কারণ।

৫। বান্দাহগণকে এমন সম্ভাষণ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যা আল্লাহর জন্য সমীচীন ও শোভনীয়।

ব্যাখ্যা

‘আল্লাহর উপর শান্তি হোক’ এ কথা বলা যাবে না।

فإن الله هو السلام [আল্লাহই হচ্ছে সালাম বা শান্তি] এ কথার মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লম এর কারণ ও রহস্য বলেছেন। আল্লাহ তাআলা যাবতীয় দোষ-ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। যেমনিভাবে কোন মাখলুক তাঁর সমকক্ষ হওয়া থেকে তিনি মুক্ত। যাবতীয় বালা- মুসীবত থেকে বান্দাকে রক্ষা করার জন্য একমাত্র তিনিই হচ্ছেন ত্রাণ কর্তা। সকল মানুষ মিলেও তাঁর কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। কিন্তু তিনি তাদের ক্ষতি করতে সক্ষম। বান্দাগণ সবাই তাঁর কাছে মুখাপেক্ষী, তাদের সর্বাবস্থাতেই তাঁকে প্রয়োজন। কারণ, তিনিই হচ্ছে মুখাপেক্ষীহীন এবং প্রশংসিত।

৫৩তম অধ্যায় .

‘হে আল্লাহ তোমার মর্জি হলে আমাকে মাফ করো’ প্রসঙ্গে

১। সহীহ হাদিসে আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত আছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লম এরশাদ করেছেন ,

لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لى إن شئت’اللهم ارحمنى إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له.

“তোমাদের মধ্যে কেউ যেন একথা না বলে, ‘হে আল্লাহ, তোমার ইচ্ছা হলে আমাকে মাফ করে দাও, ‘হে আল্লাহ, তোমার ইচ্ছা হলে আমাকে করুণা করো’। বরং দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে। কেননা আল্লাহর উপর জবরদস্তি করার মত কেউ নেই।” (বুখারী)

ব্যাখ্যা

‘আল্লাহ তুমি চাইলে আমাকে মাফ কর’ প্রসঙ্গে

সমস্ত বিষয় যদিও আল্লাহর ইচ্ছা ও মর্জি মোতাবেক সম্পন্ন হয়, তথাপি বান্দার দীন উদ্দেশ্যাবলী যেমন, রহমত ও মাগফিরাত কামনা করা আবার দ্বীনের সহায়ক উদ্দেশ্যাবলী যেমন, সুস্থতা, রিজিক এবং অন্যান্য বিষয় চাওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা স্বীয় বান্দাকে নির্দেশ দিয়েছেন।

বান্দা তার রবের কাছে মনোযোগ ও দৃঢ়তার সাথে প্রার্থনা করবে এই মর্মে আল্লাহ তাআলা তাকে নির্দেশ দিয়েছেন। এ প্রার্থনাই হচ্ছে উবুদিয়্যাতের মূল এবং সারবস্তু। আর এটা এমন দৃঢ় প্রার্থনার মাধ্যমেই সম্ভব, যার মধ্যে আল্লাহর ইচ্ছার বিষয়টি জড়িত নয়। কারণ, রবের কাছে চাওয়ার জন্যই বান্দা আদিষ্ট হয়েছে [তাই আদিষ্ট বিষয়ে আদেশ দাতার নতুন করে ইচ্ছার প্রয়োজন নেই] রবের আদেশ পালনের মধ্যে কেবল কল্যাণই নিহিত আছে, কোন অকল্যাণ তাতে নেই। আর আল্লাহর জন্য কল্যাণ সাধন করা কোন কঠিন ব্যাপার নয়।

এ আলোচনার মাধ্যমে উপরোক্ত বিষয় এবং নির্দিষ্ট এমন সব বিষয়ের পার্থক্য করা যায়, যা প্রার্থনা করার মধ্যে মঙ্গল, অমঙ্গল ও উপকারিতার বিষয়টি নিশ্চিতভাবে বলা যায় না এবং যা অর্জন করা বান্দার জন্য কল্যাণকর বলে দৃঢ় বিশ্বাস নেই।

২। সহি মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে,

وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيئ أعطاه.

"আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার উৎসাহ উদ্দীপনাকে বৃদ্ধি করা উচিত। কেননা আল্লাহ বান্দাকে যাই দান করেন না কেন তার কোনটাই তাঁর কাছে বড় কিংবা কঠিন কিছুই নয়।"

বান্দা তার রবের কাছে কোন জিনিস চাইবে এবং সাথে সাথে দু'টি বিষয়ের মধ্যে কোনটি তার জন্য অপেক্ষাকৃত মঙ্গলজনক তার এখতিয়ার আল্লাহর উপর ছেড়ে দেবে। যেমন . হাদিসের মাধ্যমে প্রাপ্ত দোয়ার মধ্যে আছে .

اللهم أحينى إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي.

'হে আল্লাহ আমাকে হায়াত [আয়ু] দান করো, যদি আয়ু আমার জন্য কল্যাণকর হয়। আর আমাকে মৃত্যু দান করো যদি আমার জন্য মৃত্যুকে তুমি কল্যাণকর মনে করো।' ইসতেখারার দোয়াও এর মেধ্য শামিল। নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলোর মধ্যে নিহিত সূক্ষ্ম পার্থক্য সম্পর্কে অবশ্যই তোমার উপলব্ধি থাকতে হবে। আর তা হচ্ছে এই, যেসব বিষয়ের কল্যাণ এবং অকল্যাণ সম্পর্কে বান্দার জ্ঞান রয়েছে, সেসব বিষয়ে প্রার্থনাকারী দৃঢ়তার সাথে প্রার্থনা করবে এবং [আল্লাহর ইচ্ছার সাথে] শর্তযুক্ত করবে না, অপর দিকে যেসব বিষয়ে বান্দা প্রার্থনা করবে অথচ সেগুলোর পরিণতি সম্পর্কে তার কোন জ্ঞান নেই, এমনকি এগুলোর মধ্যে কোনটিকে অগ্রাধিকার বা প্রাধান্য দেবে এ ব্যাপারেও তার কিছুই জানা নেই, এমতাবস্থায় প্রার্থনাকারী [বান্দা] স্বীয় রবের এখতিয়ারের উপর বিষয়টি ন্যস্ত করবে। কারণ, আল্লাহ তাআলা জ্ঞান, কুদরত ও রহমত দ্বারা সবকিছুই নিজ আয়ত্বাধীন রেখেছেন।

৫৪তম অধ্যায় .

১। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে রাসূল সাহাবী এরশাদ করেছেন,

لا يقل أحدكم أطعم ربك، وضئ ربك، وليقل: سيدى ومولاى، ولا يقل أحدكم عبدى وأمتى، وليقل : فتاى وفتاتى و غلامى.

" তোমাদের কেউ যেন না বলে, 'তোমার প্রভুকে খাইয়ে দাও' 'তোমার প্রভুকে ওজু করাও'। বরং সে যেন বলে, 'আমার নেতা' 'আমার মনিব'। তোমাদের কেউ যেন না বলে 'আমার দাস' 'আমার দাসী'। বরং সে যেন বলে, 'আমার ছেলে, আমার মেয়ে, আমার চাকর।"

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় .

১। আমার দাস- দাসী বলা নিষিদ্ধ।

২। কোন গোলাম যেন তার মনিবকে না বলে, 'আমার প্রভু'। এ

ব্যাখ্যা

আমার দাস-দাসী বলা যাবে না

আমার দাস-দাসী বলার পরিবর্তে আমার ছেলে, আমার মেয়ে বলা বান্দার জন্য মোস্তাহাব। এ রকম বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, এমন শব্দের প্রয়োগ থেকে বেঁচে থাকা, যার মধ্যে বিভ্রান্তি ও সাবধানতার বিষয় নিহিত আছে। আমার দাস- দাসী বলা হারাম নয়, তবে উত্তম শব্দাবলি প্রয়োগের মাধ্যমে পরিপূর্ণ শিষ্টা চার রক্ষা করাই হচ্ছে উল্লেখিত হাদিসের উদ্দেশ্য। ব্যবহৃত শব্দাবলি অবশ্যই এমন হওয়া চাই, যা যে কোনদিক থেকে নিষিদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা থেকে মুক্ত।

শব্দ প্রয়োগের মধ্যে ভদ্রতা ও শিষ্টা চার রক্ষা করা বান্দার পরিপূর্ণ এখলাসের প্রমাণ পেশ করে। বিশেষ করে এমন শব্দাবলির ক্ষেত্রে, যেগুলো উল্লেখিত ব্যাপারে বেশি প্রয়োজন হয়।

কথাও যেন না বলে, ‘তোমার রবকে আহার করাও’।

৩। প্রথম শিক্ষণীয় বিষয় হলো, ‘আমার ছেলে’ ‘আমার মেয়ে’ ‘আমার চাকর’ বলতে হবে।

৪। দ্বিতীয় শিক্ষণীয় বিষয় হলো, ‘আমার নেতা,’ ‘আমার মনিব’ বলতে হবে।

৫। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি সতর্কতা অবলম্বন। আর তা হচ্ছে, শব্দ ব্যবহার ও প্রয়োগের মধ্যেও তাওহীদের শিক্ষা বাস্তবায়ন করা।

৫৫ তম অধ্যায় .

আল্লাহর ওয়াস্তে সাহায্য চাইলে বিমুখ না করা

১। ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লম এরশাদ করেছে,

من سأل بالله فأعطوه، ومن أستعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. (رواه أبوداود والنسائى بسند صحيح)

“ যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে চায় তাকে দান করো। যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তাকে আশ্রয় দাও। যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে ডাকে, তার ডাকে সাড়া দাও। যে ব্যক্তি তোমাদের জন্য ভাল কাজ করে, তার যথোপযুক্ত প্রতিদান দাও। তার প্রতিদানের জন্য যদি তোমরা কিছুই না পাও, তাহলে তার জন্য এমন দোয়া করো, যার ফলে এটাই প্রমাণিত হয় যে, তোমরা তার প্রতিদান দিতে পেরেছ। ” (আবু দাউদ, নাসায়ী)

ব্যাখ্যা

আল্লাহর ওয়াস্তে সাহায্য চাইলে বিমুখ না করা

এ অধ্যায়ে ‘মাসউল’ مسئول অর্থাৎ যার কাছে কিছু চাওয়া হয়, তার ব্যাপারে কিছু কথা বলা হয়েছে। আর তা হচ্ছে এই, যখন কোন ব্যক্তি তার [মাসউলের] কাছে কোন প্রয়োজনে যায়, আর সবচেয়ে বড় ওসীলা অর্থাৎ আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু প্রার্থনা করে, তখন আল্লাহর হকের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানের স্বার্থে এবং তার দ্বীনি ভাই এর অধিকার আদায়কল্পে প্রার্থনা কারীর ডাকে সাড়া দেয়া উচিত [অর্থাৎ কিছু দান করা উচিত] কারণ, প্রার্থনাকারী মহান ওসীলা ‘আল্লাহর’ আশ্রয় নিয়েছে।

এ অধ্যায় থেকে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলো জানা যায় .

১। আল্লাহর ওয়াস্তে আশ্রয় প্রার্থনাকারীকে আশ্রয় দান।

২। আল্লাহর ওয়াস্তে সাহায্য প্রার্থনাকারীকে সাহায্য প্রদান।

৩। [নেক কাজের] আহ্বানে সাড়া দেয়া।

৪। ভাল কাজের প্রতিদান দেয়া।

৫। ভাল কাজের প্রতিদানে অক্ষম হলে উপকার সাধনকারীর জন্য দোয়া করা।

৬। এমন খালেসভাবে উপকার সাধনকারীর জন্য দোয়া করা, যাতে মনে হয়, যথোপযুক্ত প্রতিদান দেয়া হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী حتى تروا أنكم قد كافأتموه দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে।

৫৬তম অধ্যায়
“বি ওয়াজহিল্লহ’ বলে একমাত্র জান্নাত ব্যতীত আর কিছুই প্রার্থনা করা যায় না

১। জাবের রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লম এরশাদ করেছেন,

لا يسأل بوجه الله إلا الجنة (رواه أبوداؤد)

“বিওয়াজহিলহ [আল্লাহর চেহারার ওসীলা] দ্বারা একমাত্র জান্নাত ছাড়া অন্য কিছুই চাওয়া যায় না।” (আবু দাউদ)

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় .

১। চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্থাৎ জান্নাত ব্যতীত ‘বিওয়াজহিলহ” দ্বারা অন্য কিছু চাওয়া যায় না।

২। আল্লাহর ‘চেহারা’ নামক সিফাত বা গুনের স্বীকৃতি।

ব্যাখ্যা

এ অধ্যায়টিতে প্রার্থনাকারী (سائل) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রার্থনাকারীর উচিত আল্লাহর “আসমা ও সিফাত” তথা নাম ও গুণাবলির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। “বিওয়াজহিলহ” এর ওসীলায় জাগতিক কোন স্বার্থ হাসিলের জন্য প্রার্থনা করা যায় না। বরং “বিওয়াজহিলহ” এর ওসীলা দিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য অর্থাৎ জান্নাতই প্রার্থনা করবে। কারণ, সেখানে রয়েছে স্থায়ী ও অনন্তকালের অফুরন্ত নেয়ামত। তদুপরি সেখানে আছে আল্লাহ তা’আলার সন্তুষ্টি। তাঁর পবিত্র চেহারা দর্শন এবং সুমধুর সম্ভাষণ। এ সমুহান উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যই “বিওয়াজহিলহ” বলে প্রার্থনা করা যায়।

পক্ষান্তরে জাগতিক ক্ষুদ্র ও ছোট-খাট বিষয়ে বান্দা তাঁর রবের কাছে প্রার্থনা করতে পারে। তবে “বিওয়াজহিলহ” এর ওসীলায় এ সব জিনিস চাওয়া যায় না।

৫৭তম অধ্যায় .
[বাক্যের মধ্যে 'যদি' ব্যবহার সংক্রান্ত আলোচনা]

১। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا (آل عمران ١٥٤)

"তারা বলে, 'যদি' এ ব্যাপারে আমাদের করণীয় কিছু থাকতো, তাহলে আমরা এখানে নিহত হতাম না" (আল ইমরান . ১৫৪)

২। আল্লাহ তাআলা আরো এরশাদ করেছেন,

الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا (آل عمران: ١٦٨)

ব্যাখ্যা
বাক্যের মধ্যে 'যদি' ব্যবহার প্রসঙ্গ

বান্দা কর্তৃক বাক্যের মধ্যে "যদি" (لو) ব্যবহার দু'ধরনের।

এক . নিন্দনীয়। দুই . প্রশংসনীয়।

এক . 'যদি' শব্দের নিন্দনীয় ব্যবহার হচ্ছে, কোন বান্দার পক্ষে কিংবা বিপক্ষে তার অপছন্দনীয় কোন কিছু ঘটলে সে বলে, 'আমি যদি এরকম করতাম তাহলে এমন হতো'। এর রকম বলা নিন্দনীয় এবং শয়তানের কাজ। কারণ, এর দু'টি ক্ষতিকর দিক আছে। একটি হচ্ছে, এরকম কথা বান্দার অনুতাপ, রাগ এবং দুশ্চিন্তার দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়, যা বন্ধ করে দেয়া উচিত। অপরটি হচ্ছে, এতে আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর নির্ধারিত তাকদীরের প্রতি অসৌজন্যমূলক আচরণ ও বেয়াদবি প্রমাণিত হয়। কেননা ছোট- বড় যাবতীয় ঘটনাবলি আল্লাহর ফয়সালা ও তাকদীরের ইঙ্গিতেই সংঘটিত হয়। যা সংঘটিত হয়েছে তা সংঘটিত হওয়ারই বিষয় ছিল, তা রোধ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই 'যদি এরকম হতো অথবা এরকম করতাম, তাহলে এমন হতো' বান্দার এ

“যারা ঘরে বসে থেকে [যুদ্ধে না গিয়ে তাদের [যোদ্ধা] ভাইদেরকে বলে, আমাদের কথা মতো যদি তারা চলতো। তবে তারা নিহত হতো না। (আল-ইমরান . ১৬৮)

৩। সহীহ বুখারীতে আয়েশা রা. হবে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

أحرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزنّ، وإن أصابك شئ فلا تقل: لو أنني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدّر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.

“ যে জিনিস তোমার উপকার সাধন করবে, তার ব্যাপারে আগ্রহী হও এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও, আর কখনো অক্ষমতা প্রকাশ করো না। যদি তোমার উপর কোন বিপদ এসে পড়ে, তবে এ কথা বলো না, ‘যদি

ধরনের কথা আল্লাহর বিরুদ্ধে এক ধরনের প্রতিবাদ এবং তাঁর ফয়সালা ও তাকদীরের প্রতি ঈমানের দুর্বলতা।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, দোষনীয় উক্ত বিষয় দুটি পরিত্যাগ করা ব্যতীত বান্দার ঈমান ও তাওহীদ পরিপূর্ণ হবে না।

দুই. প্রশংসনীয় ব্যবহার হচ্ছে, বান্দা ‘যদি’ শব্দকে মঙ্গল কামনার্থে ব্যবহার করবে। যেমন, কোন ব্যক্তি কল্যাণ কামনার্থে একরম বলা, ‘আমার যদি অমুকের মত এ সম্পদ থাকতো, তাহলে আমি অমুকের মত ভাল কাজ করতাম।’

‘আমার ভাই মুসা যদি ধৈর্য ধারণ করতো তাহলে আল্লাহ তা’আলা আমাদেরকে তাঁদের কিসসা সম্পর্কে [আরা] বর্ণনা দিতেন। [অর্থাৎ মুসা রা. এর সাথে খিজির আ. এর কিস্‌সার কথা আরো বর্ণনা করতেন।]

অতএব, ‘যদি’ শব্দের ব্যবহার যখন কল্যাণার্থে হবে, তখন এর ব্যবহার প্রশংসনীয় বলে গণ্য হবে। আর যদি খারাপ অর্থে ব্যবহৃত হয়, তখন এর ব্যবহার নিন্দনীয় বলে গণ্য হবে। ‘যদি’ (لو) শব্দের ব্যবহার ভাল কি মন্দ তা মূলত, নির্ভর করে তার ব্যবহারের অবস্থা ও প্রেক্ষিতের উপর। তাই এর ব্যবহার যদি অস্থিরতা,

আমি এরকম করতাম, তাহলে অবশ্যই এমন হতো’। বরং তুমি এ কথা বলো, ‘আল্লাহ যা তাকদীরে রেখেছেন এবং যা ইচ্ছা করেছেন তাই হয়েছে। কেননা ‘যদি’ কথাটি শয়তানের জন্য কুমন্ত্রণার পথ খুলে দেয়।” (বুখারী)

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় .

১। সূরা আল- ইমরানের ১৫৪ নং আয়াত এবং ৬৮ নং আয়াতের উল্লেখিত অংশের তাফসীর।

২। কোন বিপদাপদ হলে ‘যদি’ প্রয়োগ করে কথা বলার উপর সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা।

৩। শয়তানের [কুমন্ত্রণামূলক] কাজের সুযোগ তৈরির কারণ।

৪। উত্তম কথার প্রতি দিক নির্দেশনা।]

৫। উপকারী ও কল্যাণজনক বিষয়ে আগ্রহী হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করা।

৬। এর বিপরীত অর্থাৎ ভাল কাজে অপারগতা ও অক্ষমতা প্রদর্শনের উপর নিষেধাজ্ঞা।

দুশ্চিন্তা, আল্লাহর ফয়সালা ও তাকদীরের উপর দুর্বল ঈমানের কারণ এবং অমঙ্গল কামনার্থে হয়, তাহলে এর ব্যবহার হবে দোষনীয়।

পক্ষান্তরে (لو) ‘যদি’ শব্দের ব্যবহার যদি কল্যাণ ও সত্য পথ প্রদর্শন এবং শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে এর ব্যবহার হবে প্রশংসনীয় এ জন্যই গ্রন্থকার নিরোনামটিকে উপরোল্লিখিত দুটি বিষয়ের সম্ভাবনার কথা বলেছেন।

৫৮তম অধ্যায় .
বাতাসকে গালি দেয়া নিষেধ

১। উবাই ইবনে কা'ব রা. থেকে বর্ণিত আছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লম এরশাদ করেছেন,

لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا:

" তোমরা বাতাসকে গালি দিয়ো না। তোমরা যদি বাতাসের মধ্যে তোমাদের অপছন্দনীয় কিছু প্রত্যক্ষ করো তখন তোমরা বলো,

أللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها، وخير ما أمرت به، ونعوذبك من شر هذه الريح، وشر ما فيها، وشر ما أمرت به. (صحيح الترمذى)

"হে আল্লাহ এ বাতাসের যা কল্যাণকর, এতে যে মঙ্গল নিহিত আছে এবং যতটুকু কল্যাণ করার জন্য সে আদিষ্ট হয়েছে ততটুকু কল্যাণ ও মঙ্গল আমরা তোমার কাছে প্রার্থনা করি। আর এ বাতাসের যা অনিষ্টকর, তাতে যে অমঙ্গল লুক্কায়িত আছে, এবং যতটুকু অনিষ্ট সাধনের ব্যাপারে সে

ব্যাখ্যা

বাতাসকে গালি দেয়া নিষেধ

এ অধ্যায়টি ইতিপূর্বের আলোচিত 'যুগকে গালি দেয়া সংক্রান্ত' অধ্যায়ের অনুরূপ। তবে আগের অধ্যায়টি ছিল, যে কোন কাল বা যুগে সংঘটিত যাবতীয় ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য। আর বর্তমান অধ্যায়টি হচ্ছে খাস করে বাতাসের সাথে সংশ্লিষ্ট। বাতাসকে গালি দেয়া হারাম। এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, গালি দান কারী ব্যক্তি জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেচনার ক্ষেত্রে খুবই দুর্বল, যা বোকামিরই নামান্তর। কেননা বাতাস নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়, আল্লাহ তাআলার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ও চালিকা শক্তির মাধ্যমে। তাই বাতাসকে গালিদাতার গালি মূলত, বাতাসের

আদিষ্ট হয়েছে তা [অমঙ্গল ও অনিষ্ঠতা] থেকে আমরা তোমার কাছে আশ্রয় চাই। [তিরমিযী হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন]

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় .

১। বাতাসকে গালি দেয়া নিষেধ।

২। মানুষ যখন কোন অপছন্দনীয় জিনিস দেখবে তখন কল্যাণকর কথার মাধ্যমে দিক নির্দেশনা দান করবে।

৩। বাতাস আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট, একথার দিক নির্দেশনা।

৪। বাতাস কখনো কল্যাণ সাধনের জন্য আবার কখনো অকল্যাণ করার জন্য আদিষ্ট হয়।

পরিচালক ও নিয়ন্ত্রকের উপরই পতিত হয়। গালি দান কারী ব্যক্তি গালি দ্বারা যদি মনের মধ্যে উপরোক্ত অর্থ গ্রহণ না করে, তাহলে টা হবে আরো জঘন্য কাজ। অপরদিকে কোন মুসলিম তার অন্তরে উপরোক্ত অর্থ করতে পারে না।

৫৯তম অধ্যায় .

১। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ (آل عمران: ١٥٤)

"তারা জাহেলি যুগের ধারণার মত আল্লাহ সম্পর্কে অবাস্তব ধারণা পোষণ করে। তারা বলে, 'আমাদের জন্য কি কিছু করণীয় আছে? [হে রাসূল] আপনি বলে দিন, 'সব বিষয়ই আল্লাহর ইখতিয়ারভূক্ত।" [আল-ইমরান . ১৫৪]

২। আল্লাহ তাআলা আরো এরশাদ করেছেন,

الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ (الفتح: ٦)

"তারা [মুনাফিকরা] আল্লাহ সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করে, তারা নিজেরাই খারাপ ও দোষের আবর্তে নিপতিত।" (আল-ফাতাহ . ৬]

ব্যাখ্যা

আল্লাহ তাআলার বাণী .

يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ

"তারা আল্লাহ সম্পর্কে জাহেলি যুগের মত অসত্য ধারণা পোষণ করে।

আল্লাহ তাআলা নিজের নাম ও গুণাবলি [আসমা ও সিফাত] ও কামালিয়াত সম্পর্কে যেসব তথ্য জানিয়েছেন, বান্দা যতক্ষণ পর্যন্ত সে সব আসমা ও সিফাতগুলোকে বিশ্বাস না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার ঈমান ও তাওহীদ পরিপূর্ণ হবে না। আল্লাহ তাআলা যেসব নাম, গুণাবলি এবং স্বীয় কামালিয়াতসহ অন্যান্য যে সব খবর দিয়েছেন, এতদ্ভিন্ন দ্বীনের সাহায্যের ব্যাপারে যে ওয়াদা করেছেন, এর সবগুলোকে স্বীকৃতি প্রদান ব্যতীত বান্দার ঈমান পরিপূর্ণ হবে না। আল্লাহ তাআলা হককে হক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবেন আর বাতিলকে বাতিল হিসেবে প্রমাণিত করবেন, এ বিশ্বাস ঈমানের অংশ। সাথে সাথে এ বিশ্বাস দ্বারা অন্তরের প্রশান্তি লাভ করাটাও ঈমানের অংশ। এর পরিপন্থী সব ধারণাই তাওহীদ বিরোধী জাহেলি

প্রথম আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনুল কাইয়্যিম বলেছেন, ظن এর ব্যাখ্যা এটাই করা হয়েছে যে, মুনাফেকদের ধারণা হচ্ছে আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে সাহায্য করেন না। তাঁর বিষয়টি অচিরেই নিঃশেষ হয়ে যাবে। ব্যাখ্যায় আরো বলা হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লম এর উপর যে সব বিপদাপদ এসেছে তা আদৌ আল্লাহর ফয়সালা, তাকদীর এবং হিকমত মোতাবেক হয়নি।

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আরও বলা হয়েছে যে, মুনফিকরা আল্লাহর হিকমত, তাকদীর, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পূর্ণাঙ্গ রিসালত এবং সকল দ্বীনের উপর আল্লাহর দীন তথা ইসলামের বিজয়কে অস্বীকার করেছে। আর এটাই হচ্ছে সেই খারাপ ধারণা যা সূরা 'ফাতহে' উল্লেখিত মুনাফেক ও মুশরিকরা পোষণ করতো। এ ধারণা খারাপ হওয়ার কারণ এটাই যে, আল্লাহ তাআলার সুমহান মর্যাদার জন্য ইহা শোভনীয় ছিল না। তাঁর হিকমত প্রশংসা এবং সত্য ওয়াদার জন্যও উক্ত ধারণা ছিল বেমানান, অসৌজন্যমূলক।

যে ব্যক্তি মনে করে যে, আল্লাহ তাআলা বাতিলকে হকের উপর এতটুকু বিজয় দান করেন, যাতে হক অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে, অথবা যে ব্যক্তি আল্লাহর ফয়সালা, তাকদীরের নিয়মকে অস্বীকার করে, অথবা তাকদীর যে আল্লাহর হক মহা কৌশল এবং প্রশংসার দাবিদার এ কথা অস্বীকার করে, সাথে সাথে এ দাবিও করে যে, এসব আল্লাহ তাআলার নিছক অর্থহীন ইচ্ছামাত্র; তার এ ধারণা কাফেরদের ধারণা বৈ কিছু নয়। তাই জাহান্নামের কঠিন শাস্তি এ সব কাফেরদের জন্যই নির্ধারিত রয়েছে।

ধ্যান- ধারণার অন্তর্ভুক্ত। কারণ, এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ, তাঁর কামালিয়াতের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন, তাঁর পরিবেশিত খবরের প্রতি মিথ্যা আরোপ এবং তাঁর কৃত ওয়াদার প্রতি সংশয় পোষণ। [এগুলো সবই ঈমান ও তাওহীদের পরিপন্থী]

অধিকাংশ লোকই নিজেদের [সাথে সংশ্লিষ্ট] বিষয়ে এবং অন্যান্য লোকদের বেলায় আল্লাহ তাআলার ফয়সালার ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা তাঁর আসমা ও সিফাত [নাম ও গুণাবলি] এবং তাঁর হিকমত ও প্রশংসা সম্পর্কে অবগত রয়েছে, কেবলমাত্র সেই আল্লাহর প্রতি এ খারাপ ধারণা থেকে মুক্ত থাকতে পারে।

যে ব্যক্তি প্রজ্ঞা সম্পন্ন, বুদ্ধিমান এবং নিজের জন্য কল্যাণকামী, তার উচিত এ আলোচনা দ্বারা বিষয়টির অপরিসীম গুরুত্ব অনুধাবন করা। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি স্বীয় রব সম্পর্কে খারাপ ধারণা করে, তার উচিত নিজ বদ-ধারণার জন্য আল্লাহর নিকট তওবা করা।

আল্লাহর প্রতি খারাপ ধারণা পোষণকারী কোন ব্যক্তিকে যদি তুমি পরীক্ষা করো, তাহলে দেখতে পাবে তার মধ্যে রয়েছে তাকদীরের প্রতি হিংসাত্মক বিরোধিতা এবং দোষারোপ করার মানসিকতা। তারা বলে, বিষয়টি এমন হওয়া উচিত ছিল। এ ব্যাপারে কেউ বেশি, কেউ কম বলে থাকে তুমি তোমার নিজেকে পরীক্ষা করে দেখো, তুমি কি এ খারাপ ধারণা থেকে মুক্ত? কবির ভাষায় .

মুক্ত যদি থাকো তুমি এ খারাবি থেকে,
বেঁচে গেলে তুমি এক মহা বিপদ থেকে।
আর যদি নাহি পারো ত্যাগিতে এ রীতি,
বাঁচার তরে তোমার লাগি নাইকো কোন গতি।

এধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় .

১। সূরা আল- ইমরানের ১৫৪ নং আয়াতের তাফসীর।

২। সূরা “ফাতাহ” এর ৬ নং আয়াতের তাফসীর।

৩। আলোচিত বিষয়ের প্রকার সীমাবদ্ধ নয়।

৪। যে ব্যক্তি আল্লাহর আসমা ও সিফাত, [নাম ও গুণাবলি] এবং নিজের জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত রয়েছে, কেবলমাত্র সেই আল্লাহর প্রতি কু-ধারণা পোষণ করা থেকে বাঁচতে পারে।

৬০তম অধ্যায়
তাকদীর অস্বীকারকারীদের পরিণতি

১। ইবনে ওমর রা. বলেছেন,

والذى نفس ابن عمر بيده، لوكان لأحدهم مثل أحد ذهبا، ثم أنفقه فى سبيل الله ما قبله الله منه، حتى يؤمن بالقدر.

“সেই সত্তার কসম, যার হাতে ইবনে ওমরের জীবন, তাদের (তাকদীর অস্বীকারদের) কারো কাছে যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও থাকে, অতঃপর তা আল্লাহর রাস্তায় দান করে দেয়, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা উক্ত দান কবুল করবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তাকদীরের প্রতি ঈমান আনে”। অতঃপর তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী দ্বারা নিজ বক্তব্যের পক্ষে দলিল পেশ করেন,

الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه و رسله واليوم الأخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. (رواه مسلم)

“ঈমান হচ্ছে এই যে, তুমি আল্লাহ তাআলা, তাঁর সমুদয় ফিরিস্তা, তাঁর যাবতীয় [আসমানি] কিতাব, তাঁর সমস্ত রাসূল এবং আখেরাতের প্রতি

ব্যাখ্যা

তাকদীর অস্বীকারকারীদের পরিণতি

কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমা দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস রাখা ঈমানের একটি রুকন বা স্তম্ভ। তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস রাখার অর্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তাআলা যা ইচ্ছা করেন তাই হয়। আর যা ইচ্ছা করেন না তা হয় না।’ যে ব্যক্তি এ কথা বিশ্বাস করে না, সে প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর উপর ঈমান আনতে পারেনি। আমাদের উচিত তাকদীরের সকল স্তরের উপরই ঈমান আনয়ন করা। তাই আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ তাআলা সবকিছুই জানেন। এ যাবৎ যা কিছু সংঘটিত হয়েছে, আর কেয়ামত পর্যন্ত যা সংঘটিত হবে তার সবকিছুই তিনি লৌহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। সবকিছুই তাঁর সৃষ্টি। সবই তাঁর কুদরত, তার কর্মকৌশল ও

ঈমান আনয়ন করবে সাথে সাথে তাকদীর এবং এর ভাল-মন্দের প্রতি ঈমান আনয়ন করবে।" (মুসলিম)

২। উবাদা বিন সামেত রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি তার ছেলেকে বললেন, "হে বৎস, তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানের স্বাদ অনুভব করতে পারবে না, যতক্ষণ না তুমি এ কথা বিশ্বাস করবে, 'তোমার জীবনে যা ঘটেছে তা ঘটারই ছিল। আর তোমার জীবনে যা ঘটেনি তা কোনদিন তোমার জীবনে ঘটার ছিলোনা।" রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লমকে আমি এ কথা বলতে শুনেছি,

إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال : رب ماذا أكتب؟ قال : اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة.

"সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলা যা সৃষ্টি করেন তা হচ্ছে 'কলম'। সৃষ্টির পরই তিনি কলমকে বললেন, "লিখ"। কলম বলল, 'হে আমার রব, 'আমি কি লিখব?' তিনি বললেন, 'কেয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত সব জিনিসের তাকদীর লিপিবদ্ধ করো।" হে বৎস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি,

من مات على غير هذا فليس منى.

"যে ব্যক্তি [তাকদীরের উপর] বিশ্বাস ব্যতীত মৃত্যু বরণ করল, সে আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য নয়।"

অন্য একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে,

إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب، فجرى فى تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة.

পরিচালন ক্ষমতাই ইঙ্গিতেই চলছে।

তাকদীরের উপর পূর্ণাঙ্গ ঈমানের দাবি হচ্ছে, এ কথা বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তাআলা স্বীয় বান্দার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে বাধা করেন না। বরং তাঁর আনুগত্য এবং নাফরমানি করার ব্যাপারে বান্দাদেরকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন।

“আল্লাহ তাআলা সর্ব প্রথম যা সৃষ্টি করলেন তা হচ্ছে ‘কলম’। এরপরই তিনি কলমকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ‘লিখ’। কেয়ামত পর্যন্ত যা সংঘটিত হবে, সে মুহূর্তে থেকে কলম তা লিখতে শুরু করে দিল। (আহমদ)

৩। ইবনে ওয়াহাবের একটি বর্ণনা মতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লম এরশাদ করেছেন,

فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار.

“যে ব্যক্তি তাকদীর এবং তাকদীরের ভাল- মন্দ বিশ্বাস করে না, তাকে আল্লাহ তাআলা জাহান্নামের আগুনে জ্বালাবেন করবেন।”

ইবনুদ্দাইলামী থেকে বর্ণিত আছে, কাতাদাহ রা. বলেন, ‘আমি ইবনে কা’ব এর কাছে আসলাম। তারপর বললাম, ‘তাকদীরের ব্যাপারে আমার মনে কিছু কথা আছে। আপনি আমাকে তাকদীর সম্পর্কে কিছু উপদেশমূলক কথা বলুন। এর ফলে হয়তো আল্লাহ তাআলা আমার অন্তর থেকে উক্ত জমাট বাধা কাদা দূর করে দেবেন। তখন তিনি বললেন, ‘তুমি যদি উহুদ [পাহাড়] পরিমাণ স্বর্ণও আল্লাহর রাস্তায় দান করো, আল্লাহ তোমার এ দান ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল করবেন না, যতক্ষণ না তুমি তাকদীরকে বিশ্বাস করবে। আর এ কথা জেনে রাখো, তোমার জীবনে যা ঘটেছে তা ঘটতে কখনো ব্যতিক্রম হতো না। আর তোমার জীবনে যা সম্পর্কিত এ বিশ্বাস পোষণ না করে মৃত্যু বরণ করো, তা হলে অবশ্যই জাহান্নামী হবে’। তিনি বলেন, অতঃপর আমি আবদুলহ ইবনে মাসউদ, হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান এবং যায়েদ বিন ছাবিত রা. এর নিকট গেলাম। তাঁদের প্রত্যেকেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এরকম হাদিসই বর্ণনা করেছেন।” (হাকিম)

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয় গুলো জানা যায় .

১। তাকদীরের প্রতি ঈমান আনা ফরজ এর বর্ণনা।

২। তাকদীরের প্রতি কীভাবে ঈমান আনতে হবে, এর বর্ণনা।

৩। তাকদীরের প্রতি যার ঈমান নেই তার আমল বাতিল।

৪। যে ব্যক্তি তাকদীরের প্রতি ঈমান আনে না সে ঈমানের স্বাদ অনুধাবন করতে অক্ষম।

৫। সর্বাগ্রে যা সৃষ্টি হয়েছে তার উল্লেখ।

৬। কেয়ামত পর্যন্ত যা সংঘটিত হবে, সৃষ্টির পর থেকেই কলম তা লিখতে শুরু করেছে।

৭। যে ব্যক্তি তাকদীর বিশ্বাস করে না তার ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লম দায়িত্বমুক্ত।

৮। সালাফে সালেহীনের রীতি ছিল, কোন বিষয়ের সংশয় নিরসনের জন্য জ্ঞানী ও বিজ্ঞজনকে প্রশ্ন করা।

৯। উলামায়ে কেরাম এমন ভাবে প্রশ্ন কারীকে জবাব দিতেন যা দ্বারা সুন্দেহ দূর হয়ে যেতো। জবাবের নিয়ম এই যে, তাঁরা নিজেদের কথাকে শুধুমাত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লম এর [কথা ও কাজের] দিকে সম্পৃক্ত করতেন।

৬১তম অধ্যায় .
ছবি অঙ্কনকারী বা চিত্র শিল্পীদের পরিণাম

১। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লম এরশাদ করেছেন,

قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة. (أخرجاه)

“আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘তার চেয়ে বড় জালিম আর কে হতে পারে, যে ব্যক্তি আমার সৃষ্টির মতো সৃষ্টি করতে চায়। তাদের শক্তি থাকলে তারা একটা অনু সৃষ্টি করুক অথবা একটি খাদ্যের দানা সৃষ্টি করুক অথবা একটি গমের দানা তৈরি করুক।” (বুখারী ও মুসলিম)

২। আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লম এরশাদ করেছেন,

أشد الناس عذابا يوما القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. (البخارى و مسلم)

“কেয়ামতের দিন সবচেয়ে শাস্তি পাবে তারাই যারা আল্লাহ তাআলার

ব্যাখ্যা

এ আলোচনাটি মূলত, পূর্বোক্ত অধ্যায়ের একটি শাখা বিশেষ। নিয়ত, কথা ও কাজের মধ্যে আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার করা জায়েজ নেই। নিদ্দ (ند) অর্থ হচ্ছে সাদৃশ্য। এ সাদৃশ্য যত প্রকারেরই হোক না কেন, ফলাফলে কোন পার্থক্য নেই। তাই প্রাণীর ছবি অঙ্কন করার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর সাথে সাদৃশ্য করণ, তাঁর সৃষ্টি কৌশলের উপর মিথ্যাচারিতা, প্রতারণা ও জালিয়াতি। এ কারণেই শরীয়ত প্রণেতা এটাকে নিষেধ করেছেন।

সৃষ্টির মতো ছবি বা চিত্র অঙ্কন করে।” (বুখারী ও মুসলিম)

৩। ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লমকে বলতে শুনেছি,

كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. (رواه مسلم)

“প্রত্যেক চিত্র অঙ্কনকারীই জাহান্নামী। চিত্রকর যতটি [প্রাণীর] চিত্র এঁকেছে ততটি প্রাণ তাকে দেয়া হবে। এর মাধ্যমে তাকে জাহান্নামে শাস্তি দেয়া হবে।” (মুসলিম)

৪ ইবনে আব্বাস রা. থেকে ‘মারফু’ হাদিসে বর্ণিত আছে,

من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس ب نافخ. (رواه البخاري ومسلم)

“যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন [প্রাণীর] চিত্র অঙ্কন করবে, কিয়ামতের দিন তাকে ঐ চিত্রে আত্মা দেয়ার জন্য বাধ্য করা হবে। অথচ সে আত্মা দিতে সক্ষম হবে না।” (বুখারী ও মুসলিম)

৫। আবুল হাইয়াজ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আলী রা. আমাকে বললেন, ‘আমি কি তোমাকে এমন কাজে পাঠাবোনা, যে কাজে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লম আমাকে পাঠিয়েছিলেন? সে কাজটি হচ্ছে, ‘তুমি কোন চিত্রকে ধ্বংস না করে ছাড়বে না। আর কোন উঁচু কবরকে [মাটির] সমান না করে ছাড়বে না।, (মুসলিম)

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় .

১। চিত্রকরদের ব্যাপারে খুব কঠোরতা অবলম্বন।

২। কঠোরতা অবলম্বনের কারণ সম্পর্কে মানুষকে সাবধান করে দেয়া। এখানে কঠোরতা অবলম্বনের কারণ হচ্ছে, আল্লাহর সাথে আদব রক্ষা না করা। এর প্রমাণ আল্লাহ বাণী :

ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي

৩। সৃষ্টি করার ব্যাপারে আল্লাহর কুদরত বা সৃজনশীল ক্ষমতা। অপরদিকে সৃষ্টির ব্যাপারে বান্দার অক্ষমতা। তাই আল্লাহ চিত্রকরদেরকে বলেছেন, 'তোমাদের ক্ষমতা থাকলে তোমরা একটা অনু অথবা একটা দানা কিংবা গমের দানা তৈরি করে নিয়ে এসো।'

৪। চিত্রকরের সবচেয়ে কঠিন শাস্তি হওয়ার সুস্পষ্ট ঘোষণা।

৫। চিত্রকর যতটা [প্রাণীর] ছবি আকবে, শাস্তি ভোগ করার জন্য ততটা প্রাণ তাকে দেয়া হবে। এবং এর দ্বারাই জাহান্নামে তাঁকে শাস্তি দেয়া হবে।

৬। অঙ্কিত ছবিতে রুহ বা আত্মা দেয়ার জন্য চিত্রকরকে বাধ্য করা হবে।

৭। [প্রাণীর] ছবি পাওয়া গেলেই তা ধ্বংস করার নির্দেশ।

৬২তম অধ্যায়
অধিক কসম সম্পর্কে শরিয়তের বিধান

১। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ (المائدة: ٨٩)

"তোমাদের শপথসমূহকে তোমরা হেফাজত করো"। (মায়েদা : ৮৯)

২। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লমকে একথা বলতে শুনেছি,

الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب. (أخرجاه)

"[অধিক] শপথ, সম্পদ বিনষ্ট কারী এবং উর্পন ধ্বংশ কারী।" (বুখারী ও মুসলিম)

৩। সালমান রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লম এরশাদ করেছেন,

ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته،

ব্যাখ্যা

অধিক কসম সম্পর্কে শরিয়তের বিধান

হলফ বা কসমের মূল কথা হচ্ছে, কসমকৃত বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ এবং স্রষ্টার প্রতি সম্মান প্রদর্শন। এ কারণেই একমাত্র আল্লাহর নামে কসম করা ওয়াজিব করা হয়েছে। আর গাইরুলহর নামে কসম করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

এক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার প্রতি পূর্ণ সম্মানের দাবি হচ্ছে, আল্লাহর নামে সত্য কসম করা এবং অধিক কসম না করা তাঁর নামের ইজ্জত করা কেননা মিথ্যা কসম এবং অধিক কসম উভয়টাই তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পরিপন্থী। অথচ আল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শনই হচ্ছে তাওহীদের প্রাণশক্তি।

لا يشترى إلا بيمينه، ولا يبيع إلا بيمينه. (رواه الطبرانى بسند صحيح)

"তিন শ্রেণির লোকদের সাথে আল্লাহ তাআলা [কেয়ামতের দিন] কথা বলবেন না, তাদেরকে [গুনাহ মাফের মাধ্যমে] পবিত্র করবেন না, বরং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। তারা হচ্ছে, বৃদ্ধ জিনাকারী, অহংকারী গরিব, আর যে ব্যক্তি তার ব্যবসায়ী পণ্যকে খোদা বানিয়েছে অর্থাৎ কসম করা ব্যতিত সে পণ্য ক্রয়ও করে না, কসম করা ব্যতীত পণ্য বিক্রয়ও করে না।" (তাবরানী)

৩। ইমরান বিন হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লম এরশাদ করেছেন,

خير أمتى قرنى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم - قال عمران: فلا ادرى أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة؟ - ثم إن بعد كم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر منهم السمن.

"আমার উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে আমার যুগ, তারপর উত্তম হচ্ছে তাদের পরবর্তীতে যারা আসবে তারা। তারপর উত্তম হচ্ছে তাদের পরবর্তীতে যারা আসবে তারা"। ইমরান বলেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লম তাঁর পরে দু'যুগের কথা বলেছেন নাকি তিন যুগের কথা বলেছেন তা আমি বলতে পার ছিনা। অতঃপর তিনি [রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লম] বলেন, 'তোমাদের পরে এমন কওম আসবে যারা সাক্ষ্য দেবে, কিন্তু তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ যোগ্য হবে না। তারা বিশ্বাসঘাতকতা করবে, আমানত রক্ষা করবে না। তারা মান্নত করবে, কিন্তু তা পূর্ণ করবে না। আর তাদের শরীরে চর্বি দেখা দেবে।" (বুখারী)

৪। ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালম এরশাদ করেছেন,

خير الناس قرنى، ثم الذين يلونهم، ثم يجيئ قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته.

“সর্বোত্তম মানুষ হচ্ছে আমার যুগের মানুষ। এরপর উত্তম হলো এর পরবর্তীতে আগমনকারী লোকেরা। তারপর উত্তম হলো যারা তাদের পরবর্তীতে আসবে তারা। অতঃপর এমন এক জাতির আগমন ঘটবে যাদের কারো সাক্ষ্য কসমের আগেই হয়ে যাবে, আবার কসম সাক্ষ্যের আগেই হয়ে যাবে।” [অর্থাৎ কসম ও সাক্ষ্যের মধ্যে কোন মিল থাকবে না। কসম ও সাক্ষ্য উভয়টাই মিথ্যা হবে।]

ইবরাহীম নখয়ী বলেন, আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন মিথ্যা সাক্ষ্যের জন্য আমাদের অভিভাবকগণ শাস্তি দিতেন।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় .

১। ঈমান রক্ষা করার জন্য উপদেশ দান।

২। মিথ্যা কসম বাণিজ্যিক পণ্যের ক্ষতি টেনে আনে, কামাই রোজগারের বরকত নষ্ট করে।

৩। যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম ছাড়া ক্রয় বিক্রয় করে না তার প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ।

৪। স্বল্প কারণেও গুনাহ বিরাট আকার ধারণ করতে পারে, এ ব্যাপারে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ।

৫। বিনা প্রয়োজনে কসম কারীদের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন।

৬। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লম কর্তৃক তিন অথবা চার যুগ বা কালের লোকদের প্রশংসা জ্ঞাপন এবং এর পরবর্তীতে যা ঘটবে তার উল্লেখ।

৭। মিথ্যা সাক্ষ্য ও ওয়াদার জন্য সালাফে সালেহীন কর্তৃক ছোটদেরকে শাস্তি প্রদান।

৬৩তম অধ্যায় .

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জিম্মাদারি সম্পর্কিত বিবরণ

১। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا (النحل: ٩١)

"আল্লাহর নামে যখন তোমরা কোন শক্ত ওয়াদা করো তখন তা পুরা করো এবং দৃঢ়তার সাথে কোন কসম করলে তা ভঙ্গ করো না।

(নাহল: ৯১)

২। বুরাইদাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লম ছোট হোক, বড়হোক [কোন যুদ্ধে] যখন সেনাবাহিনীতে কাউকে আমির বা সেনাপতি নিযুক্ত করতেন, তখন তাকে 'তাকওয়ার' উপদেশ দিতেন এবং তার সাথে যে সব মুসলমান থাকতো তাদেরকেও উত্তম উপদেশ দিতেন। তিনি বলতেন,

غزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، ولاتقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث حضال ـ أو خلال ـ فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الاسلام، فان أجابوك فاقبل منهم ، ثم أدعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين... إلى آخر الحديث. (رواه مسلم)

"তোমরা আল্লাহর নামে যুদ্ধ করো। যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো। তোমরা যুদ্ধ করো, কিন্তু বাড়বাড়ি করো না, বিশ্বাস ঘাতকতা করো না। তোমরা শক্রর নাক-কান কেটো না বা অঙ্গ বিকৃত করো না। তুমি যখন তোমার মুশরিক শক্রদের মোকাবেলা করবে, তখন তিনিটি বিষয়ের দিকে তাদেরকে আহ্বান জানাবে। যে কোন একটি বিষয়ে তারা তোমার আহ্বানে সাড়া দিলে তা গ্রহণ করে নিও, আর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করে দিয়ো। অতঃপর তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করো। যদি তারা তোমার আহ্বানে সাড়া দেয়, তাহলে তাদেরকে গ্রহণ করে নিও। এরপর তাদেরকে তাদের বাড়ি-ঘর ছেড়ে দারুল মুহাজিরীনে স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য হিজরত করার জন্য আহ্বান জানাও। হিজরত করলে তাদেরকে একথা জানিয়ে দাও, 'মুহাজিরদের জন্য যে অধিকার রয়েছে, তাদেরও সে অধিকার আছে, সাথে সাথে মোহাজিরদের যা করণীয়

তাদেরও তাই করণীয়। আর যদি তারা হিজরতের মাধ্যমে স্থান পরিবর্তন করতে অস্বীকার করে, তাহলে তাদেরকে বলে দিয়ো যে, তারা গ্রাম্য সাধারণ মুসলিম বেদুইনদের মর্যাদা পাবে। তাদের উপর আল্লাহর হুকুম আহকাম [বিধি- নিষেধ] জারি হবে। তবে 'গনিমত' বা যুদ্ধ-লব্ধ অতিরিক্ত সম্পদের ভাগ তারা মুসলমানদের সাথে জিহাদে অংশ গ্রহণ ব্যতীত পাবে না। এটাও যদি তারা অস্বীকার করে তবে তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, 'তারা কর দিতে সম্মত কিনা। যদি কর দিতে সম্মত হয়, তবে তা গ্রহণ করো, আর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করো। কিন্তু যদি কর দিতে তারা অস্বীকার করে, তবে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো।

তুমি যদি কোন দুর্গের লোকদেরকে অবরোধ করো, আর দুর্গের লোকেরা যদি তখন চায় যে, তুমি তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জিম্মায় রেখে দাও, তবে তুমি কিন্তু তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জিম্মায় রেখো না বরং তোমার এবং তোমার সঙ্গী সাথিদের জিম্মায় রেখে দিয়ো। কারণ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জিম্মাদারি রক্ষা করার চেয়ে তোমার এবং তোমার- সাথিদের জিম্মাদারি রক্ষা করা অনেক সহজ। তুমি যদি কোন দুর্গের অধিবাসীদেরকে অবরোধ করো। আর তুমি আল্লাহর ফয়সালার ব্যাপারে তাদের কথায় সম্মতি দিওনা। বরং তোমার নিজের ফয়সালাতে দিয়ো। কারণ তুমি জান না তাদের ব্যাপারে আল্লাহর ফয়সালার ক্ষেত্রে তুমি সঠিক ভূমিকা নিতে পারবে কিনা।" (মুসলিম)

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১। আল্লাহর জিম্মা, নবীর জিম্মা এবং মোমিনদের জিম্মার মধ্যে পার্থক্য।

২। দু'টি বিষয়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম বিপদজনক বিষয়টি গ্রহণ করার প্রতি দিক নির্দেশনা।

৩। আল্লাহর নামে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করা।

৪। আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।

৬। আল্লাহর হুকুম এবং আলেমদের হুকুমের মধ্যে পার্থক্য।

৭। সাহাবী কর্তৃক প্রয়োজনের সময় এমন বিচার ফয়সালা হয়ে যাওয়া যা আল্লাহর সাথে সংগতিপূর্ণ কিনা তাও তিনি জানেন না।

৬৪ তম অধ্যায় .
আল্লাহর ইচ্ছাধীন বিষয়ে কসম করার পরিণতি

১। জুনদুব বিন আব্দুলহ রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লম এরশাদ করেছেন,

قال رجل: والله لايغفر الله لفلان، وقال الله عزوجل: من ذا الدى يتألى عليّ أن لا أغفر لفلان؟ إنى قد غفرت له وأحبطت عملك. (رواه مسلم)

"এক ব্যক্তি বলল, "আল্লাহর কসম, অমুক ব্যক্তিকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তখন আল্লাহর তাআলা বললেন, 'আমি অমুককে ক্ষমা করবোনা' একথা বলে দেয়ার আস্পর্ধা কার আছে? আমি তাকেই ক্ষমা করে দিলাম। আর তোমার [কসম কারীর] আমল বাতিল করে দিলাম।" (মুসলিম)

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে আছে, "যে ব্যক্তি কসম করে উল্লেখিত কথা বলেছিল, সে ছিল একজন আবেদ। আবু হুরায়রা বলেন ঐ ব্যক্তি একটি মাত্র কথার মাধ্যমে তাঁর দুনিয়া এবং আখেরাত উভয়টাই বরবাদ করে ফেলেছে।

আলোচিত অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১। আল্লাহর ইচ্ছাধীন বিষয়ে মাতব্বরি করার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা। [অর্থাৎ মাতব্বরি না করা]

২। আমাদের কারো জাহান্নাম তার জুতায় ফিতার চেয়েও অধিক নিকটবর্তী।

৩। জান্নাতও অনুরূপ নিকটবর্তী।

৪। এ অধ্যায়ে এ কথার প্রমাণ রয়েছে যে, একজন লোক মাত্র একটি কথার মাধ্যমে তার দুনিয়া ও আখেরাত বরবাদ করে ফেলেছে।

৫। কোন কোন সময় মানুষকে এমন সামান্য কারণেও মাফ করে দেয়া হয়, যা তার কাছে সবচেয়ে অপছন্দের বিষয়।

৬৫তম অধ্যায় .
সৃষ্টির কাছে আল্লাহর সুপারিশ করা যায় না

১। জুবাইর বিন মুতয়িম রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লম এর কাছে আরব বেদুঈন এসে বলল, ‘ হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের জীবন ওষ্ঠাগত, পরিবার পরিজন ক্ষুধার্ত, সম্পদ ধ্বংস প্রাপ্ত। অতএব আপনি আপনার রবের কাছে বৃষ্টির প্রার্থনা করুন। আমরা আপনার কাছে আল্লাহর সুপারিশ করছি, আর আল্লাহর কাছে আপনার সুপারিশ করছি’। এভাবে তিনি আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করতে লাগলেন যে তাঁর এবং সাহাবায়ে কেরামের চেহারায় রাগতবাব প্রতিভাত হচ্ছিল। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালম বললেন,

ويحك أتدرى ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك أنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه.

“তোমার ধ্বংস হোক, আল্লাহর মর্যাদা কত বড়, তা কি তুমি জানো? তুমি যা মনে করছ আল্লাহর মর্যাদা ও শান এর চেয়ে অনেক বেশি। কোন সৃষ্টির কাছেই আল্লাহর সুপারিশ করা যায় না।” (আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা
আল্লাহর ইচ্ছাধীন বিষয়ে কসম করা
এবং
সৃষ্টির কাছে আল্লাহর সুপারিশ প্রার্থনা করা প্রসঙ্গে।

উপরোল্লিখিত দু’টি বিষয়ই আল্লাহর সাথে বেয়াদবি এবং তাওহীদের পরিপন্থী। আল্লাহর ইচ্ছাধীন বা ইখতিয়ারভুক্ত বিষয়ে কসম করা মূলতঃ অহমিকা, আল্লাহর প্রতি ভয়হীন ও বেয়াদবীপূর্ণ আচরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। এ সব বেয়াদবি ও অসংগত আচরণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া ব্যতীত পূর্ণাঙ্গ ঈমান অর্জিত হবে না।

কোন মাখলুকের কাছে আল্লাহর সুপারিশ কামনার ব্যাপারে মূল কথা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তাআলাকে স্বীয় মাখলুকের প্রতি ওসীলা বানানোর মত বিষয়ের চেয়ে তিনি

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়

১। 'আপনার কাছে আল্লাহর সুপারিশ করছি'

نستشفع بالله عليك

এ কথা যে ব্যক্তি বলেছিল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লম কর্তৃক সে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল।

২। সৃষ্টির কাছে আল্লাহর সুপারিশের কথায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লম এবং সাহাবায়ে কেরামের চেহারায় লক্ষণীয় পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছিল।

৩। نستشفع بك على الله

[আমরা আল্লাহর কাছে আপনার সুপারিশ কামনা করছি] এ কথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লম প্রত্যাখ্যান করেননি।

৪। "সুবহানালহ' এর তাফসীরের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন।

৫। মুসলমানগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লমকে আল্লাহর কাছে বৃষ্টি চাওয়ার জন্য আবেদন করতেন।

অনেক অনেক বেশি মর্যাদাবান। কারণ, যাকে ওসীলা বানানো হয় তার মর্যাদার চেয়ে ওসীলার দ্বারা যার নৈকট্য লাভ করা হয় তার মর্যাদা অনেক বেশি। অতএব আল্লাহকে অসীলা বানানো চরম বেয়াদবি ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই এটা পরিত্যাগ করাই প্রমাণিত হলো।

শাফাআত [বা সুপারিশ কারী গণ আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত সুপারিশ করতে পারবে না। তাদের প্রত্যেকেই তাঁর সম্মুখে ভীত ও সন্ত্রস্ত। এমতাবস্থায় বিষয়টি কীভাবে এর বিপরীত হবে, যার ফলে আল্লাহ তাআলা নিজে শাফাআতকারী হবেন? অথচ তিনিই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহান। সমগ্র সৃষ্টি জগৎ তাঁর অনুগত এবং করতলগত।

৬৬তম অধ্যায় .
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লম কর্তৃক তাওহীদ সংরক্ষণ এবং শিরকের মূলোৎপাটন

১ আবদুলহ বিন আশশিখখির রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি বনী আমেরের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লম এর নিকট গেলাম। আমরা তাকে উদ্দেশ্য করে বললাম, أنت سيدنا [আপনি আমাদের প্রভু] তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লম বললেন, السيد الله تبارك وتعالى [আল্লাহ তাআলাই হচ্ছেন প্রভু]। আমরা বললাম, 'আমাদের মধ্যে মর্যাদার দিক থেকে আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং আমাদের মধ্যে সর্বাধিক দানশীল ও ধৈর্যশীল।' এরপর তিনি বললেন,

قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان.

" তোমরা তোমাদের বলে যাও। শয়তান যেন তোমাদের উপর সওয়ার না হতে পারে।" (আবু দাউদ)

২। আনাস রা. থেকে বর্ণিত ছে, কতিপয় লোক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লমকে লক্ষ্য করে বলল, "হে আল্লাহর রাসূল, কে আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি, এবং আমাদের প্রভু তনয়" তখন তিনি বললেন,

يا أيها الناس: قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان.

ব্যাখ্যা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লম কর্তৃক তাওহীদ সংরক্ষণ এবং শিরকের মূলোৎপাটন।

এ অধ্যায়ের সাদৃশ্য পূর্ণ অধ্যায় ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। লেখক বিষয়টির অধিক গুরুত্বের কারণে এর পুনরাবৃত্তি করেছেন। কারণ মানুষকে শিরকের দিকে ধাবিত করে এমন যাবতীয় পথ সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যাগ করা ব্যতীত বান্দার তাওহীদ পরিপূর্ণ হবে না, সংরক্ষিতও হবে না। দু'টি অধ্যায়ের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, প্রথম অধ্যায়টিতে যেসব কর্মকাণ্ড দ্বারা শিরক হয় সে সব কর্মকাণ্ডের পথ বন্ধ করার মাধ্যমে তাওহীদকে রক্ষা করা। আর দ্বিতীয় অধ্যায়টি হচ্ছে, কথা এবং আচার- আচরণের মাধ্যমে শিরকের যাবতীয় পথ বন্ধ করা এবং তাওহীদকে হেফাজত করা।

أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل.

হে লোক সকল, তোমরা তোমাদের কথা বলে যাও। শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত ও প্রতারিত করতে না পারে। আমি হচ্ছি মুহাম্মদ, আল্লাহর বান্দা এবং তার রাসূল। আল্লাহ তাআলা আমাকে যে মর্যাদার স্থানে অধিষ্ঠিত করেছেন, তোমরা এর উর্ধ্বে আমাকে স্থান দেবে এটা আমি পছন্দ করি না। (নাসায়ী)

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় .

১। দ্বীনের ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘন না করার জন্য মানুষের প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ।

২। 'আপনি আমাদের প্রভু বা মনিব' বলে সম্বোধন করা হলে জবাবে তার কি বলা উচিত, এ ব্যাপারে জ্ঞান লাভ।

৩। লোকেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লম এর প্রতি সম্মান ও মর্যাদার ব্যাপারে কিছু কথা বলার পর তিনি বলেছিলেন, "শয়তান যে তোমাদের উপর চড়াও না হয়।" অথচ তারা তাঁর ব্যাপারে হক কথাই বলেছিল। এর তাৎপর্য অনুধাবন করা।

৪। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লম এর বাণী ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي অর্থাৎ তোমরা আমাকে স্বীয় মর্যাদার উপরে স্থান দাও এটা আমি পছন্দ করি না। একথার তাৎপর্য উপলব্ধি করা।

অতএব, যে সব কথা এমন বাড়াবাড়ি মূলক কাজের দিকে বান্দাকে ধাবিত করে যা দ্বারা শিরকে পতিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তা পরিত্যাগ করা অপরিহার্য। এসব কথা পরিত্যাগ করা ব্যতীত তাওহীদ পরিপূর্ণ হয় এর শর্তাবলি পূরণের মাধ্যমে, এর আরকান এবং অন্যান্য যাবতীয় সম্পূরক কার্যাবলী সম্পাদনের মাধ্যমে। সাথে সাথে জাহেরী-বাতেনী কথা, কাজ, ইচ্ছা এবং ধ্যান- ধারণার দিক থেকে তাওহীদের বিপরীত বিষয়গুলো পরিত্যাগ করার মাধ্যমে বান্দার তাওহীদ পরিপূর্ণ হয়।

৬৭তম অধ্যায় .
মানুষ আল্লাহ তাআলার পূর্ণাঙ্গ মর্যাদা নিরূপণে অক্ষম

১। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

وَمَا قَدَرُوا اللهَّ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (الزمر: ٦٨)

"তারা আল্লাহর যথার্থ মর্যাদা নিরূপণ করতে পারেনি। কেয়ামতের দিন সমগ্র পৃথিবী তাঁর হাতের মুঠোতে থাকবে।" (ঝুমার : ৬৭)

২। ইবনে মাস উদ রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একজন ইহুদি পণ্ডিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাম এর নিকট এসে বলল, 'হে মুহাম্মদ, আমরা [তাওরাত কিতাবে] দেখতে পাই যে, আল্লাহ তাআলা সমস্ত আকাশ মণ্ডলীকে এক আঙুলে, সমস্ত জমিনকে এক আঙুলে, বৃক্ষরাজিকে এক আঙুলে, পানি এক আঙুলে ভূতলের সমস্ত জিনিসকে এক আঙুলে এবং সমস্ত সৃষ্টি জগৎকে এক আঙুলে রেখে বলবেন, আমিই সম্রাট।'

এ কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লম ইহুদি পণ্ডিতের কথার সমর্থনে এমন ভাবে হেসে দিলেন যে তাঁর দন্ত মোবারক দেখা যাচ্ছিল। অতপর তিনি

ব্যাখ্যা

আল্লাহর বাণী- وَمَا قَدَرُوا اللهَّ حَقَّ قَدْرِهِ "তারা আল্লাহ তাআলার যথাযথ মর্যাদা নিরূপণে সক্ষম হয়নি। গ্রন্থকার এ অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে এ বইটির ইতি টেনেছেন। মহান আল্লাহ তাআলার মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব, তার মর্যাদা, জালালত এবং তাঁরই মহাশক্তির কাছে গোটা সৃষ্টিকুল মস্তকাবনত, এ বাস্তবতার উপর অনেক প্রামাণাদি এখানে উলেখ করেছেন। কেননা তাঁর এসব মহৎ ও পূর্ণাঙ্গ গুণাবলিই হচ্ছে, তিনি যে একক মা'বুদ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

তিনি এককভাবে সমস্ত প্রশংসার অধিকারী। চূড়ান্ত কাকুতি, শ্রদ্ধা, তাজিম এবং চূড়ান্ত ভালোবাসা ও ইবাদত একমাত্র তাঁরই জন্য নিবেদন করতে হবে। একমাত্র তিনিই

এ আয়াতটুকু পড়লেন। وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

সহীহ মুসলিমের হাদিসে বর্ণিত আছে, পাহাড়- পর্বত এবং বৃক্ষরাজি এক হাতে থাকবে তারপর এগুলোকে ঝাঁকুনি দিয়ে তিনি বলবেন, 'আমি রাজাধিরাজ, আমিই আল্লাহ।'

সহীহ বুখারীর এক বর্ণনায় আছে, সমস্ত আকাশ মণ্ডলীকে এক আঙুলে রাখবেন। পানি এবং ভূতলে যা কিছু আছে তা এক আঙুলে রাখবেন। আরেক আঙুলে রাখবেন সমস্ত সৃষ্টি। (বুখারী ও মুসলিম)

ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত মারফু হাদিসে আছে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা সমস্ত আকাশ মণ্ডলীকে ভাঁজ করবেন। অতঃপর সাত তবক জমিনকে ভাঁজ করবেন এবং এগুলোকে বাম হাতে নেবেন। তারপর বলবেন, "আমি হচ্ছি রাজাধিরাজ। অত্যাচারীরা কোথায়? অংহকারীরা কোথায়? (মুসলিম)

৩। ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, সাত তবক আসমান ও জমিন আল্লাহ তাআলার হাতের তালুতে ঠিক যেন তোমাদের কারো হাতে এটা সরিষার দানার মত।

৪। ইবনে যায়েদ বলেন, "আমার পিতা আমাকে বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লম এরশাদ করেছেন,

ما السموات السبع فى الكرسى إلا كدراهم سبعة ألقيت فى ترس.

হক: আর সবই বাতিল। এটাই তাওহীদের হাকিকত। এটাই তাওহীদের প্রাণ ও জীবনী শক্তি এবং ইখলাসের গোপন রহস্য।

অতএব মহান আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনা তিনি যেন আমাদের অন্তর তারই মা'রেফাত ও মুহাব্বতে ভরপুর করে দেন। তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তনের তাওফীক দেন। তিনি মহান দাতা ও কৃপাশীল।

“কুরসীর মধ্যে সপ্তাকাশের অবস্থান ঠিক যেন, একটি ঢালের মধ্যে নিক্ষিপ্ত সাতটি দিরহামের [মুদ্রার] মত।” তিনি বলেন, ‘আবুযর রা. বলেছেন, ‘আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালমকে এ কথা বলতে শুনেছি,

ما الكرسى فى العرش إلا كحلقه من حديد ألقيت بين ظهرى فلاة من الأرض.

“আরশের মধ্যে কুরসির অবস্থান হচ্ছে ঠিক ভূপৃষ্ঠের কোন উন্মুক্ত স্থানে পড়ে থাকা একটি আংটির মত।

৫। ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ‘দুনিয়ার আকাশ এবং এর পরবর্তী আকামের মধ্যে দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশো’ বছরের পথ। আর এক আকাশ থেকে অন্য আকাশের দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশো বছরের। এমনিভাবে সপ্তমাকাশের মধ্যে দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশো বছরের পথ। একই ভাবে কুরসি এবং পানির মাঝখানে দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশো বছরের। আরশ হচ্ছে পানির উপরে। আর আল্লাহ তাআলা সমাসীন রয়েছেন আরশের উপর। তোমাদের আমলের কোন কিছুই তাঁর কাছে গোপন নেই। (ইবনে মাহদী হাম্মাদ বিন সালামা হতে তিনি আসেম হতে, তিনি জ্বরীর হ'তে, এবং জরির আবদুলহ হতে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

(অনুরূপ হাদিস মাসউদী আসেম হতে তিনি আবি ওয়ায়েল হতে, এবং তিনি আবদুলহ হতে বর্ণনা করেছেন।)

৬। আব্বাস বিন আবদুল মোত্তালিব রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লম এরশাদ করেছেন,

هل تدرون كم بين السماء والارض.؟ قلنا : الله ورسوله أعلم، قال بينهما مسيرة خمسمائة سنة، من كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة، وكثف كل سماء مسيرة خمسمائة سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله سبحانه و تعالى فوق ذالك’ وليس يخفى عليه شيئ من أعمال بني آدم. (أخرجه أبوداود وغيره)

“তোমরা কি জানো, আসমান ও জমিনের মধ্যে দূরত্ব কত?” আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সবচেয়ে ভাল জানেন। তিনি বললেন, “আসমান ও জমিনের মাঝে দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশো বছরের পথ। এক আকাশ থেকে অন্য আকাশের দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশো’ বছরের পথ। প্রতিটি আকাশের

ঘনত্বও (পুরু ও মোটা) পাঁচশো' বছরের পথ। সপ্তমাকাশ ও আরশের মধ্য খানে রয়েছে একটি সাগর। যার উপরিভাগ ও তলদেশের মাঝে দূরত্ব হচ্ছে আকাশ ও জমিনের মধ্যকার দূরত্বের সমান। আল্লাহ তাআলা এর উপরে সমাসীন রয়েছেন। আদম সন্তানের কোন কর্মকাণ্ডই তাঁর অজানা নয়।" (আবু দাউদ)

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় .

১। وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ এর তাফসীর

২। এ অধ্যায়ে আলোচিত জ্ঞান ও এতদসংশিষ্ট জ্ঞানের চর্চা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লম এর যুগের ইহুদীদের মধ্যেও বিদ্যমান ছিল। তারা এ জ্ঞানকে অস্বীকার ও কর তো না।

৩। ইহুদি পণ্ডিত ব্যক্তি যখন কেয়ামতের দিনে আল্লাহর ক্ষমতা সংক্রান্ত কথা বলল, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কথাকে সত্যায়িত করলেন এবং এর সমর্থনে কোরআনের আয়াতও নাজিল হলো।

৪। ইহুদি পণ্ডিত কর্তৃক আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কিত মহাজ্ঞানের কথা উল্লেখ করা হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লম এর হাসির উদ্রেক হওয়ার রহস্য।

৫। আল্লাহ তাআলার দু'হস্ত মোবারকের সুস্পষ্ট উল্লেখ্য। আকাশ মণ্ডলী তাঁর ডান হাতে, আর সমগ্র জমিন তাঁর অপর হাতে নিবদ্ধ থাকবে।

৬। অপর হাতকে বাম হাত বলে নাম করণ করার সুস্পষ্ট ঘোষণা।

৭। কেয়ামতের দিন অত্যাচারী এবং অহংকারীদের প্রতি আল্লাহর শাস্তি র উল্লেখ।

৮। আকাশের তুলনায় আরশের বিশালতার উল্লেখ।

৯। "তোমাদের কারো হাতে একটা সরিষা দানার মত" রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লম এর এ কথার তাৎপর্য।

১০। কুরসির তুলনায় আরশের বিশালতার উল্লেখ।

১১। কুরসি এবং পানি থেকে আরশ সম্পূর্ণ আলাদা।

১২। প্রতিটি আকাশের মধ্যে দূরত্ব ও ব্যবধানের উল্লেখ।

১৩। সপ্তমাকাশ ও কুরসির মধ্যে ব্যবধান।

১৪। কুরসি এবং পানির মধ্যে দূরত্ব।

১৫। আরশের অবস্থান পানির উপর।

১৬। আল্লাহ তাআলা আরশের উপরে সমাসীন।

১৭। আকাশ ও জমিনের দূরত্বের উল্লেখ।

১৮। প্রতিটি আকাশের ঘনত্ব (পুরো) পাঁচশো বছরের পথ।

১৯। আকাশ মণ্ডলীর উপরে যে সমুদ্র রয়েছে তার ঊর্ধ্ব দেশ ও তলদেশের মধ্যে দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশো' বছরের পথ।

والحمد لله رب العلمين، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

কারণ, কাপুরুষতা হচ্ছে হীন চরিত্রের লক্ষণ। এ কারণেই পরিপূর্ণ ঈমান, তাওয়াক্কুল এবং বীরত্ব এ ধরনের ভয়কে দূরীভূত করে দেয়। এমনকি ঈমানী বলে বলীয়ান বিশেষ ঈমানদার ব্যক্তিগণ ভয়-ভীতির ক্ষেত্রগুলোকে ঈমানী শক্তি, বীরত্ব দুর্বার সাহসিকতা আর পূর্ণ তাওয়াক্কুল দ্বারা শান্তি ও নিরাপত্তায় পরিণত করেছেন।